গাদিরে খুম থেকে দামেস্ক

সংকলন ও সম্পাদনা
ডা. এ. এন. এম. এ. মোমিন

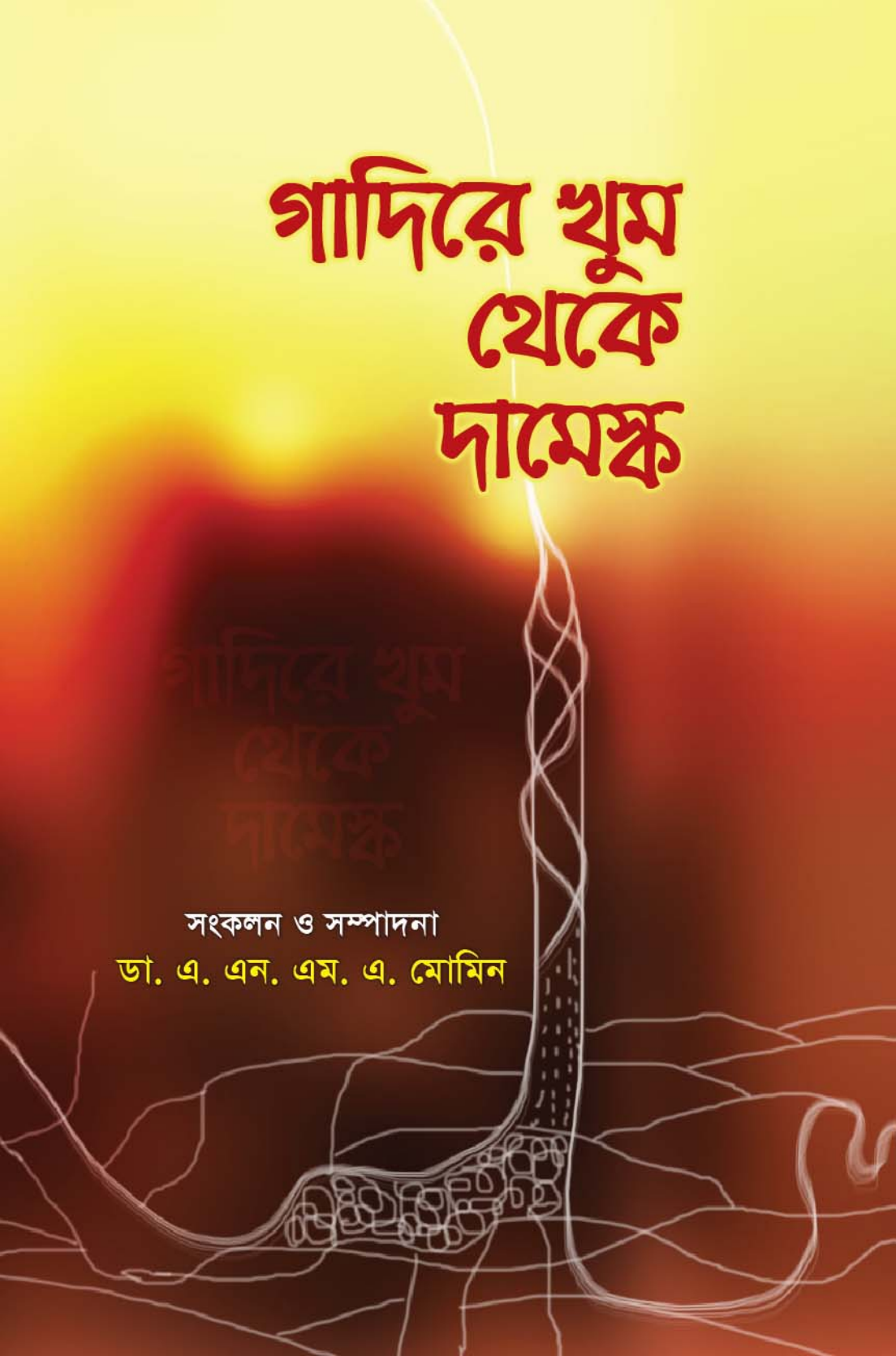

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি), **যিনি অতিশয় দয়ালু** (সাধারণভাবে সবার জন্য) এবং **পরম করুণাময়** (বিশেষ কিছু ব্যক্তির জন্য এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে)

আলে রাসূল পাবলিকেশন্স

[[[হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি]]]

তরিকত-মারেফাত, সূফীবাদ, তা'সাউফপন্থি, আধ্যাত্মিকতা ও আহলে বাইতের ধারার বইসমূহ ঘরে বসে পেতে ফোন করুন

সরাসরি ০১৯৭৩৩৬৪৫২৯

যেকোনো সংখ্যক বই হোম ডেলিভারির জন্য সার্ভিস চার্জ মাত্র ৫০/- টাকা

আপনার চাহিদা মোতাবেক বই বুঝে পাওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করুন

ডাচ্-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং : **01973364529**

বিকাশ একাউন্ট নম্বর : **01973364529** (Personal)

গাদীরে খুম থেকে দামেস্ক

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. এ. এন. এম. এ. মোমিন

প্রকাশনায় :

আলে রাসূল পাবলিকেশন্স
Ale Rasul Publications
[[[হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি]]]

৩৯ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
01551 364529, 01973 364529, E-mail: ale.rasul@outlook.com
Find us on facebook ale.rasul@outlook.com
Follow us on twitter ale.rasul@outlook.com

গাদীরে খুম থেকে দামেস্ক

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. এ. এন. এম. এ. মোমিন

কৃতজ্ঞতায় : **মুহিব্বীনে আহলে বাইত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।**

প্রকাশকাল : **গাদীর দিবস ২০১৫ ঈসায়ী**

প্রকাশনায় : **আলে রাসূল পাবলিকেশন্স**
৩৯ গাউসূল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
E-mail: ale.rasul@outlook.com
ফোন: **০১৫৫১ ৩৬৪৫২৯, ০১৭৭ ৬০৬০ ৬৭৬, ০১৯৭৩ ৩৬৪৫২৯**

পরিবেশনায় :

- **র‍্যামন পাবলিশার্স**, আলী রেজা মার্কেট, ২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ৯৫১৫২২৮
- **সদর প্রকাশনী**, ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা), ১১, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন ৭১২৪৮১২
- অন-লাইন পরিবেশক: রকমারি **www.rokomari.com/publisher/2564**

প্রচ্ছদ : **মোঃ তানভীরুল ইসলাম (মিঠু),** চিত্রশিল্পী

মূল্য : **৳ ২২০.০০**

Gader-e-Khum Thaka Damesque
by **Dr. A. N. M. A. Momin**
with the best complement of
Muhibbin-e-Ahley Bayet Foundation, Bangladesh.
Published by **Ale Rasul Publications**
39 Gawsul Azam Super Market, Nilkhet, Dhaka-1205.
Phone: **01973364529, 01776060676, 01551364529**
E-mail: **ale.rasul@outlook.com;** Price: **Tk.220.00**

ISBN: 978-984-91642-0-3

ডা. এ এন এম এ মোমিনের

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ডা. এ এন এম এ মোমিন ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। ছাত্র অবস্থা থেকে তিনি দৈনিক আজাদ, দৈনিক বাংলার বানী, বাংলাদেশ টাইমস, সপ্তাহিক হলিডে ও সাপ্তাহিক বিচিত্রায় বিভিন্ন গবেষণামূলক লেখনী প্রকাশ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষে 'লিয়াজোঁ অফিসার' চাকুরীতে যোগদান করেন। চাকুরী সূত্রে তিনি যুক্তরাজ্যের কার্ডিফে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলস ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী থেকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন পোর্ট এন্ড শিপিং এডমিনিস্ট্রেশন ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি জাপান, ইতালী, শ্রীলংকা থেকে বন্দর ও জাহাজ বিষয়ক বিভিন্ন উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি সরকারী দলের নেতা হিসাবে আরব আমিরাতের জবল আলী বন্দর, সৌদি আরবের জেদ্দা, মিশরের আলেকজেন্ড্রারিয়া ও ইরানের বন্দর আব্বাস পরিদর্শন করেন। ২০০৯ সালে 'পরিচালক প্রশাসন' হিসেবে চাকুরী থেকে আবসর গ্রহণের পর তিনি পুরোপুরি ইসলামী সূফীদর্শন বিষয়ক লেখা ও গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে তিনি একটি সেবামূলক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন।

সূচিপত্র

১) গাদিরে খুমে রাসূল (দ.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ/৭

২) গাদিরে খুমের ঘোষণা -একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা/৩৯

৩) হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে কিছু প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে হযরত মা ফাতেমা যাহরার বক্তব্য/৫০

৪) হযরত ইমাম হোসাইন ও কারবালা/৬৯

৫) ইয়াজিদ বাহিনীর সৈন্যদের দ্বারা ইমাম হোসাইনের শাহাদতের পর তাঁর পবিত্র দেহ মোবারকের উপর অত্যাচার, তাঁর জিনিষপত্র লুট ও নবী-পরিবারের সম্মানিত মহিলাদের সঙ্গে বেয়াদবি/৯৮

৬) কুফার জনসাধারনের কাছে মহান আহলে বাইতদের দেয়া বক্তব্য ও তাদের আহাজারি ও ক্রন্দন/১১০

৭) ইমাম হোসাইনের মস্তক মোবারক ও তাঁর পরিবার উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের দরবারে/১২১

৮) হযরত ইমামের পবিত্র মস্তক সম্পর্কিত অলৌকিক ঘটনাবলি/১৩৩

৯) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক নগরীর ফটকে ইমাম পাকের মস্তক ও তাঁর পবিত্র পরিবার/১৩৮

১০) ইয়াজিদের দরবারে ইমাম হোসাইনের ছিন্ন মস্তক ও আহলে বাইত/১৪১

১১) ইয়াজিদের কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত যয়নব বিনতে আলীর জবাব/১৪৫

১২) ইয়াজিদের দরবারে ইমাম জয়নুল আবেদীনের ঐতিহাসিক ভাষন/১৪৯

১৩) আহলে বাইতের মদিনায় প্রত্যাবর্তন ও রাসূল (দ.)-এর নিকট অভিযোগ উপস্থাপন/১৬২

১৪) ইয়াজিদের শাসন একটি নিরেপেক্ষ বিশ্লেষণ/১৬৮

১৫) কারবালার যুদ্ধের ফলাফল/১৭২

১৬) হযরত ইমাম হোসাইনের রওজা জিয়ারতের ফজিলত/১৭৮

গাদিরে খুমে রাসূল (দ.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

হাকিম আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ কাদেরী দানাপুরী (রহ.) তাঁর "আস সির ফি হুদা খায়রুল বাশার (দ.)" নামক গ্রন্থে এ ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ হযরত সরওয়ারে আলম আহমদে মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.)-এর পবিত্র জীবনী আলোচনা করেছেন। উক্ত জীবনীতে তিনি "গাদীরে খুমের ভাষণ ও ইমামতের মাসয়ালা" শিরোনাম ধার্য করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন: "বিদায় হজ সম্পন্ন করে রাসূল (দ.) মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে গাদীরে খুমে এসে উপস্থিত হলেন যা 'জুহফা' থেকে তিন মাইলের দূরত্বে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী অবস্থিত একটি স্থান। এখানে একটি গাদীর তথা পুকুর আছে। উক্ত স্থানে পৌঁছে তিনি একটি ভাষণ দিলেন।" লেখক তাঁর লেখনীর এক অংশে লিখেছেন যে, রাসূল (দ.) বললেন, "তোমরা কি জানো না যে, আমি সকল মুমিনের জীবনের প্রতি তাদের চেয়ে অধিক অধিকার রাখি?" সবাই জবাব দেয়, "হ্যাঁ"। তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহ, আমি যার মাওলা আলীও তার মওলা। হে আল্লাহ, যে আলীকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করে তুমিও তাকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করো, যে আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তুমিও তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য করো।" অতঃপর হযরত আলীর সঙ্গে হযরত উমর সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, "হে আলী ইবনে আবি তালিব, তোমাকে মোবারকবাদ, তুমি প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর মাওলা হয়ে গেলে।" [আস্ সির ফি হুদা খায়রুল বাশার (দ.)'-এর রচিয়তা হাকিম আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ কাদেরী দানাপুরী, করাচি, নূর মুহাম্মদ -১৯৫৭]

যখন গাদীরের ভাষণ শেষ হলো এবং মাওলাইয়াতের ঘোষণার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল তখন আবু সাঈদ খুদরীর সূত্রে, ইবনে মারদুইয়্যাহ, আবু নাঈম, আখতার খাওয়ারজমী, সিব্ত ইবনে জাওজী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আল কুঞ্জী ও শাফেয়ী এবং হাম্বলী আলেমগণ নিজেদের লেখনীতে এ কথা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রাসূল (দ.)-এর দরবারের কবি হাস্সান বিন সাবিত কবিতা আবৃত্তি করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং রাসূল (দ.)-এর অনুমতি পেয়ে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যা ইসলামি জাহানের বিভিন্ন কিতাবে এসেছে।

রাসূল (দ.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা বলেন, "যে ব্যক্তি ১৮ জিলহজে রোজা রাখবে তার আমলনামায় ৬০টি রোজার সওয়াব লেখা হবে। সেটি গাদীরে খুমের দিন, যেদিন রাসূল (দ.) হযরত আলীর হাত উঁচু করে উঠিয়ে বলেছিলেন, "আমি কি মুমিনদের জন্য তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় নই?" উপস্থিত সবাই বলেছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রিয়।" রাসূল (দ.) বললেন, "আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা।" উমর ইবনুল খাত্তাব বলতে লাগলেন, "মোবারকবাদ! মোবারকবাদ! তোমাকে হে আবু তালিবের পুত্র, তুমি আমার এবং প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর অভিভাবক, শাসক ও পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হয়ে গেলে।" অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতটি নাজিল করলেন,

> **"...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতসমূহকে তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের জন্য দ্বীনে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম...।"**

আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি ফকীহ্ ইবনুল মাগাজেলী স্বীয় 'মানাকিবে', ইবরাহীম আনসারী তাঁর 'কিতাবুল খসায়েসে' ও শাহাবুদ্দিন আহমদ স্বীয় কিতাব 'তাওজিহুদ দালায়েল'-এ বর্ণনা করেছেন। আর সালেহানী মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উপরিউক্ত আয়াতটি গাদীরে খুম নামক স্থানেই নাজিল হয়েছে।

এ সকল অকাট্য বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টাকারে প্রমাণিত হয় যে,

> **"হে রাসূল, পৌঁছে দিন, যা আপনার প্রতি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে। যদি আপনি তা না করেন তবে আপনি রেনামাজের কোনো কিছুই পৌঁছালেন না। আর (ভয়ের কিছুই নেই) আল্লাহ মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনাকে হেফাজত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"** (সূরা মায়িদাহ, আয়াত-৬৭)

উক্ত আয়াতটি হযরত আলীর মাওলাইয়াতের ঘোষণাসংক্রান্ত বিষয়ে নাজিল হয়েছিল এবং উক্ত ঘোষণারই হুকুম নিয়ে এসেছিল, যা পালনকল্পে রাসূল (দ.) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। আর তার পরপরই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রিসালাতের কার্য সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হলো–

"...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতসমূহকে তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের জন্য দ্বীনে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম...।" (সূরা মায়িদা, আয়াত-৩)

অর্থাৎ দ্বীনের পরিপূর্ণতা ও নেয়ামতসমূহের সম্পূর্ণতার প্রতি মোহর লাগিয়ে দেয়া হলো।

এটা অবশ্য আলাদা কথা যে 'মাওলা' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি নানা অজুহাত দেখিয়ে তার গুরুত্বকে খাটো করার অপপ্রয়াস করেছেন। যেমন ওপরে বর্ণিত কয়েকটি বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে আল্লামা শিবলী নোমানী রাসূল (দ.)-এর ঐতিহাসিক বাক্য "মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহু" এর অনুবাদ এভাবে করেছেন, "যার কাছে আমি প্রিয়, আলীও তার কাছে প্রিয় থেকে হবে।"

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী উক্ত বাক্যের অনুবাদ এভাবে করেছেন, "আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।" তিনি 'মাওলা' শব্দটির মধ্যে কোনো কাটছাট বা বাড়াবাড়ি করেননি।

কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান সালমান মনসুরপুরীও অনুরূপ আচরণ করেছেন। অর্থাৎ 'মাওলা' শব্দের কোনো অনুবাদ তিনিও উপস্থাপন করেননি।

তবে "মুহসিন-এ-ইনসানিয়াত" কিতাবের রচয়িতা জনাব নাঈম সিদ্দিকী "মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহু" হাদীসটির একটু ব্যতিক্রমধর্মীয় অনুবাদ করেছেন, "আমি যার সঙ্গী, আলীও তার সঙ্গী"।

অবশ্য লক্ষণীয় বিষয় এটাই যে, 'মাওলা' শব্দের পার্থক্য তথা বিরোধকে রাসূল (দ.) স্বয়ং "মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহু" বাক্যটি উচ্চারণ করার আগেই উপস্থিত সকলের নিকট স্বীকারোক্তি নিয়ে নিরসন করে দিয়েছেন যে, "আমি কি তোমাদের নফসের প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশি অধিকার রাখি না?" উপস্থিত জনতা স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিলেন যে, "নিশ্চয়ই আপনি আমাদের নফসের প্রতি আমাদের চেয়ে বেশি অধিকার রাখেন।" তার পরপরই তিনি (দ.) বলেছিলেন, "মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহু" অর্থা "আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।" এ ধরনের পরিস্থিতিতে ঐ ঘোষণার অর্থ দাঁড়াবে এরকম যে, "যার নাফসের প্রতি আমি নিজেই তার চেয়ে বেশি অধিকার রাখি, আলীও ঠিক আমারই মতো তার নফসের প্রতি তার চেয়ে বেশি অধিকার রাখে।" কথাটা এভাবেও

বলা যায়, "যে আমাকে তার নফসের অধিকারী বলে মেনে নেবে, তার জন্য আবশ্যক কর্তব্য হবে সে যেন আলীকেও তার নফসের অধিকারী বলে মেনে নেয়"

এ ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে রাসূল (দ.) হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে তাঁর পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকারী ও খলিফা নিযুক্তকরণসংক্রান্ত যাবতীয় ঘোষণার প্রতি সিলমোহর মেরে দিলেন। এ স্থানে স্মরণ করিয়ে দিলে অনুপযুক্ত হবে না যে, সর্বাগ্রে রাসূল (দ.) 'দাওয়াত-এ-জুল আশীরা' উপলক্ষে কোরাইশ নেতৃবৃন্দের সামনে এ ঘোষণাই করেছিলেন যে, "এ আলী আমার ভাই, আমার ওয়াসী এবং তোমাদের প্রতি আমার খলিফা মনোনীত হলো, তোমরা তাঁর কথা শুনো ও মান্য করো।"[১]

সেই দিনের পর থেকে সুযোগমতো বিভিন্ন সময়ে রাসূল (দ.) হযরত আলীর ফাজায়েল ও গুরুত্ব বিভিন্নভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এখানে উদাহরণস্বরূপ দুটি ঘটনা উপস্থাপন করা হলো:

প্রথমত: রাসূল (দ.) যখন তাবুক যুদ্ধে যাত্রা করেন এবং আলী ইবনে আবি তালিবকে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়ে যাবার বদলে তাঁকে মদিনাতে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে গেলেন, তখন মুনাফিকরা সুযোগ পেয়ে রটিয়ে দিল যে, "রাসূল (দ.) আলীর প্রতি মনঃক্ষুণ্ন ও ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন, আর সে কারণেই নিয়মের ব্যতিক্রম তাকে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়ে যাবার পরিবর্তে মদিনাতে নারী ও শিশুদের তত্ত্বাবধায়ক করে রেখে গেছেন।" কারণ, এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটেছিল যে, রাসূল (দ.)-কোনো যুদ্ধে গেছেন অথচ হযরত আলীকে তাঁর সঙ্গে নেননি। কাজেই মুসলমান ও মুনাফিকদের কাছে স্বীয় অবস্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট করার জন্য হযরত আলী দ্রুত রাসূল (দ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন যে, "আমাকে মদিনায় রেখে আসার কারণে সেখানে

[১] আরো বিস্তারিত দেখুন: তাফসিরে মাযাহেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড-৯, পৃ. ২০৪ থেকে ২০৬; তাফসিরে নুরুল কোরাআন, মাওলানা আমিনুল ইসলাম, খণ্ড-১৯, পৃ. ২১৮; সাহাবা চরিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড-১, পৃ. ২৬০; মহানবী আল মোস্তফা, রহমানীয়া লাইব্রেরী, পৃ. ১০১; মোস্তফা চরিত, মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃ. ৩২৯; সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ১৩৩ থেকে ১৩৪; সীরাতে রাসূল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ২১৯; কাতেবীনে ওহী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ১৫৪; খিলাফতে রাশেদা, মাওলানা আব্দুর রহীম, পৃ. ১৬০; হযরত আলী (রা.), তাজ কোং, পৃ. ২৩; আশারায়ে মোবাশশারা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পৃ. ১৫৪; খাতুনে জান্নাত, বিউটি বুক হাউজ, পৃ. ৩০।

আমার নিন্দা করা হচ্ছে।" পুরো ঘটনা শোনার পর রাসূল (দ.) বললেন, "ইয়া আলী, আমা তারদা আন তাকুনা মিন্নি বিমানযিলাতি হারুনা মিম মূসা ইল্লা আন্নাহু লা নবীয়্যা মিম বা'দী" অর্থাৎ "হে আলী, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার সঙ্গে তোমার সেই সম্পর্ক যেমন মূসার সঙ্গে হারুনের সম্পর্ক ছিল। শুধু ব্যতিক্রম এতোটুকু যে, আমার পরে কোনো নবী হবে না।" এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি নবুয়তের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ রাসূল (দ.) কর্তৃক এমন কথা বলার অর্থ হলো এই যে, "হে আলী! আমার পরে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত ও খলিফা হবে। যেমন মূসার পরে হারুন হয়েছিলেন, তবে পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, তুমি নবী হবে না।"[২]

দ্বিতীয়তঃ মক্কা বিজয়ের পর হজ মওসুমে সূরা বারায়াত তথা সূরা তওবা এর কিছু আয়াত মক্কার কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের বিষয়টি জানিয়ে দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, রাসূল (দ.) মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে বলেছিলেন যে, "উক্ত আয়াতসমূহকে হয় আমি নিজে প্রচার করব কিংবা এমন ব্যক্তি প্রচার করবে যে হবে পক্ষ থেকে নিয়োজিত।" কাজেই হযরত আবু বকর যিনি উক্ত আয়াতগুলো নিয়ে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি ফরমান পাঠানো হলো, তিনি যেন উক্ত আয়াতগুলো হযরত আলীর হাওয়ালা করেন আর হযরত আলীকে দায়িত্ব দেয়া হলো তিনি যেন এ আয়াতগুলো মক্কার কাফেরদের জানিয়ে দেন। আর এভাবেই রাসূল (দ.) তাঁকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হাজীদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেন।

উক্ত ঘোষণাসমূহের ধারাবাহিকতারই শেষাংশ হলো গাদিরে খুমের ঐ বাক্য যার আলোচনা ওপরে করা হয়েছে। অর্থাৎ "আলাসতু আওলা বিকুম মিন আনফুসিকুম (আমি কি তোমাদের নফসের প্রতি তোমাদের চেয়ে অধিক অধিকার রাখি না) এ প্রশ্ন ও উপস্থিত সবার পক্ষ থেকে হ্যাঁ সূচক জবাব পাওয়ার পর রাসূল (দ.) হযরত আলীর হাত উঁচু করে ধরে ঘোষণা করলেন,

---

[২] আরো দেখুন: জামে আত তিরমিযী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং ৩৬৬২ ও ৩৬৬৭ থেকে ৩৬৬৮; মেশকাত শরীফ, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, একাদশ জিলদ, আলি ইবনে আবু তালিব (রা.) এর ফজিলত অধ্যায়ে, প্রথম পরিচ্ছেদ, হাদিস নং ৫৮২৮; আর রিয়াদুন নাদরাহ্, ৩:১১৮; ফাযায়িলুস সাহাবা, ২: ৬৭৮/১১৫।

"মানকুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহু। আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালাহু ওয়া আ'দি মান আ'দাহু।" আর যে কথাটি শুরুতেই বলা হয়েছে যে, এ ঘোষণাটিই ছিল হযরত আলীর বেলায়েত ও খেলাফতের প্রতি সুস্পষ্ট ও সমাপ্তি মোহর। আর যেহেতু আল্লাহর রাসূল (দ.) এ জাতীয় ঘোষণা অন্য কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে দেননি। এর যুক্তিসংগত ফলাফল এরূপ বেরিয়ে আসে যে, হযরত আলীর বেলায়েত, খেলাফত ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর মাওলাইয়্যাত নিরবচ্ছিন্ন ও নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করল।

গাদীরে খুমের ভাষণ হলো এমনই এক দীর্ঘ ভাষণ, যার আলোচনা মুসলিম বিশ্বের আলিমগণ তাদের সকল প্রাচীন গ্রন্থে সংরক্ষণ করেছেন এবং এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনাবলিও ঐ সকল গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আবু মনসুর আহমদ ইবনে আলী আত তাবারসী (রহ.) বিখ্যাত "আল ইহতিজাজ" গ্রন্থে ভাষণটি পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ, যা তিনি বিদায় হজ শেষ করার পর 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে পৌঁছে ১০ম হিজরির ১৮ জিলহজ তারিখে প্রদান করেছিলেন, এটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠিত সনদসমূহের ওপর ভিত্তিশীল।

আল্লামা আবু মনসুর আহমদ ইবনে আলী আত তাবারসী (রহ.) বর্ণিত রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করা হলো:

রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

আল্লাহর জন্য প্রশংসা, যিনি সত্তাগতভাবেও একক এবং সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সবকিছুর প্রতি ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী এবং একক সত্তা হওয়া সত্ত্বেও সবকিছুরই নিকটবর্তী।

আপন শাসন ক্ষমতায় মহত্ত্বের এবং সৃষ্টি পরিচালনার নীতিতে এমন শ্রেষ্ঠত্বের মালিক যা সত্তাগতভাবে কেবল তাঁরই চিরপ্রাপ্য।

তাঁর জ্ঞান সকল বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। তিনি আপন স্থানে অবস্থান করা সত্ত্বেও সবখানে বিরাজমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতি কর্তৃত্ববান। নিজ কুদরত তথা শক্তি দ্বারা এবং নিজ দলিল ও হুজ্জত দ্বারাই তিনি সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ এবং অনন্তকালব্যাপী রয়েছেন, আর চিরকাল থাকবেন। তিনিই শুধুমাত্র স্বমহিমায় প্রশংসারযোগ্য ও প্রশংসিত এবং সর্বদার জন্য সমুন্নত তথা উচ্চ বিষয়াবলির

সৃষ্টিকর্তা এবং ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় বস্তুর অধিপতি, উঁচু ও নিচুর সৃষ্টিকর্তা, জমিনসমূহ এবং আসমানসমূহের নিয়ন্ত্রণ তাঁরই কুদরতি হাতে রয়েছে।

তাঁর সত্তা পূত-পবিত্র। সকলে তাঁর নামেরই তসবিহ পাঠ করে। তিনিই ফেরেশতাকুল ও রূহের প্রভু। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দয়া ও করুণাকারী এবং তাদের প্রতিও দয়া ও করুণাময় যারা তাঁর নৈকট্য অর্জন করেছে। অধিকতর দানশীল ও দয়াময়। প্রতিটি চোখ তাঁর দৃষ্টির আওতার মধ্যে রয়েছে এবং চোখসমূহ তাঁকে দেখতে সক্ষম নয়। তিনি ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল, তাঁর কাজ ধীর গতিতে হযে থাকে, তাঁর রহমত সকল বস্তুকে তাঁর বিস্তৃতির ছায়া দান করে রয়েছে এবং তিনি প্রত্যেকের প্রতি নিজ নেয়ামত দ্বারা অনুগ্রহ করে থাকেন। প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর তড়িঘড়ির প্রয়োজন নেই, শাস্তি দেয়ার জন্য যারা উপযুক্ত অথচ তিনি ত্বরান্বিত করেন না। গোপনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত এবং মনের অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞাত। গুপ্ত জিনিসগুলো তাঁর অগোচরে নয় এবং গোপন বিষয়াবলি তাঁর নিকট সন্দেহযুক্ত নয় বরং সুস্পষ্ট। সকল বিষয় তাঁর নখদর্পণে এবং প্রত্যেক বস্তুর ওপর তিনি বিজয়ী। তাঁর শক্তি সমস্ত জিনিসের মধ্যে ক্রিয়াশীল ও চলমান। তাঁর কুদরত যাবতীয় বিষয়ের প্রতি ক্ষমতাবান।

কোনো জিনিসই তাঁর ন্যয় বা মতো নয়। তিনিই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও আবিষ্কারক। আর যখন কোনো কিছুই ছিল না তিনি তখন থেকেই আপন ন্যায়বিচার দ্বারা বিদ্যমান ও প্রতিষ্ঠিত। সেই মহা প্রজ্ঞাবান ও সম্মানিত ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তাঁর মর্যাদা উচ্চতর, কোনো দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারে না। তিনিই দৃষ্টিসমূহকে তীক্ষ্ণতা ও প্রজ্ঞা দান করে থাকেন। বড়ই সূক্ষ্মদর্শী ও সূক্ষ্ম কাজের জ্ঞানী। কেবল তাঁরই সত্তা, যা কেউ অবলোকন করে ব্যক্ত করতে পারে না যে, তিনি কেমন। আর না কেউ জানতে পারে যে, তিনি জাহেরে ও বাতেনে কীরূপে আছেন, শুধু ঐ সমস্ত সত্যতা ব্যতীত যেগুলোকে তিনি নিজে জানবার দলিল বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তো এমন সত্তা যাঁর মহান পবিত্রতা দ্বারা পুরো বিশ্ব পরিপূর্ণ। তাঁর হেদায়েতের নূর সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তাঁর নির্দেশ কোনো পরামর্শদাতার পরামর্শ ব্যতীত কার্যকরী হয়ে থাকে। তকদির বিষয়ে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর কর্মকৌশলে কোনো বিরোধ নেই। যাবতীয় বস্তু যা তিনি সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর আকার-আকৃতি কোনো নমুনা ব্যতীত দিয়েছেন। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন কারো সাহায্য

ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন আর এতে তাঁকে কোনো আয়োজন করতে হয়নি। আর না কোনো জিনিসের দরকার আছে। তিনি যে জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন তা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং প্রকাশিত হয়েছে।

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি নিজ শিল্প নিপুণতায় পরিপূর্ণ এবং সর্বোত্তম শিল্পী। এমনই ন্যায়বিচারক যে, তাঁর সত্তা দ্বারা কখনো কোনো অত্যাচার হয় না। তিনি এমনই মহান যে, সমস্ত বিষয়ের প্রত্যাবর্তন তাঁর দিকেই এবং তাঁর দিকেই হবে।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যাবতীয় জিনিসই তাঁর কুদরতের কাছে অতীব ক্ষুদ্র এবং প্রত্যেক জিনিস তাঁর ক্ষমতার নিকট মস্তকাবনত এবং তাঁরই অনুগত। তিনিই প্রকৃত মালিক ও সকল মালিকেরও মালিক নভোমণ্ডলের মালিক ও সকল মালিকেরও মালিক। নভোমণ্ডলের মালিক ও ক্রিয়াশীল সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা কার্য সম্পাদনকারী। তাদের মধ্যকার সবাই একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান। তিনি রাতকে দিনের ওপর প্রভাবিত করে থাকেন, আবার দিনকে রাতের ওপর, এভাবে যে, দিন ও রাত একে অন্যের পেছনে ধাবমান। তিনি সকল ঈর্ষাকারী ও স্বেচ্ছাচারীর অহঙ্কারকে চূর্ণ করেন এবং সকল অবাধ্য শয়তানকে ধ্বংসকারী। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই এবং তাঁর প্রতিপক্ষও কেউ নেই, আর না কেউ তাঁর সমান ও শরীক। তিনি এক ও একক এবং স্বাধীন। তিনি কারো সন্তান নন, আর না তাঁর কোনো সন্তান আছে। তিনিই একক প্রভু এবং মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

তিনি যা চান তা-ই হয়ে যায় এবং যে জিনিসের ইচ্ছা করেন তা তখনই করে দেখান। তিনি জানেন এবং প্রতিটি কথাই জানেন, মৃত্যু দেন এবং জীবন দান করেন, ফকির ও ধনী তিনিই বানান। তিনিই হাসান ও তিনিই কাঁদান। তিনিই নিকটবর্তী করেন, আবার তিনিই দূরে সরিয়ে দেন। তিনিই বঞ্চিত করেন, আবার তিনিই প্রতিপালন করে থাকেন। যাবতীয় অধিকার একমাত্র তাঁরই।

প্রসংশা তাঁরই জন্য, উত্তম সৌভাগ্য তাঁরই হাতে এবং তিনি যাবতীয় বিষয়ের প্রতি ক্ষমতাবান। রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে। তিনিই দয়াশীল ও ক্ষমাশীল, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি দোয়া কবুলকারী এবং দানের প্রতিদানকারী। তিনি প্রতিটি নিশ্বাসের গণনা জানেন। তিনি জীন ও ইনসানের রব। তাঁর জন্য কোনো বিষয়ই

মুশকিল নয়। ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ তাঁকে বিরক্ত করে না আর আহাজারিকারীর আহাজারি দ্বারা তিনি বিরক্তবোধ করেন না। তিনি সৎ বান্দাদের যাবতীয় মন্দ থেকে হেফাজত করেন এবং সফলতা অর্জনকারীদের সৌভাগ্য দান করেন এবং তিনিই মুমিনদের মালিক ও প্রভু এবং জগতসমূহের রব।

তাঁর হক হলো ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, সে যেন তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে, আর তাঁর প্রশংসা করে সুখে-দুঃখে। আর আমার ঈমান আছে তাঁর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি এবং তাঁর প্রেরিতগণের প্রতি। আমি তাঁর বিধি-বিধান শুনি এবং তার প্রতি আমল করি এবং যা কিছু তিনি চান তা পালন করার জন্য সর্বদা ও সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছি। আমি তাঁর ফয়সালা মেনে নিতে প্রস্তুত, তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রবল ইচ্ছা তাঁরই আনুগত্যের জন্য এবং তাঁর শাস্তির ভয়ের সঙ্গে। কারণ, আল্লাহর সত্তা তো তা-ই, যাঁর প্রতিশোধ থেকে রক্ষা নেই। তাঁর পক্ষ থেকে অত্যাচারিত হওয়ার কোনো ভয় নেই। আর যা কিছু তিনি আমার প্রতি নাজিল করেছেন সেগুলো এই অনুভূতির সঙ্গে পৌঁছে দিই যে, আমি যদি এমনটি না করি তবে আমার প্রতি এমন বালা মুসিবত নাজিল হবে যার কবল থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না, সে যত বড়ই সুপারিশকারী হোক না কেন।

তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই আমাকে জানিয়েছেন, যে হুকুম এ মুহূর্তে আমার প্রতি নাজিল করা হয়েছে আমি যদি সেটা না পৌঁছে দিই তবে আমি যেন রেসালাতের কোনো কিছুই পৌঁছাইনি (বলে প্রতীয়মান হবে)। সেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ এ নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, তিনি আমাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন। আর আল্লাহর সত্তাই যথেষ্ট দয়াময়। তিনি আমার প্রতি এ ওহি নাজিল করেছেন,

> **"হে রাসূল, যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও। আর যদি এমনটি না করো তবে তো তুমি তাঁর রেসালাতই পৌঁছালে না, আর আল্লাহ মানুষের অনিষ্ট থেকে তোমাকে হেফাজত করবেন।"** (সূরা মায়েদা, আয়াত-৬৭)

হে উপস্থিত জনতা, যা কিছু তিনি নাজিল করেছেন সেগুলো পৌঁছে দেয়াতে আমি কোনো কার্পণ্য করিনি। আর এখন আমি এ আয়াতের শানে নুজুলও

তোমাদের জন্য স্পষ্টাকারে ব্যক্ত করছি। এর আগে জিবরাইল আমার নিকট এ হুকুমটি তিনবার নিয়ে এসেছেন।

আমার প্রভুর পক্ষ থেকে সালামসহ যিনি নিজেই সালাম এবং সালামের উৎস, আমি যেন এ স্থানে দাঁড়িয়ে যাবতীয় কালো ও সাদাকে এ সংবাদ দিই যে, "আলী ইবনে আবি তালিব হলো আমার ভাই, আমার ওয়াসি, আমার খলিফা ও আমার পরবর্তী ইমাম। আমার সঙ্গে তাঁর মর্যাদা ও সম্পর্ক ঠিক তদ্রূপ যেমন নবী মূসার সঙ্গে হারুনের ছিল। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, আমার পরে আর কেউ নবী হবে না। আল্লাহ ও আমার পরে সে (আলী) তোমাদের ওলি (অভিভাবক)।"

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালা স্বীয় কিতাবে আমার প্রতি একটি আয়াতই নাজিল করেছেন,

> **"নিশ্চয়ই তোমাদের ওলি-আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঐ সকল মুমিন বান্দাগণ যারা নামাজ কায়েম করে ও রুকু অবস্থায় জাকাত দেয়"।** (সূরা মায়েদা, আয়াত-৫৫)

আর আলী ইবনে আবি তালিব নামাজে রুকু অবস্থায় জাকাত দিয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সন্তুষ্টির প্রতি সে সর্বদাই খেয়াল রাখে। আর আমি জিবরাইলের নিকট ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম যে, আল্লাহ যেন এই হুকুমটি তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়া থেকে আমাকে ক্ষমা করেন। কারণ, আমি জানি যে, খোদাভীরুদের সংখ্যা অনেক কম আর মুনাফিকদের সংখ্যা অধিক। আর গুনাহকারীদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা আর ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল। এরা হলো সেসকল মানুষ যাদের আলোচনা আল্লাহ তায়ালা এভাবে করেছেন:

> **"তারা আপনা জিহ্বা দ্বারা তাই বলে থাকে যা তাদের হৃদয়ে থাকে না। আর তারা সেগুলোকে অতি সাধারণ কথা মনে করে অথচ আল্লাহর কাছে তা অনেক কঠিন বিষয়।" আর এরা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এমনকি তারা আমার নাম রেখেছিল এবং বলেছিল যে, এ হলো বক্র আর বক্র বুঝেছিল যে, আমি এরকমই। তা এ জন্য যে, আমি আলীকে নিজের পাশে বেশি বেশি রাখি এবং তার প্রতি অধিক মনোযোগ দিই। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে আমার প্রতি এ আয়অতটি নাজিল করেন, "আর তাদের মধ্যে অনেক এমনও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে যে, সে হলো**

বক্র আর বক্র, তোমাকে যারা এমনটি ভাবে, হে রাসূল, তুমি তাদের উত্তরে এ কথা বলে দাও যে, তোমাদের জন্য তাঁর বক্র হওয়াই অনেক উত্তম।"

আর আমি যদি তাদের নাম বলে দিতে চাই তবে বলে দিতে পারি। আর যদি তাদের প্রতি ইঙ্গিত করতে চাই তাও করে দিতে পারি। আর যদি তাদের ঠিকানা বলে দিতে চাই তাও বলে দিতে পারি। তবে আল্লাহর কসম! আমি তাদের যাবতীয় ব্যবহারের প্রতি ভদ্রতাসুলভ আচরণ করেছি। আল্লাহ তায়ালা আমার কোনো আপত্তি কবুল করছেন না এবং এ হুকুম দিচ্ছেন যে, আমার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে তা পৌঁছে দিই।

এরপর রাসূল (দ.) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

"হে রাসূল, যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি নাজিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও। আর তুমি যদি এরূপ না করো তবে রেসালাতের কোনো কিছুই পৌঁছালে না আর আল্লাহ মানুষের ক্ষতি থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন।"

হে লোকসকল, জেনে রাখো যে, আল্লাহ অবশ্যই আলীকে তোমাদের জন্য এমন ওলি ও ইমাম মনোনীত করে দিয়েছেন, যার আনুগত্য করা মুহাজির ও আনসার এবং তাদের প্রতি ওয়াজিব যারা উত্তম কাজে তাদেরকে অনুসরণ করে এবং তাদের প্রতিও যারা জঙ্গলে বাস করে আর তাদের প্রতিও যারা শহরে বাস করে। তদ্রূপ প্রত্যেক অনারব আর প্রত্যেক আরবের প্রতি, প্রতৌক স্বাধীনের প্রতি ও প্রত্যেক সাদার প্রতি এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতিও আবশ্যক যারা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ঈমান রাখে। তারই নির্দেশ জারি হবে, তার কথা মান্য করা ওয়াজিব হবে, তারই আদেশ কার্যকরী হবে। যে তার বিরোধিতা করবে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ আসবে। রহমতের হকদার সে-ই হবে যে তাকে অনুসরণ করবে এবং যে তার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করবে। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ মাগফিরাতের যোগ্য বলে ঘোষণা প্রদান করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকেও যে আলীর কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।

হে জনমণ্ডলী, এটাই হলো শেষ অবস্থা আর শেষবারে ন্যায় সুযোগ যে, আমি সবার সামনে তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করছি। তার কথা শুনো ও আনুগত্য করো এবং নিজ প্রভুর হুকুম মান্য করো, যেহেতু আল্লাহ জাল্লা শানুহু তোমাদের ইলাহ ও তোমাদের ওলি। তারপর তাঁ রাসূল মুহাম্মদ তোমাদের

ওলি, যে তোমাদে সঙ্গে স্পষ্টাকারে কথা বলে। তারপর যিনি তোমাদের প্রভু, সেই আল্লাহর হুকুম অনুসারে আলীও তোমাদের ওলি ও ইমাম। অতঃপর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমার ইমামত আমার বংশধারায় জারি থাকবে, যা এর (আলীর) ঔরস থেকে হবে। এ ধারাবাহিকতা ঐ দিন পর্যন্ত জারি থাকবে যখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে আখেরাতে উপস্থিত হবে।

কোনো জিনিস হালাল থেকে পারবে না ঐগুলো ব্যতীত যেগুলোকে আল্লাহ হালাল ঘোষণা করেছেন আর কোনো জিনিস হারাম হবে না ঐগুলো ব্যতীত যেগুলোকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। আমাকে আল্লাহর হারাম ও হালালের পরিচয় দান করেছেন আর আমিও ঐগুলো এর (আলীর) কাছে সোপর্দ করে দিয়েছি। কিতাবের জ্ঞান যা আমার প্রভু আমাকে দান করেছিলেন এবং হালাল-হারামেরও জ্ঞান।

হে মানবসকল, একে (আলীকে) বাদ দিয়ে অন্যত্র চলে যেয়ো না। তার থেকে আলাদা হয় না। আর তাকে হাকিম (শাসক) বানানোর ক্ষেত্রে বিমুখতা প্রদর্শন করো না। কারণ, সেই (আলীই) হকের প্রতি হিদায়েত করবে এবং সেই সত্যের ওপর আমল করবে। আর সেই বাতিলকে মুছে ফেলবে এবং সেই বাতিল থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। আর আল্লাহর কাজ বাস্তবায়ন করা থেকে কারো কোনো নিন্দা তাকে পথরোধ করতে সক্ষম হবে না। এরপর আরো জেনে রাখো যে, সেই হলো প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছে আর রাসূলের প্রতি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। আর রাসূলের সঙ্গে থেকে এমন অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করত যে, সে ছাড়া পুরুষদের মধ্য থেকে আর কেউ রাসূলের সঙ্গী ছিল না।

হে উপস্থিত জনতা, তার ফজিলতকে অভিনন্দন জানাও যেহেতু আল্লাহ তাকে ফজিলত প্রদান করেছেন আর তার ইমামতকে মান্য করো যেহেতু আল্লাহ তাকে ইমাম নিযুক্ত করেছেন।

হে লোকসকল, সে হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমাম। আর আল্লাহ এমন কোনো ব্যক্তির তওবা কবুল করবেন না, যে তার ইমামতকে অস্বীকার করবে আর কস্মিনকালেও তাকে তিনি মাফ করবেন না। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনই হবে যে, যে ব্যক্তি আলীর হুকুমের বিরোধিতা করবে, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন যে, তাকে চিরকালের জন্য কঠিন আজাব দিবেন। কাজেই তোমরা তার বিরোধিতা করা থেকে বাঁচো, যাতে ঐ আগুনে ঝাঁপিয়ে না পড়ো

যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। আর তা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

হে জনমণ্ডলী, আল্লাহর কসম পূর্ববর্তী নবীদের নিকট আমারই আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল আর আমিই সকল নবী ও রাসূলের সর্বশেষে ও সকল মখলুক তথা সৃষ্টির জন্য সর্ব প্রথম হুজ্জত বা দলিল। কাজেই যে ব্যক্তি আমার এ কথার প্রতি সন্দেহ পোষণ করবে সে সব কিছুর প্রতিই সন্দেহ পোষণ করল। আর যে যাবতীয় বস্তুর প্রতি সন্দেহ পোষণ করল, তার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত আছে।

হে মানবসকল, আল্লাহ তায়ালা যাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার মাধ্যমে যা আমার প্রতি প্রতিনিয়ত নাজিল হচ্ছে, তিনি এ ফজিলত আমাকে দান করেছেন। সেই আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। আমার পক্ষ থেকে চিরকালব্যাপী তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা প্রতি অবস্থাতে ও প্রতিনিয়ত হোক।

হে উপস্থিত জনতা, আলীকে শ্রেষ্ট জানো, সে আমার পরে কি পুরুষ, কি নারী, সবার চেয়ে শ্রেষ্ট। আমাদের কারণেই আল্লাহ তায়ালা রিজিক নাজিল করে থাকেন, আর তাদ্বারা সমস্ত মাখলুকের জীবন বেঁচে আছে। যে ব্যক্তি আমার এই কথাকে রদ করবে সে হবে অভিশপ্ত, যদিও তার ধারণামতো নো হয়। জেনে নাও যে, জিবরাইল আমিন আল্লাহর তরফ থেকে আমাকে খবর দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আলীর সঙ্গে শত্রুতা করবে এবং তাকে বন্ধু গণ্য করবে না তার প্রতি আমার লানত ও গজব নাজিল হবে। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য বিবেচনা করা আবশ্যক হবে যে, সে আগামীকালকের জন্য কী পাঠাচ্ছে। আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর বিরোধিতা করো না। আর দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান করো, যেন পদস্খলন না ঘটে। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু করো আল্লাহ তা জানেন।

হে লোকসকল, সে (আলী) জুনুবাল্লাহ। (তাঁর ব্যপারে) আল্লাহ তাঁর কিতাবে এ আয়াত নাজিল করেছেন যে, "কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলবে যে, আক্ষেপ করছি আমি জুনুবাল্লাহর ব্যাপারে কতই না কার্পণ্য করেছি।"

হে জনমণ্ডলী, কুরআন মাজীদের আয়াতগুলোর প্রতি অনেক চিন্তা করো, তার আয়াতগুলোকে বুঝতে চেষ্টা করো এবং তার স্পষ্ট বিষয়াবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করো, তার অস্পষ্ট বিষয়াবলির অনুসরণ করো না। আল্লাহর কসম কুরআনের উপদেশ, তিরস্কার ও সাবধানবাণীগুলোকে কেউ সহীহ-শুদ্ধভাবে ব্যক্ত করবে

না এবং তার ব্যাখ্যাকে স্পষ্ট করবে না। কেবল এ ব্যক্তি (আলী) ছাড়া, যার হাত আমি ধারণ করে আছি এবং যাকে আমি আমার দিকে তুলে ধরে আছি, আর যার বাহু আমি ধরে রেখেছি। আর বলে দিচ্ছি, অবশ্যই আমি যার মাওলা, এ আলীও তার মাওলা। আর এ আলী ইবনে আবি তালিব হলো আমার ভাই, আমার ওয়াসি। তার এই ওলি হওয়াটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর তিনি এ হুকুম আমার প্রতি নাজিল করেছেন।

হে মানবসকল, এ আলী ও আমার সন্তানদের মধ্য থেকে যারা মাসুম (নিষ্পাপ), তারা সকলেই সিকলে আসগর (হালকা ওজনবিশিষ্ট) আর কুরআন হলো সিকলে আকবর (ভারী ওজনবিশিষ্ট)। আর এদের মধ্যকার প্রত্যেকেই হলো আপন সঙ্গীর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানদানকারী এবং তার প্রতি আনকূল্য প্রদর্শনকারী। এ দুটো কখনোই আলাদা হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার নিকট পৌঁছবে। এরা হলো আল্লাহর সৃষ্টি, তারা আমিন (বিশ্বস্ত বা সত্যবাদী) এবং আল্লাহর জমিনে তারই মনোনীত হাকিম (শাসক)

জেনে নাও যে, আমি জানিয়ে দিলাম। বুঝে নাও যে, আমি বুঝিয়ে দিলাম। সাবধান হয়ে যাও যে, আমি শুনিয়ে দিলাম। সাবধান হয়ে যাও যে, আমি খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করে দিলাম। চিন্তা করো, আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেছেন, আর আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে বলে দিলাম। বুঝে নাও যে, আমার এ ভাই ব্যতীত অন্য কেউ আমিরুল মুমিনীন হবে না এবং আমার পরে সে ছাড়া অপর কারো জন্য মুমিনদের নেতৃত্ব করা জায়েয হবে না। [অতঃপর রাসূল (দ.) হযরত আলীর বাহু ধরে তাঁকে আরো উঁচু করে ধরলেন, এমনকি তাঁর পা রাসূল (দ.)-এর হাঁটু সমান উঠে এলো] অতঃপর আবার বললেন :

হে উপস্থিত জনতা, এ হচ্ছে আলী, আমার ভাই ও আমার ওয়াসি আর আমার জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা এবং আমার উম্মতের প্রতি ও আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যার প্রতি আমার খলিফা এবং আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী। আর যে যাবতীয় বিষয় আল্লাহ পছন্দ করেন সেগুলোর প্রতি আমলকারী, আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধকারী, আল্লাহর আনুগত্যে বন্ধুত্বকারী, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বাধা প্রদানকারী, আল্লাহর রাসূলের খলিফা, মুমিনদের আমির, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর দিকনির্দেশক আর আল্লাহর হুকুমের যারা আনুগত্য ভঙ্গ করেছে, যারা বিপথগামী এবং ধর্মের সত্য উপলব্ধিতে যারা ব্যর্থ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী।

আমি আমার প্রভুর হুকুমের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি এবং আমার কথা পাল্টানো যাবে না। আমি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী এ কথা বলছি যে, "হে আল্লাহ, তুমি তাকেই বন্ধু হিসেবে গণ্য করো যে একে (আলীকে) বন্ধু গণ্য করে আর তাকেই শত্রু গণ্য করো, যে একে শত্রু গণ্য করে এবং তার ওপর লানত (অভিসম্পাত) করো, যে একে অস্বীকার করে এবং তার প্রতি গজব নাজিল করো, যে এর অধিকারকে অস্বীকার করে।

হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতি এ আয়াত নাজিল করেছ যে, ইমামত হচ্ছে তোমার ওলি আলীর জন্য, আর আমি যখন তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করে দিলাম এবং আলীকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে দিলাম তখন তুমি সেই আয়াত নাজিল করলে যার মাধ্যমে স্বীয় বান্দাদের ধর্মকে পরিপূর্ণতা দান করলে এবং তাদের প্রতি তোমার নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিলে। আর তুমি তাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে পছন্দ করলে।" তারপর তুমি ইরশাদ করলে যে, "যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" হে আল্লাহ, আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তোমার সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি।

হে লোকসকল, এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আপন দ্বীনকে ইমামতের সঙ্গেই পূর্ণতা দান করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি একে ইমাম বলে মানবে না, আর এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আমার সন্তান এং এর (আলীর) ঔরস থেকে যারা এর স্থলাভিষিক্ত হবে, তাদেরকেও ইমাম মানে না তাহলে তাকে যখন আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে তখন সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের যাবতীয় আমল ধ্বংস ও বিফল হয়ে যাবে। তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের আজাবে কোনো কমতি করবেন না, আর তাদেরকে কোনো অবকাশও দেয়া হবে না।

হে জনমণ্ডলী, তোমাদের সকলের চেয়ে সে আমার অধিক সাহায্যকারী, আর তোমাদের সবার চেয়ে আমার কাছে বেশি হকদার এবং তোমাদের সকলের চেয়ে আমার অধিক স্নেহের এবং আল্লাহ ও আমি উভয়েই তার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক এমন কোনো আয়াত নেই যা তার ব্যাপারে নাজিল হয়নি। আর মুমিনদের উদ্দেশ করে আল্লাহ কোনো স্থানেই আহ্বান করেননি বরং মূল আহ্বান তার প্রতিই করেছেন এবং কুরআন মজীদে প্রশংসার এমন কোনো আয়াত নেই যা তার শানে নাজিল হয়নি। আর আল্লাহ সূরা 'দাহার' - এ বিশেষ করে তারই জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর উক্ত সূরা তার

ছাড়া অন্য কারো শানে নাজিল হয়নি। আর সে (আলী) ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা সেখানে করেননি।

হে মানবসকল, সে হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের বিজয়দানকারী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহকারী। সে হলো পবিত্র আর আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য মনোনীত এবং নিজে হেদায়েতপ্রাপ্ত। তোমাদের নবী সর্বোত্তম নবী এবং তোমাদের ওয়াসি সর্বোত্তম ওয়াসি। আর সর্বোত্তম ওয়াসিরা তার সন্তানদের মধ্য থেকেই হবে।

হে উপস্থিত জনতা, প্রত্যেক নবীর বংশধারা তাদের নিজেদের ঔরসের মাধ্যমে, আর আমার বংশধারা আলীর ঔরসের মাধ্যমে।

হে লোকসকল, ইবলিস আদমকে বিদ্বেষের ফলেই জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। কাজেই তোমরা আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। নতুবা তোমাদের সমস্ত আমল ধ্বংস ও নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমাদের পদস্খলন ঘটবে। আদমকে কেবল একটি ভুলের কারণে জমিনে নামানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি আল্লাহর মনোনীত বান্দা ছিলেন। তাহলে তোমাদের অবস্থা কেমন হবে! যে অবস্থায় তোমরা আছো ও যা কিছু তোমাদের রয়েছে। আর তোমাদের সঙ্গে কিছুসংখ্যক আল্লাহর শত্রুও আছে।

সাবধান থেকো! পাষাণ হৃদয় ব্যতীত আলীর প্রতি কেউ বিদ্বেষ পোষণ করবে না, আর পছন্দনীয় ব্যক্তি ব্যতীত আলীর কেউ বন্ধু হবে না। খাস মুমিন ব্যতীত কেউ তার প্রতি ঈমান আনবে না। আল্লাহর কসম, আলী সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা সূরা 'আসর' নাজিল করেছেন।

"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে যিনি অসীম করুণাময় ও দয়াশীল। মহাকালের কসম। নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে এবং পরস্পর হক ও ধৈর্যের উপদেশ প্রদান করেছে।"

হে জনমণ্ডলী, আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রাখছি এবং স্বীয় রেসালাত তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। আর রাসূলের দায়িত্ব স্পষ্টরূপে সংবাদ পৌঁছে দেয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হে মানবসকল, আল্লাহকে ভয় করো যেমন তাঁকে ভয় করার অধিকার তাঁর রয়েছে। আর কিছুতেই মৃত্যুবরণ করো না যতক্ষণ না তুমি আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছ।

হে উপস্থিত জনতা, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো, তাঁর রাসূলের প্রতি, আর ঐ নূরের প্রতি যা তাঁর সঙ্গেই নাজিল হয়েছে, তার পূর্বেই যখন আমি তাদের চেহারাকে বিকৃত করে দেন এবং তাকে তাদের পিঠের দিকে ফিরিয়ে দেব।

হে লোকসকল, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতের নূর আমার সত্তার মধ্যে আছে। আর তা আলীর কাছে স্থানান্তরিত হবে। তারপর তার বংশধারা মাহদী পর্যন্ত কায়েম থাকবে। সে আল্লাহর অধিকারের বিষয়ে জবাবদিহি করবে আর আমাদের সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারেও। এ জন্য যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাকে হুজ্জত নিযুক্ত করেছেন পুরো জগৎবাসীর প্রতি, গুরুতর অপরাধীদের প্রতি, শত্রুতা পোষণকারীদের প্রতি, বিরোধিতাকারীদের প্রতি, পথভ্রষ্টদের প্রতি, পাপাচারীদের প্রতি এবং জুলুমকারীদের প্রতি।

হে জনমণ্ডলী, আমি তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছি যে, আমি হলাম তোমাদের প্রতি আল্লাহর মনোনীত রাসূল। আমার আগে আরো রাসূল গত হয়েছেন। আমি মৃত্যুবরণ করব কিংবা আমাকে হত্যা করা হবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তবে সে আল্লাহর কখনো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন। জেনে নাও যে, আলী হচ্ছে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার প্রতীক এবং তার পরে আমার ঐ সমস্ত সন্তান যারা তার ঔরস থেকে আসবে।

হে মানবসকল, তোমরা আল্লাহর প্রতি তোমাদের ইসলামের করুণা প্রদর্শন করো না, নতুবা তিনি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং তাঁর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি আজাব আসবে। নিশ্চয়ই তিনি এমন অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন।

হে উপস্থিত জনতা, অতি সত্বর আমার পরে এমন লোকেরা নেতা হবে যারা জাহান্নামের প্রতি আহ্বান করবে। আর কিয়ামত দিবসে তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

হে লোকসকল, আল্লাহ এবং আমি উভয়ে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

হে জনমণ্ডলী, নিশ্চয়ই তারা এবং তাদেরকে বন্ধুগণ্যকারী, আর তাদের অনুসরণকারী ও তাদের সাহায্যকারীরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। অহঙ্কারকারীদের আবাস তো এমনই খারাপ হবে। জেনে রাখো যে, এ সকল লোকই কেতাব লেখক হবে। এবার তোমরা ঐ লেখাগুলো প্রতি দৃষ্টিপাত করো।

হে মানবসকল, আমি ইমামত ও উত্তরাধিকার এই দুটি বিষয়কে কিয়ামত পর্যন্ত আপন বংশধারায় রেখে যাচ্ছি। আর আমার প্রতি যে কথা পৌঁছে দেয়ার আদেশ হয়েছিল সে কথা আমি পৌঁছে দিয়েছি, যেন প্রমাণ হয়ে যায় উপস্থিত আর অনুপস্থিতদের প্রতি এবং ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে আর যারা উপস্থিত নেই এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি যারা জন্মগ্রহণ করেছে আর যারা জন্মগ্রহণ করেনি। সে জন্য প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি অবশ্যই কর্তব্য হবে তারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এ খবরটি পৌঁছে দেয় আর প্রত্যেক পিতার অবশ্যই কর্তব্য হবে যেন নিজ সন্তানের নিকট এ সংবাদটি পৌঁছে দেয়। আর এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই অব্যাহত থাকবে। আর যারা অদূর ভবিষ্যতে এটাকে জবরদখলের রাজত্ব বানিয়ে নেবে, জেনে নাও, আল্লাহ জবরদখলকারীদের এবং তাদের সঙ্গী-সাথিদের প্রতি অভিশাপ করবেন। আর হে উভয় দলভুক্তরা! আমি তখন তোমাদের হিসাব নেয়ার জন্য (তোমাদের দায় দায়িত্ব থেকে) দ্রুতই মুক্ত হয়ে যাব। তারপর দু'দলের প্রতিই অগ্নিশিখা এবং গলিত (উত্তপ্ত) তামা পাঠানো হবে, তা তোমাদেরর দু'দলের কেউই ঠেকাতে সক্ষম হবে না।

হে উপস্থিত জনতা, নিশ্চয়ই যে অবস্থাতে তোমরা আছো সে অবস্থাতেই আল্লাহ তোমাদের ছাড়বেন না, যতক্ষণ না মন্দদের মধ্য থেকে ভালোদের আলাদা করে নিচ্ছেন। আর আল্লাহর কাজ এটা নয় যে, তিনি গায়েব সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবেন।

হে লোকসকল, কোনো জনপদ এমন নেই যে, সেখানকার অধিবাসীরা (আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করে, কিন্তু আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন না। সুতরাং জুলুমকারী প্রত্যেকটি জনপদকে ধ্বংস করা হবে, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন। এ (আলী) হচ্ছে তোমাদের ইমাম ও তোমাদের ওলি (অভিভাবক), আর এগুলোই হলো আল্লাহর ওয়াদাসমূহ। আর তার (আলীর) সঙ্গে আল্লাহ যে সমস্ত ওয়াদা করেছেন সেগুলো সত্য করে দেখাবেন-ই।

হে জনমণ্ডলী, তোমাদের পূর্বে অনেক পথভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহ পথভ্রষ্টতার ফলে পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছেন এবং তিনি পরবর্তীদেরও ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন।

হে মানবসকল, আল্লাহ আমাকে আদেশও করেছেন এবং নিষেধও করেছেন। আলী আদেশ ও নিষেধের জ্ঞান আল্লাহর নিকট থেকে হাসিল করেছে। আর আমিও আলীকে আদেশ করেছি এবং নিষেধও করেছি। কাজেই তোমরা তার আদেশ মান্য করলে সুখে ও শান্তিতে থাকবে, তোমরা তার আনুগত্য করো তবে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। সে যে বিষয়ে তোমাদের বারণ করে সেটা থেকে বিরত থাকো, তাহলে সঠিক পথে থাকবে, আর যেদিকে সে নিয়ে যেতে চায় সেদিকেই যাবে। বিভিন্ন পথ রয়েছে, ঐ পথগুলো তোমাদের যেন তার পথ থেকে সরিয়ে না দেয়। আমি হলাম আল্লাহর সিরাতে মুস্তাকীম, যার আনুগত্য করার আদেশ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। অতঃপর আমার পরে (সিরাতে মুস্তাকীম) হলো আলী, তারপর আমার সন্তানগণ যারা তার ঔরস থেকে হবে, তারাই ইমাম হবে, তারাই সত্যের পথপ্রদর্শক এবং হকের প্রতি ন্যায়পরায়ণ।

অতঃপর রাসূল (দ.) সূরা আল হাম্‌দ তিলাওয়াত করেন, "পরম করুণাময় আল্লাহর নামে যিনি অসীম করুণাময় ও দয়াশীল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। রহমান ও রহিম। হিসাবের দিনের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি। তুমি আমাদের সোজা পথে দৃঢ় রাখো। তাঁদের পথে পরিচালনা করো যাঁদের প্রতি তুমি নেয়ামত বর্ষিত করেছ, তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে, আর না যারা পথভ্রষ্ট।"

সূরা আল হাম্‌দ আমার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে এবং এদের (ইমামদের) জন্য সাধারণভাবে আর এদের জন্যই বিশেষভাবে (খাস)। তারাই আল্লাহর ওলি, যাদের আগামী দিনের জন্য কোনো ভয়ভীতি থাকবে না, আর না বিগত দিনগুলোর জন্যও তাদের কোনো প্রকার অনুশোচনা থাকবে। জেনে নাও যে, আল্লাহর দলের লোকেরাই বিজয়ী হবে। বুঝে নাও যে, আলীর দুশমন তো তারাই যারা আল্লাহর নাফরমানি করে এবং জুলুম করে থাকে। আর তারা হলো ঐ সকল শয়তানের ভাই, যারা ধোঁকা দেয়ার জন্য একে অপরের কানে মিষ্টি মিষ্টি কথা ফুঁকে দেয়। জেনে নাও, এদের (ইমামদের) যত বন্ধু রয়েছে তারাই প্রকৃত মুমিন, পবিত্র কিতাবে আল্লাহ তায়ালা যাদের আলোচনা করেছেন। সেজন্য ঘোষণা করেছেন, "যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান পোষণ করে তুমি ঐ লোকগুলোকে ঐ সমস্ত লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা

করেছে।" জেনে রাখো যে, এদের সঙ্গে তারাই বন্ধুত্ব রাখে, যাদের গুণাবলি আল্লাহ জাল্লাশানুহু এভাবে ব্যক্ত করেছেন, "যার ঈমান এনেছে আর নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সঙ্গে মিশ্রিত করেনি, শান্তি ও সন্তুষ্টি তাদেরই জন্য সংরক্ষিত এবং তারাই হলো হেদায়েতপ্রাপ্ত।"

সতর্ক থেকো, যারা এদের (ইমামদের) বন্ধু গণ্য করো তারা সুখ ও শান্তিতে বেহেশতে যাবে এবং ফেরেশতাগণ এদেরই সালাম দিতে দিতে এবং এই কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসবে, "তোমরা হলে পূতপবিত্র। এবার জান্নাতসমূহে চিরকালের জন্য বসবাস করো।" জেনে নাও যে, তারা হলো এদেরই বন্ধু যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন যে, "তারা বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

জেনে নাও, তাদের (ইমামদের) শত্রু তো তারাই যারা উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। ভুলে যেয়ো না যে, এদের শত্রু তো তারাই হবে যারা জাহান্নামে আহাজারি শুনবে, যখন আগুনের লেলিহান শিখা আঘাত করবে তখন তাদের চিৎকার বেরিয়ে পড়বে এবং তার মাঝে অবস্থানকারী দলকে অভিশাপ দেবে। বুঝে নাও যে, তারা তো তাদেরই শত্রু যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "কোনো দলকে যখন তার (জাহান্নামের) মধ্যে ফেলা হবে তখন তার রক্ষক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমাদের কাছে কি ভীতিপ্রদর্শনকারী কেউ গিয়েছিল? আর তারা বলবে, ভীতিপ্রদর্শনকারী তো এসেছিল।" উক্ত আয়াতেই আল্লাহ আরো বলেছেন, "দোজখবাসীরা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকবে।" তাহলে জেনে নাও যে, তারা তো তাদেরই বন্ধু, যারা না দেখে আল্লাহকে ভয় করে, তাদের গোনাহের জন্য ক্ষমা ও বড় প্রতিদান রয়েছে।

হে উপস্থিত জনতা, জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন আর জান্নাতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আমাদের শত্রু তো সে-ই, আল্লাহ যার নিন্দা করেছেন এবং তার প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। আর আমাদের বন্ধু তো সে-ই, যাকে আল্লাহ তায়ালাও বন্ধু গণ্য করেন এবং তার প্রশংসা করেন। স্মরণ রাখো, আমি ভীতিপ্রদর্শনকারী, আর আলী কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের পথপ্রদর্শক।

হে লোকসকল, আমি আল্লাহর নবী, আর আলী আমার ওয়াসি। জেনে নাও যে, শেষ ইমাম মাহদী আমাদের উভয়ের রক্তের ধারা থেকে হবে। সাবধান হও যে, সেই সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয় লাভ করবে। এটা জেনে নাও যে, সে-ই (মাহদী) জালেমদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নেবে। খেয়াল রাখো যে,

সে-ই দুর্গসমূহ জয় করবে এবং সেগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত করবে। জেনে নাও যে, মুশরিকদের সমস্ত সম্প্রদায়কে সেই হত্যা করবে। খেয়াল রাখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের সর্বপ্রকার অবৈধ রক্তপাতের বদলা সেই নেবে। বুঝে নাও যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দ্বীনকে সেই বিজয়ী করবে। স্মরণ রাখো যে, এ গভীর সাগরে সবচেয়ে অধিক সাহায্য সহযোগিতা সেই পাবে। জেনে রাখো সমস্ত ফজিলতপ্রাপ্তের ফজিলত এবং সমস্ত মূর্খের পরিচয় সেই তুলে ধরবে। জেনে রাখো যে, সেই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উত্তরাধিকারী আর উক্ত জ্ঞানের প্রতি সেই পূর্ণাঙ্গ দখল রাখবে। আরো জেনে নাও যে, সেই হবে স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে সংবাদদাতা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমানসংক্রান্ত যাবতীয় কথা প্রচারকারী। স্মরণ রাখো যে, সেই হবে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, জ্ঞানী আর ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব। একথাও জেনে রাখো যে, সকল ব্যাপার তার নিকট হস্তান্তরিত হবে। এটাও স্মরণ রাখো যে, এর আগে যারা বিদায় নিয়েছেন (অথাৎ নবী-রাসূলগণ) তাঁরা সকলে তারই শুভ সংবাদ দিয়ে গেছেন। উত্তমরূপে বুঝে নাও যে, আল্লাহর হুজ্জত (দলিল) রূপে সেই বেঁচে থাকবে এবং তারপর আর কোনো হুজ্জত হবে না। সত্য কেবল তার সঙ্গেই থাকবে। আর নূর কেবল তার কাছেই থাকবে। ভালো করে বুঝে নাও যে, তাকে কেই পরাস্ত করতে সক্ষম হবে না এবং তার বিরুদ্ধে কেউ জয়ী থেকে পারবে না। স্মরণ রাখো যে, সে হচ্ছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ওয়ালি আর আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে তাঁর কর্তৃক নিযুক্ত হাকিম (শাসক) এবং জাহের ও বাতেনের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে আমানত রক্ষাকারী ও সত্যবাদী।

হে জনমণ্ডলী, আমি তোমাদের জন্য হাকিকতকে (মূল সত্যকে) সু-স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করলাম আর তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম। এখন থেকে এই আলী তোমাদের বুঝাবে। জেনে নাও যে, আমার ভাষণ সমাপ্ত করার পর আমি তোমাদের আহ্বান জানাব আলীর হাতে বাইয়াত তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য এবং সেটার স্বীকারোক্তি ঘোষণা করার জন্য, যেন আমার হাত তার হাত, আমার পরে তার (আলীর) হাতে হাত রাখবে। জেনে নাও যে, আমি আল্লাহর বাইয়াত করেছি আর আলী স্বয়ং আমার বাইয়াত করেছে আর আমি আল্লাহর নির্দেশক্রমে তার বাইয়াত তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করছি। এরপর যে এ বাইয়াত ভঙ্গ করবে, তার ক্ষতি তার নিজের-ই ধ্বংসের প্রতি বর্তাবে।

হে মানবসকল, সাফা ও মারওয়া হলো আল্লাহর নিদর্শন। কাজেই যে ব্যক্তি খানায়ে কাবার হজ করবে কিংবা উমরা করবে, এ দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাওয়াফ করাতে কোনো পাপ নেই (বরং সওয়াব)

হে উপস্থিত জনতা, কাবাগৃহের হজ করবে, কারণ যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর উদ্দেশে যাবে সে ঐশ্বর্যশালী হয়ে যাবে। আর যে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করবে সে দরিদ্র হয়ে যাবে।

হে লোকসকল, যে মুমিন 'মওকুফে' (কাবা চত্বরের কাছে একটি স্থানের নাম) গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আল্লাহ তায়ালা তার পিছনের যাবতীয় গোনাহ উক্ত সময় পর্যন্ত ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই তার হজ সম্পন্ন হওয়ার পর সে যেন নিজের জীবন নতুনভাবে শুরু করে।

হে জনমণ্ডলী, হজ পালনকারীদের সাহায্য করা হবে, আর যা কিছু তাদের খরচ হবে তার তার বিনিময়ও তারা পাবে, আর আল্লাহ তায়ালা নেককারদের প্রতিদান নষ্ট করবেন না।

হে মানবসকল, বাইতুল্লাহর হজ দ্বীনের পূর্ণতা অনুযায়ী এবং ফিকহকে শুদ্ধভাবে সম্পাদন করো আর পূতপবিত্র স্থান থেকে তাওবা না করে এবং গোনাহের ইচ্ছা থেকে নিজের নফসকে পবিত্র না করে যেন ফিরে যেয়ো না।

হে উপস্থিত জনতা, নামাজ আদায় করবে এবং জাকাত প্রদান করবে যেমনটি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আদেশ করেছেন। যদি তোমাদের সময় বর্ধিত করা হয় তারপর তোমাদের দ্বারা গাফলতি হয়ে যায় অথবা ভুলে যাও তবে এ আলী হলো তোমাদের জন্য হাকিম। এ তোমাদের জন্য ঐ যাবতীয় সত্যকে প্রকাশ করবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমার পরে তাকেই নিযুক্ত করেছেন এবং তাকেই আমার ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন। আল্লাহর যে সকল কথা তোমরা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, সে তোমাদের বলে দেবে। আর যা কিছু তোমরা জানো না, সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট করে দেবে। জেনে নাও যে, হালাল ও হারামের সংখ্যা এতো অধিক যে, তার পরিধি নির্ণয় থেকে পারে না, আর না আমি সবটুকু তোমাদের নিকট পৌঁছাতে পারব। তবে হ্যাঁ, একই সময়ে হালালকে পালন করার আদেশ দিচ্ছি এবং হারাম কাজ করা থেকে বারণ করছি।

সুতরাং, জেনে নাও যে, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন আমিরুল মুমিনীন আলীর ব্যাপারে, আর তার পরে যারা ইমাম হবে (তাদের ব্যাপারে

তোমাদের নিকট হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করে নিই। কিয়ামত পর্যন্ত সকল ইমাম আমা এবং আলী থেকে হবে।

হে লোকসকল, ঐ সমস্ত হালাল যা আমি তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি এবং সমস্ত হারাম যা না করার জন্য আমি তোমাদের বারণ করেছি, উত্তমরূপে বুঝে নাও যে, আমি এ অবস্থান থেকে কখনো সরে দাঁড়াব না এবং কখনো বদলাব না। কাজেই তোমরাও এগুলো স্মরণ রাখবে এবং এগুলো সংরক্ষণ করবে এবং উক্ত বিষয়ে একে অপরকে নসিহত করবে। আর এগুলো বদলাবে না আর কখনো এগুলোর অবস্থার পরিবর্তন করবে না। দেখো, আমি আবার ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করছি, যেন স্মরণ থাকে, নামাজ আদায় করবে আর জাকাত দিবে, নেক কাজ করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ পালন করতে থাকবে। এটাও বুঝে নাও যে, নেকির হুকুম দেয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হবে এটাই যেন আমার কথা মোতাবেক হয়। আর যারা এ মুহূর্তে উপস্থিত নেই তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ো। আর তার নিকট আমার কথা স্বীকার করিয়ে নিবে এবং আমার কথার বিরোধিতা করা থেকে বিরত রাখবে। কারণ, এটাই হলো আল্লাহর আদেশ এবং আমারও আদেশ। আর ইমামাবিহীন অবস্থায় "আমর বিল মা'রূফ" সম্ভব নয় আর "নাহি আনিল মুনকারও" সম্ভব হবে না।

হে জনমণ্ডলী, কুরআন মাজীদ তোমাদের বলে দিচ্ছে যে, এর (আলীর) পরে আগত সকল ইমাম তারই বংশধারার মধ্য থেকে হবে। আর আমি এটাও তোমাদের বলে দিয়েছি যে, এ (আলী) আমার থেকে আর আমি তার (আলী) থেকে। যে সময় আল্লাহ তায়ালা এ কথা বলেছেন যে, "আর তিনি তার বংশধরদের মধ্যেই চিরঞ্জীব কালেমাকে স্থায়ী করে দিয়েছেন।" আর আমি তো তোমাদের এ কথা বলেই দিয়েছি যে, যতদিন তোমরা উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।

হে উপস্থিত জনতা, পরহেজগারি অবলম্বন করো, পরহেজগারি অবলম্বন করো, কিয়ামতকে ভয় করো, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ঐ সময়কার ভূমিকম্প খুবই কঠিন বিষয়", মৃত্যুকে ভয় করো, হিসাবের কথা স্মরণ করো, আল্লাহর দরবারে পরীক্ষা আর জিজ্ঞাসাবাদকে স্মরণে রাখো, সওয়াব ও আজাবকে স্মরণ করো। যে নেকি নিয়ে হাজির হবে তাকে সওয়াব দেয়া হবে, আর যে মন্দ নিয়ে উপস্থিত হবে জান্নাতে তার জন্য কোনো আবাস হবে না।

হে লোকসকল, তোমাদের সংখ্যা তার চেয়েও অধিক যে, একই সময়ে এক একজন করে বাইয়াত করতে পারবে। আর আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাদের কণ্ঠ থেকে এ কথার স্বীকারোক্তি নিই যে, আমি আলীকে মুমিনদের আমির মনোনিত করে দিয়েছি এবং তার পরে ঐ সকল ইমামের জন্য যারা আমার এবং এর (আলীর) সন্তানদের মধ্য থেকে হবে।

তবে এসো, এবার তোমরা সবাই সম্মিলিতভাবে বলো: "আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এবং নিজের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আলীর ব্যাপারে এবং ঐ সকল ইমামের ব্যাপারে যারা তার সন্তান হবে এবং তার ঔরস থেকে হবে, যা কিছু আপনি পৌঁছে দিয়েছেন, আমরা শুনেছি এবং আমরা তার প্রতি সম্মত আছি এবং আনুগত্য করার জন্য তৈরি আছি।

আমরা নিজেদের অন্তর, জীবন, জিহ্বা আর হাত দ্বারা ঐগুলোর প্রতি বাইয়াত করছি, সেগুলোর ওপরই আমরা বেঁচে থাকব এবং সেগুলোর ওপরই আমার মারা যাব এবং সেগুলোর ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকব। আমরা তাতে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করব না। তাতে কোনো সন্দেহকে প্রবেশ করতে দেব না এবং এ অঙ্গীকারকে কখনো ভঙ্গ করব না, আর না এ ঈমানকে ভঙ্গ করব।

আর আমরা আল্লাহর আনুগত্য করব, আপনার আনুগত্য করব এবং আমিরুল মুমিনীন আলীর আনুগত্য করব, আর ঐ সকল ইমামের আনুগত্য করব যারা তার (আলীর) সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। আর যাদের আপনি উল্লেখ করেছেন যে, আপনার ঔরস ও এর (আলীর) ঔরস থেকে হাসান ও হুসাইনের পরে হবে। হাসনাইনের (হাসান ও হুসাইন) সঙ্গ যে সম্পর্ক আমার নিকট তা আমি তোমাদের বলে দিয়েছি এবং উভয়ের মর্যাদা যা আমার প্রভুর নিকট আছে, সে সম্পর্কেও আমি তোমাদের উত্তমরূপেই দেখিয়ে দিয়েছি। এরা উভয়েই বেহেশতে যুবকদের সরদার, আর উভয়েই আপন পিতা আলীর পরবর্তী ইমাম। আর আমি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক আলীর পূর্বেই তাদের পিতা নিযুক্ত হয়েছি। আর এটাও বলো যে, আমরা এ বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য করলাম, আপনার আনুগত্য করলাম, আলীর আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম এবং হাসান ও হুসাইনের আনুগত্য আর ঐ ইমামদের আনুগত্য স্বীকার করলাম যাদের আলোচনা আপনি করেছেন। আমিরুল মুমিনিনের জন্য আমরা আমাদের অন্তর দিয়ে, জান দিয়ে, জিহ্বা দিয়ে আর এই ব্যক্তির (রাসূলের) হাতে হাত দিয়ে ওয়াদা করছি।

যিনি ঐ দুজনকে (হাসান ও হুসাইনকে) তার কোলে তুলেছেন এবং নিজের কথা দ্বারা ঐ দু'জনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। আমরা তাঁদের ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করব না। আর যতক্ষণ দেহে প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে কখনোই এ ওয়াদা থেকে ফিরে যাব না। আমরা আপনার তরফ থেকে এ কথা নিজেদের সন্তান ও পরিবারের দূরবর্তী ও নিকটবর্তী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেব। আমরা আল্লাহকে সাক্ষী মানছি। আর আল্লাহ সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট এবং আপনিও এ ব্যাপারে আমাদের সাক্ষী রইলেন এবং ঐ সকল ব্যক্তি সাক্ষী রইল যারা প্রাকশ্যে অথবা গোপনে আল্লাহর অনুগত। আর আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতাগণও তাঁর বাহিনী ও বান্দাগণও সাক্ষ্য রইলেন। আর সকল সাক্ষীর চেয়ে উত্তম স্বাক্ষী হলেন আল্লাহ তায়ালা।

হে জনমণ্ডলী, তোমরা কি এজন্য বলছ যে, আল্লাহ সকল আওয়াজকে চিনতে পারেন আর প্রত্যেক নফসের গোপন বিষয়কে জানেন? এখন যে হেদায়েত পাবে, তা হবে তার আপন সত্তার মঙ্গলের জন্য। আর যে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে সে তার নিজেরই সর্বনাশ করবে। আর যে বাইয়াত করবে, সে আল্লাহর সঙ্গে বাইয়াত করবে অর্থাৎ তার হাতের ওপর আল্লহর হাত থাকবে।

হে মানবসকল, আল্লাহকে ভয় করো। আর আমিরুল মুমিনীন আলী এবং হাসান ও হুসাইন আর ঐ সকল ইমামের প্রতি বাইয়াত করে নাও যারা আল্লাহর অবশিষ্ট কলেমা। (এরপর) যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন, আর যে বিশ্বস্ত থাকবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দয়া করবেন। আর যে এ বাইয়াত ভঙ্গ করবে, তা ভঙ্গ করার ক্ষতি তার আপন সত্তার ওপর আপতিত হবে।

হে উপস্থিত জনতা, যা কিছু আমি তোমাদের বলছি, তা-ই বলো। আর এই মুহূর্ত থেকেই আলীকে আমিরুল মুমিনীন বলে সালাম কর। আর এ কথাও বলো যে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের প্রভু, আমরা তোমারই অনুগ্রহ কামনা করি এবং তোমার দিকেই জিজ্ঞাসিত হব আর এ কথাও বলো যে, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত, যিনি আমাদের সমস্ত কথার হেদায়েত করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ যদি আমাদের পথ প্রদর্শন না করতেন তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না।

হে লোকসকল, আল্লাহর কাছে আলী ইবনে আবি তালিবের মর্যাদা অনেক। আর তিনি কুরআনে যা কিছু আমার প্রতি নাজিল করেছেন তা এর চেয়েও

অনেক বেশি যা আমি একটি স্থানে একটি ভাষণে ব্যক্ত করতে পারব না। তারপর যদি কোনে লোক তোমাদের ঐ সকল ফাজায়েল বলে এবং বুঝিয়ে দেয় তবে তোমরা সেগুলো সত্যায়ন করবে।

হে জনমণ্ডলী, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের এবং আলী আর ঐ সকল ইমামদের আনুগত্য করবে, যাদের আলোচনা আমি করেছি। তবে সে নিশ্চিতরূপে সাফল্য লাভ করবে।

হে মানবসকল, যারা আলীর সঙ্গে বাইয়াত করতে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আর তাকে আমিরুল মুমিনীন স্বীকার করতে আগ্রগামী হবে, জান্নাতের নেয়ামতের ব্যাপারে তারাই কৃতকার্য হবে।

হে উপস্থিত জনতা, সে কথাই বলো, যে কথা বলাতে আল্লাহ তোমাদের প্রতি খুশি থাকবেন। আর তোমরা ও জমিনে যারা বসবাস করছে তারা সবাই যদি কাফের হয়ে যায়, তাহলেও তোমরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

হে আল্লাহ, তুমি সকল মুমিনকে মাফ করে দাও এবং কাফেরদের প্রতি তোমার আজাব নাজিল করো। আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত, যিনি সমগ্র জগতের প্রভু।

অনুষঙ্গ

এখানে এ ঘটনাটিও উপস্থাপন করা উচিত যে, রাসূল (দ.) কর্তৃক এ মহান ভাষণ প্রদান, বিশেষ করে আলী ইবনে আবি তালিবের মাওলাইয়্যাতের (নেতৃত্ব ও কতৃত্ব) ঘোষণা প্রদান এবং উপস্থিত সকলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেয়ার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর জাবির বিন নসর বিন হারিস বিন কিলদাতা আবদারী ওরফে নোমান ফেহরী নামক এক ব্যক্তি রাসূল (দ.)-এর দরবারে এসে বলল, "হে মুহাম্মদ! আপন আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ করলেন আমরা যেন সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই, আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল। আমরা আপনার কথানুযায়ী তেমনটিই স্বীকার করে নিলাম। তারপর আপনি আমাদের নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদির আদেশ দিলেন, আর আমরাও ঐ সমস্ত ফরজ কাজকে কবুল করে নিলাম। কিন্তু আপনি তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না, বরং এখন স্বীয় চাচাত ভাইকে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, 'মান কুন্তু

মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহু"। এ কথাটি আপনি কি আল্লাহর তরফ থেকে বলছেন, নাকি নিজের পক্ষ থেকে?"

তার কথার জবাবে রাসূল (দ.) আল্লাহর কসম করে বললেন যে, "আমি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক উক্ত ঘোষণা দিয়েছি।" এতোটুকু শুনার পর জাবির বিন নসর ক্ষুব্ধ হলো এবং হিংসা ও বিদ্বেষবশত এ কথা বলতে বলতে রাসূল (দ.)-এর দরবার থেকে উঠে দাঁড়াল "হে আল্লাহ, মুহাম্মদ যে কথাটি বলছে, তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আমার প্রতি আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ করো এবং কষ্টদায়ক আজাব নাজিল করো।" ফলে তেমনটিই ঘটল, যখন ঐ ব্যক্তি নিজের বাহনের নিকটবর্তী হলো, হঠাৎ আকাশ থেকে এক খণ্ড পাথর তার ওপর এসে পড়ল, আর তারই আঘাতে ঐ ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল। জিবরাঈল আমিন এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আয়াত নিয়ে রাসূল (দ.)-এর খেদমতে হাজির হলেন–

> **"এক ব্যক্তি চাইল, সেই আজাব সংঘটিত হোক, যা অবধারিত কাফেরদের জন্য, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই, তা (আজাব) আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিবেদনকারীর ওপর।"** [সূরা মায়ারিজ, আয়াত ১-৩]

বিপুল সংখ্যক আলেম ও মুহাদ্দেস উক্ত ঘটনাকে নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সা'লাবী, জারীর তাবারী, সিজিস্তানী, ইবনে আসাকির, ফখরুদ্দিন রাজি, আবু ইসহাক হামবীনি, জালালউদ্দিন সুয়ূতি, শাহাবুদ্দিন আলুসী, আবু বকর বিন মারদুইয়াহ।, মুহাম্মদ আব্দুহু মিসরী প্রমুখ আলেম।

পরিশেষে এ কথাটিও বলা আবশ্যক মনে করছি যে, আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব বিভিন্ন সময়ে গাদীরে খুমে রাসূল (দ.) কর্তৃক প্রদত্ত ঐ ভাষণের প্রতি সাহাবীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলেন। যে ভাষণের মধ্যে রাসূল (দ.) বলেছিলেন যে, "মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহু। আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালাহু ওয়া আ'দি মান আদাহু ওয়ানসুর মান নাসারাহু ওয়াখ্যুল মান খাযালাহু।" অর্থাৎ "আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ, যে আলীকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করে তুমিও তাকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করো, যে আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তুমিও তাকে শত্রু গণ্য করো। তুমি তাকে সাহায্য করো, যে একে সাহায্য করে আর তাকে ত্যাগ করো, যে একে ত্যাগ করে।"

উদাহরণ হিসেবে নিম্নের তিনটি ঘটনা পাঠকগণের সমীপে উপস্থাপন করা হলো:

১. তালহা বিন ওমায়ের (রা.) বলেন, যে, একদিন আমিরুল মুমিনীন আলী মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সাহাবীরা তাঁর চতুর্ম্পার্শ্বে অবস্থান করছিলেন, তম্মধ্যে আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরায়রা এবং আনাস বিন মালিকও উপস্থিত ছিলেন। তখন আমিরুল মুমিনীন আলী তাঁদের উদ্দেশে বলেছিলেন যে, "আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যে, তোমরা কি রাসূল (দ.)-কে এ কথা বলতে শুননি যে, "মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়্যু মাওলাহু।" তখন উপস্থিত সবাই হ্যাঁ সূচক সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, কিন্তু আনাস বিন মালিক সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকেন। তখন আমিরুল মুমিনীন আলী আনাস বিন মালিককে জিজ্ঞাসা কররেন, "সাক্ষ্য প্রদানে তোমাকে কোন জিনিসে বাধা প্রদান করল?" তখন তিনি (আনাস) বললেন, "আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আর আমি রাসূলের ঐ কথাটি ভুলে গেছি।" তাঁর কথা শুনে আমিরুল মুমিনীন আলী দোয়া করলেন যে, "হে প্রভু, এ যদি মিথ্যা বলে থাকে তবে তাকে শ্বেত রোগে আক্রান্ত করে দাও, যেন তা পাগড়ি দ্বারাও না ঢাকতে পারে।" তালাহা বিন ওমায়ের (রা.) বলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, "আমি আনাস বিন মালিকের কপালে ঐ শ্বেত রোগ স্বচক্ষে দেখেছি।"[৩]

২. তদ্রূপ বিশিষ্ট সাহাবি যায়েদ বিন আরকাম (রা.) থেকে রেওয়ায়েত আছে যে, আমিরুল মুমিনীন আলী ঐ লোকগুলোকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যারা রাসূল (দ.)-কে এ কথা বলতে শুনেছিলেন যে, "মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহু, আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালাহু ওয়া আদি মান আ'দাহু।" তারপর ১২ জন সাহাবি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন। যায়েদ বিন আরকাম (রা.) বলেন যে, "আমিও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা উক্ত হাদিস শুনেছিল। কিন্তু আমি ঐ মুহূর্তে চুপ থাকলাম। যার কারণে আল্লাহ আমাকে দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত করে দিলেন।" রাবি বর্ণনা করেছেন যে, তারপর থেকেই যায়েদ বিন আরকাম লজ্জিত ও সংকুচিত থাকতেন, আর ইসতেগফার করতেন।[৪]

---

[৩] আবু নাঈম ও ইবনে মারদুইয়্যাহ্।

[৪] ইবনে মারদুইয়্যাহ, মাগাজেলী, তাবরানী প্রমুখ

৩. দারেকুতনি ও ইবনে কাসীর স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে আব্দুর রহমান বিন লায়লা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, একবার আমিরুল মুমিনীন আলী ভাষণ দিলেন এবং বললেন যে, "আমি সভায় উপস্থিত ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছি যারা কলেমা পাঠ করেছে, রাসূল (দ.) গাদীরের দিনে আমার হাত ধরে এ কথা কি বলেননি যে, "মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়্যুন মাওলাহু, আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালাহু ওয়া আ'দি মান আ'দাহু ওয়ানসুর মান নাসারাহু ওয়াখ্যুল মান খাযালাহু?" তারপর দশেরও অধিক লোক দাঁড়িয়ে এর সত্যতা স্বীকার করেন। তবে কিছুসংখ্যক লোক সেটা গোপন করে নিশ্চুপ থাকল। ফলে যতদিন পর্যন্ত না তারা অন্ধত্ব ও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছে ততদিন পর্যন্ত তারা দুনিয়াতে বেঁচে ছিল।[৫]

উপসংহার

পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা হাশর এর ৭ নং আয়াতে আল্লাহর এ আদেশ আছে যে, "রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন শুধু তাই গ্রহণ করো। আর যেটা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।"

বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহর আদেশের পরিবেষ্টন শুধু কুরআনের আয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাসূলে খোদা (দ.)-এর কথা বার্তারও অনুরূপ মর্যাদা রয়েছে। সেজন্য কুরআনের সূরা নজম এর ৩-৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূল (দ.)-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, "তিনি নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছুই বলেন না। যতক্ষণ না তিনি অহী না করেন। ঐগুলো (যা কিছু বলেন) তা ই হয়ে থাকে যা তাঁকে (আল্লাহর তরফ থেকে) অহী করা হয়।"

আরো ব্যাপক ও বিশদভাবে জানার জন্য পবিত্র কুরআনেই সূরা নিসা'র ৮০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে যে,

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল... ।"

এ আয়াতগুলো তো ছিল বিধিবিধানসংক্রান্ত। রাসূল (দ.)-এর কর্মপদ্ধতি অনুসারে আমল করাসংক্রান্ত বিধান হচ্ছে,

[৫] দারেকুতনি ও ইবনে কাসীর।

"(হে রাসূল!) ঐ লোকগুলোকে বলে দিন যে, তোরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে আমার আনুগত্য করো, তাহলেই আল্লাহকে ভালোবাসা হবে... ।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩১]

এ আয়াতসমূহ এবং এর ন্যায় আরো অনেক স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় যে, রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর মহান আদর্শসমূহকে পালন করা আর রাসূল (দ.)-এর আমর ও পদ্ধতির আনুগত্য করাতেই আল্লাহর বিধান পালন করা হবে এবং আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করার সৌভাগ্য হবে। কিন্তু কতই না আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশই হযরত আলী ও তাঁর সন্তান অর্থাৎ আহলে বাইতের মহান ইমামগণ সম্পর্কে রাসূল (দ.)-এর ঐ সকল বক্তব্যকে যার মাধ্যমে তিনি (দ.) এসকল পবিত্র সত্তাকে উম্মতের দিশারী হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়ে গেছেন, শুধু দুনিয়াবি (জাগতিক) নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং ক্ষণস্থায়ী রাজত্বের লোভে তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। আল্লাহর খেলাফত, যে খেলাফতকে ইসলাম কায়েম করেছিল এবং যার কার্যকারিতা খোদ রাসূল (দ.) শুরু করেছিলেন, সেই খেলাফতকে এভাবে কদাকৃতিতে রূপান্তরিত করে দিল যে, রাসূল (দ.)-এর ওফাতের পর পরই ঐ খেলাফত মানুষের দুনিয়াবি অভিলাস ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলে।

মূলত আহলে বাইতগণকে রাসূল (দ.)-এর পরবর্তী কালে হেদায়েতের ঝরণাধারা নিযুক্ত করার আদেশ কেবল রাসূলে খোদা (দ.)-এর আদেশের ওপরই নির্ভরশীল নয়; বরং স্বয়ং কুরআন মাজীদই বিভিন্ন স্থানে তাঁদের ফাজায়েল বর্ণনা করেছে। আর তাঁদের প্রতি অনুগত হওয়া অথবা তাঁদেরকে আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছে এবং তাঁরাই যে হেদায়েতের ঝরণাধারা সেই ঘোষণা দিয়েছে। ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা মোতাবেকই পবিত্র কুরআন মজিদে আনুমানিক তিন শতাধিক আয়াত মহান আহলে বাইতের শানে বিশেষ করে হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের শানে নাজিল হয়েছে। এখানে আমরা মাত্র কয়েকটি আয়াত পাঠকগণের সমীপে উপস্থাপন করছি:

ক. সর্বপ্রথমে সূরা আহজাব এর ৩৩ নং আয়াত, আয়াত-এ-তাতহীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। কারণ, এ আয়াতের মধ্যে সরাসরি 'আহলে বাইত' শব্দ দ্বারা সম্ভোধন করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন–

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আহলুল বাইতকে সর্বপ্রকার পাপ পঙ্কিলতা থেকে উত্তমরূপে পবিত্র রাখতে ইচ্ছা করেছেন... ।"

আল্লাহর তরফ থেকে এখানে স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, আহলুল বাইত সর্বপ্রকার পাপ-পঙ্কিলতা, ভুল-ভ্রান্তি এবং দোষ-ত্রুটি থেকে উত্তমরূপে মুক্ত এবং পূতপবিত্র। এমন নয় যে, তাঁরা নিজস্ব কোনো ইচ্ছাশক্তিই রাখতেন না। বরং তাঁরা ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি এতই মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং সেগুলো এমন উত্তমরূপে আমল করেন যে, তাঁদের যাবতীয় আমলই আল্লাহর হুকুম ও ইচ্ছানুসারে এমন হতো যে, তাঁদের আমলসমূহকেই আল্লাহর ইচ্ছা বলে জ্ঞান করা হয়। তাঁরা কেমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁদেরকে 'আহলুল বাইত' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণের পর রাসূল (দ.) স্বয়ং এভাবে করেছেন যে, তিনি নিজেকে একটি চাদর দিয়ে ঢাকলেন আর তার মধ্যে ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলীকে প্রবেশ করিয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাত উঠিয়ে এই কথাগুলো বললেন, "আল্লাহুম্মা হাউলায়ে আহলুল বাইতি, দামুহুম দাম্মি ওয়া লাহ্মুহুম লাহ্মি।" হে আল্লাহ! এরাই হলো আমার আহলে বাইত, এদের রক্ত আমার রক্ত, এদের মাংস আমার মাংস।[৬]

খ.পবিত্র আহলে বাইতের আনুগত্য সম্পর্কে সূরা নিসা'র ৫৯ নং আয়াতে এভাবে নির্দেশ হয়েছে–

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো, আর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা নির্দেশ দানের অধিকারী তাদের ...।"

উক্ত আয়াতের মধ্যকার এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, আদেশ দানের অধিকারী কারা, যাদেরকে রাসূল (দ.)-এর পাশাপাশি আনুগত্য করার আদেশ করা হয়েছে। এটা তো প্রকাশ্য যে, এ আনুগত্যটি যেন-তেন বা কোনো সাধারণ আনুগত্য নয়; বরং ঐ আনুগত্য রাসূল (দ.)-এর মতোই সমান মূল্য বহন করছে। নির্দেশদাতা বলে তো দুনিয়ার শাসককে কোনোভাবেই বুঝানো যেতে পারে না। কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্য যে, দুনিয়াতে রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী কোনো একজন শাসকেরও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমন ছিল না যার আনুগত্য করা রাসূল (দ.)-এর আনুগত্যের সমতুল্য থেকে পারে। ফলে উক্ত আয়াতে এমন মহান চরিত্রবানদের প্রতিই দিকনির্দেশনা দেয়া থেকে

[৬] তাফসীরে মারেফুল কুরআন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড-৭, পৃ ১৩২; তাফসীরে মাদানী, মুফতি মোঃ শফি, আহলে হাদিস লাইব্রেরী, খণ্ড-৮, পৃ. ১৩-১৫; তাফসীরে মাজহারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড-১০, পৃ. ৩৩ ও ৩৪; মিশকাত শরীফ, এমদাদীয়া, খণ্ড ১১, হাদিস নং ৫৮৭৬।

পারে যাঁরা নিশ্চিতরূপে রাসূল (দ.)-এর রক্তে ও মাংসের সঙ্গে মিশে রয়েছেন এবং তাঁর মতোই যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা এবং ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আর তারা কেবল আহলে বাইতের পবিত্র সদস্যগণ ব্যতীত আর কে থেকে পারে, যাদেরকে আয়াতে তাতহীরের মাধ্যমে পূতপবিত্রতার সনদ দেয়া হয়েছে।

গ. যাদেরকে রাসূল (দ.)-এর রক্ত-মাংস বলা হয়েছে, সেই আহলে বাইতগণেরই সম্পর্কেই সূরা শুরা'র ২৩ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

> **"ঐ সকল আল্লাহর বান্দাদের জন্য সু-সংবাদ, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। (হে রাসূল!) বলে দিন যে, আমি তোমাদের কাছে এর (রিসালাতের) কোনো প্রতিদান চাই না কেবল আমার নিকট আত্মীয়দের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা ব্যতীত...।"**

এ নিকট আত্মীয় কারা? তাঁরা হলেন সেই পবিত্র সত্তাসমূহ যাঁদেরকে আয়াতে তাতহীরে 'আহলুল বাইত' বলা হয়েছে। ইসলামি জাহানের স্বনামধন্য মুফাসসিরীনে কেরাম, যথা- সা'লাবী, জামাখশারী, সুয়ূতী, বায়যাবী এবং আরো প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস যেমন- মুসলিম, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও আহলে সুন্নাতের অন্যান্য আলেম এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, 'কুরবা' শব্দের মাধ্যমে রাসূলে করীম (দ.)-এর নিকট আত্মীয় স্বজনকে বুঝানো হয়েছে। মুসলমানদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকে বুঝানো হয়নি। তবে এটা তো স্পষ্ট যে, সবাই প্রকৃতিগতভাবে নিজের নিকটতম আত্মীয় যাদের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক থাকে তাদেরকে ভালোবেসে-ই থাকে। এ প্রকারের ভালোবাসাকে রিসালাতের প্রতিদান বলা যেতে পারে না। তবে রাসূল (দ.)-এর নিকট আত্মীয় তো তাঁরাই, যাঁরা তাঁর রক্ত ও মাংসের সঙ্গে মিশে আছেন এবং যাঁরা চরিত্রগত দিক থেকেও একই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁরাই শুধু রাসূল (দ.)-এর রিসালাতের প্রতিদান বাবদ ভালোবাসা পাওয়ার অধিকারী থেকে পারেন। এখানে এটাও বিবেচ্য বিষয় যে, ভালোবাসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কাউকে আপন চরিত্র গঠন ও আমল করার জন্য নমুনা ও আদর্শ বলে মেনে নেয়া। আর আমলের জন্য ও চরিত্র গঠনের জন্য তো শুধু ঐ সমস্ত ব্যক্তিই নমুনা ও আদর্শ থেকে পারেন। যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রকার রিজস তথা কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত রেখে পূতপবিত্র করেছেন তথা পবিত্র আহলে বাইতগণ।

গাদীরে খুমের ঘোষণা
–একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ভূমিকাঃ

হযরত মুহাম্মদ (দ.) ১০ই জিলহজ বিদায় হজ সম্পন্ন করার পর গাদীরে খুম নামক স্থানে ১০ম হিজরীর ১৮ জিলহজ তারিখে এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি ঐতিহাসিকভাবে ধারাবাহিক সনদসমূহের ভিত্তি মূলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্য এই ভাষণের বিষয়বস্তু সর্বজন বিদিত নয় এবং বাস্তব জীবনে মুসলিম উম্মাহ এই ভাষণের মূল শিক্ষা কার্যত অস্বীকার করে জাতিগতভাবে এক মহাবিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। ইসলাম ধর্মীয় রাজনৈতিক মতাদর্শকে বাদ দিয়ে একটি বিকৃত রাজনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি করেছে যা পবিত্র কুরআনের আলোকে ভুল, মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর। অর্থাৎ নবুওয়ত ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যা রাসূল (দ.) জীবনে একীভূত ছিল। তা আলাদা করে ধর্ম ও রাজনীতি দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। রাসূল (দ.)-এর গাদীরে খুম নামক স্থানে প্রদত্ত ভাষণের মূল ভিত্তি হলো আয়াতে তাবলীগ যা সূরা মায়েদার ৬৭ নম্বর আয়াত

> **"হে রাসূল! পৌঁছে দিন, যা আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে, যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তার রেসালাতের কোনো কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"**

আয়াতটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ত এই হুকুম যা প্রচার করার জন্য রাসূল (দ.)-কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তা ভিন্ন মাত্রার এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর এমনই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ যা উম্মাহকে জানানো না হলে নবুওত ও রেসালাতের সমস্ত শিক্ষা কার্যত অকার্যকর বা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার এই হুকুমটি এমনই স্পর্শকাতর যে, তা প্রচার ও বাস্তবায়ন করতে গেলে মানুষের পক্ষ থেকে রাসূল (দ.)-এর অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে। আর সঠিকভাবে এই হুকুম বা নির্দেশনা না মানা বা প্রতিপালন না করা হলে সেই সম্প্রদায় কার্যত কাফের বা খোদা

অস্বীকারকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই মানবীয় বিবেক এ কথা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য যে, এই নির্দেশনাটা কি? যে কারণে আল্লাহ তা'লা, এই বিষয়টিকে এতো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর জানাও সেই জন্য অত্যবশ্যক বা ফরজ।

ঐতিহাসিক ও তাফসিরকারকগণ এই আয়াতের তাফসীরে সামান্য শব্দগত তারতম্যসহ কেবল একটি ঘটনাকেই উল্লেখ করেছেন।

হাফিজ আবু নাঈম ইস্পাহানী স্বীয় "হিলইয়াতুল আউলিয়া" গ্রন্থে এবং সালাবী তার তাফসীর গ্রন্থে রাসূল (দ.)-এর সাহাবি বার'আ বিন আযিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি তখন নাজিল হয়েছিল যখন রসূলে মকবুল (দ.) বিদায় হজ শেষ করে মদিনার দিকে ফেরার সময় খুম নামক স্থানে পৌঁছে ছিলেন, যা মক্কা মোয়াজ্জমা এবং মদিনাতুল মোনাওয়ারার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত একটি জলাশয়। এটি গাদীরে খুম নামে পরিচিত ছিল। কাজেই উক্ত আয়াত নাজিল হলে রাসূল (দ.) খুমের পাড়ে অবস্থান করলেন এবং মিম্বরে উঠে একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন যার মধ্যে তিনি ঘোষণা করলেন, "মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়ুন মাওলাহু" অর্থাৎ "আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা।" অনুরূপভাবে হাফেজ আবু বক্কর বিন মারদুইয়্যাহ তাঁর মানাকিব কিতাবে বিখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ভাষ্য অনুযায়ী 'আমরা রেসালাতের যুগে এ আয়াত **বাল্লিগ মা উনযিলা ইলাইকা**-কে **"ইল্লা আলীয়্যান মাওলাল মোমিনা"** বাক্যসহ তেলাওয়াত করতাম।[৭]

অতঃপর রাসূল (দ.), হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের বাহু স্বীয় পবিত্র হাত ধরে তাঁবু থেকে বের হলেন এবং মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার পর উপস্থিত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আলাসতু আউলা বিকুম মিন আনফুসিকুম" অর্থাৎ আমি কি তোমাদের উপর নিজেদের চেয়ে অধিক অধিকার রাখি না? তাঁরা সকলেই বললেন, "বালা ইয়া রাসূলাল্লাহি" হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রতি আমাদের চেয়ে অধিক অধিকার রাখেন" এই অঙ্গীকার নেয়ার পর রাসূল (দ.) নিজের পবিত্র বরকতময় মুখে বললেন, মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়ান মাওলাহু।

---

[৭] তাফসীরে মাযহেরী, আল্লামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানীপথি (রা.), ইসলমিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় খণ্ড (৫ম ও ৬ষ্ঠ পারা) সূরা মায়েদার-৬৭ নং আয়াতের তাফসীর।

অর্থাৎ যে "আমাকে তাঁর নফসের অধিকারী বলে মেনে নেবে, তাঁর জন্য আবশ্যক কর্তব্য হবে, সে যেন আলীকেও তাঁর নফসের অধিকারী বলে মেনে নেয়"। অতঃপর রাসূল (দ.) আল্লাহর দরবারে এই মোনাজাত করলেন, "আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালাদু ওয়া আদি মান আদাহু ওয়ান সুর মান নাসারাহু ওয়াখজুল মান খাজালাহু" অর্থাৎ আমি যার মাওলা, আলীও তাঁর মাওলা। হে আল্লাহ, তুমি তাকে বন্ধু গণ্য করো, যে একে (আলীকে) বন্ধু গণ্য করে এবং তাকে শত্রু গণ্য করো, যে একে (আলীকে) শত্রু গণ্য করে এবং তাকে সাহায্য করো, যে একে (আলীকে) বন্ধু করে এবং রাগান্বিত হও তার প্রতি, যে একে (আলীকে) রাগান্বিত করে।

উল্লিখিত হাদীসটি এমনই প্রসিদ্ধ ও এমন ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে যে, সম্ভবত অন্য কোনো হাদিস এতো অধিক পরিমাণে বর্ণিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি। যে সকল প্রসিদ্ধ সাহাবি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন: হযরত আবু বক্কর সিদ্দিকী, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, হুযায়ফা বিন আল ইয়ামান, রাবি'আ বিন আযিব আনসারী, আবু যর গিফারী, যায়েদ বিন আকরাম, হযরত সালমান ফারসী, জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী, হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিব, প্রমুখ। যে সকল বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত গ্রন্থে ঐতিহাসিক মুহাদ্দিসগণ কালামবিদগণ ও সীরাত লেখকগণ উল্লিখিত হাদিসের আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

হিলইয়াতুল আউলিয়া: আবু নাঈম, খাসায়েসে নাসায়ী, দুররে মানসুর: জালালউদ্দিন সুয়ুতী, জাখায়েরুল উকবা: আল্লামা জরীর ইবনে তাবারী, রুহুল মায়ানী, আল্লামা শাহাবুদ্দিন শাফেয়ী আলুসী, সাওয়ায়েকে মুহরিকা: ইবনে হাজার মক্কী, মুসনদে আহম্মদ: ইবনে হাম্বল, মানাক্বিবে খাওয়ারেজেমী: মায়ারিফে ইবনে কুতায়বা দিনওয়ারী ইত্যাদি।

যে সব ঐতিহাসিক উক্ত হাদীসকে তাদের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:- আনসাবুল আশরাফ: বালাজুরী, তারিখে তাবারী: তারাবী, আল মিলাল ওয়ান নিহাল: শাহরিস্তানী, শরহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদীদ, মুকাদ্দামায়ে তারিখ: ইবনে খালদুন, উসদুল গাবাহ: ইবনে আসীর ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনের রাজনৈতিক মতবাদের সন্ধানেঃ

বিশ্ব জাহানের প্রভু, সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, মালিক, শাসন কর্তা, তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা পৃথিবী হিসেবে যেখানে বাস করি সেখানে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাকে জানার, চিন্তা করার, বুঝবার শক্তি দিয়েছেন, ভালো ও মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাচাই-বাছাই করার ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। অর্থাৎ এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন দান করে তাকে পৃথিবীতে নিজের খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরাআনে এরশাদ হচ্ছে:

> **"স্মরণ করো! যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (আমার পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্যক্তির মাধ্যমে শাসন কার্যক্রম পরিচালিত) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তখন তারা বলল, আপনি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও খুন-খারাবি করবে? আল্লাহ জবাবে বললেন, "আমি যা জানি, তা তোমরা জান না।" আর তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন (অর্থাৎ সকল বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন)। এরপর এক এক করে সবকিছু ফেরেশতাদের সামনে হাজির করে বললেন, তোমরা এগুলোর নাম, (বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ) আমাকে বলে দাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল আপনি মহাপবিত্র। আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না।** (সূরা বাকারা, আয়াত ৩০-৩২)

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম শিক্ষা হলো- মানবীয় চরিত্রের এমন একটি দিক রয়েছে যা স্বভাবতই অন্য মানুষের সঙ্গে ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদ এবং খুন-খারাবি করার প্রবণতা। এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ তথা পরিহার করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত যে দিক নির্দেশনা বা জীবন বিধান রয়েছে তা মানব জাতির জন্য অবশ্য পালনীয়। আর এই দিক-নিদের্শনা হলো আল্লাহ প্রদত্ত 'হেদায়েত'-দ্বীন-ধর্ম আর এই দ্বীনই হলো ইসলাম তথা আল্লাহর আনুগত্য। যা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত থেকে হবে এবং তা আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত বা নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পরিচালনা বা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়টি পরবর্তীতে কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

> **"আমি বলেছিলাম, তোমরা সবাই এখান থেকে দুনিয়ায় যাও। তারপর তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি অবশ্যই সত্য পথের দিক-নির্দেশনা জীবন ব্যবস্থা (আমার নির্বাচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে) প্রেরণ করব। তখন যারা এই**

দিক-নির্দেশনা অর্থাৎ নৈতিক বিধি-বিধান (সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা) অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় বা দুঃখ থাকবে না। আর যারা সত্য পথের নৈতিক বিধানকে প্রত্যাখান করবে, তারাই জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।" (সূরা বাকারা, আয়াত-৩৭)

অর্থাৎ আল্লাহর এই বিধি-বিধান প্রেরণ তার ব্যাখ্যা, প্রতিপালন ও তা সর্বযুগে বাস্তবায়ন একটি ধারাবহিক প্রক্রিয়া। বিশ্ববাসী কখনো যেন কোনোক্রমেই আল্লাহর এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত না হয়। এই দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল যুগে মানবজাতির হেদায়েত লাভের মাত্র দুইটি উপায় রয়েছে। এক আল্লাহর কালাম, দুই নবী-রাসূলগণের ব্যক্তিত্ব। নবী-রাসূলগণকে আল্লাহাতালা শুধু তার বাণী পৌঁছে দেয়ার এবং তা শিক্ষা ও উপলব্ধি করার মাধ্যম হিসেবেই পাঠাননি। বরং সেই লক্ষ্যে তাঁদেরকে বাস্তব নেতৃত্ব দান ও পথ প্রদর্শনের নির্দেশ ও দিয়েছেন। যাতে করে তারা আল্লাহর বাণীর সঠিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে মানুষ ও সমাজ সংস্কার তথা সংশোধন করতে পারেন এবং বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার সংশোধন করে একটি সৎ ও সুষ্ঠু সমাজ পুনর্গঠিত করে দেখান।

এ দুটি বিষয় চিরকাল এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে, না মানুষ দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, আর না সে হেদায়েত লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিকে আল্লাহর ঐশী গ্রন্থ থেকে আলাদা করলে তা এক কাণ্ডারী বিহীন তরী হয়ে পড়বে। একজন অনভিজ্ঞ জীবন পথের যাত্রী তা নিয়ে জীবন সমুদ্রে যতই ঘুরাফিরা করুন না কেন সে কোনো দিনই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবে না। আবার আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিকে আল্লাহর কিতাব থেকে আলাদা করা হলে মানুষ সঠিক পথ পাওয়ার পরিবর্তে এক মহাবিভ্রান্তির শিকার হবে। এই বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল (দ.) বলেছেন, আমার আহলে বাইত ও কুরআন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হাউজে কাউসারে পৌঁছানো না পর্যন্ত তা আলাদা হবেনা। অর্থাৎ আল্লাহর এ হিদায়েত সর্ব যুগে বর্তমান থাকবে। বর্তমান মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়টি গুরুত্বহীন বিবেচনা করায় তারা আল্লাহর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নবী-রাসূলদের বৈশিষ্ট্যঃ

পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্পে পারদর্শী লোকেরা যেমন একটি বিশেষ মন-মস্তিষ্ক ও বিশেষ ধরনের প্রকৃতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন, অনুরূপভাবে নবী-রাসূল বা আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ একটি বিশেষ প্রকৃতি ও যোগ্যতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন।

আমরা একজন স্বভাব কবি, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পীর প্রতিভা দেখে ও শুনে বুঝতে পারি যে, তিনি বিশেষ যোগ্যতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাই আমরা স্বভাব বাগ্মী, জন্মগত লেখক, বৈজ্ঞানিক ও জন্মগত নেতাকে তাদের কার্যাবলীর মাধ্যমে সহজেই চিনতে পারি। নবী-রাসূল বা আল্লাহর নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তির অবস্থাও অনুরূপ। তারা এমন এমন বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন, যা তিনি ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ বা স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন সব সূক্ষ্ম কথার গভীরে প্রবেশ করে যেখানে বছরের পর বছর গবেষণা করার পরও অন্যদের দৃষ্টি পৌঁছায় না। তিনি যা কিছু বলেন, আমাদের বুদ্ধি তা গ্রহণ করে নেয় এবং আমাদের মন তার সাক্ষ্য প্রদান করে। দুনিয়ার অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সৃষ্টি জগতের প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের মাধ্যমে তার প্রত্যেকটি কথা সত্য প্রমাণিত হয়। উপরন্তু তার প্রকৃতি এতই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় যার ফলে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিনি বা তারা সত্যনিষ্ঠ ও ভদ্রোজনোচিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি কখনো ভুল কথা বলেন না। কোনো খারাপ কাজ করেন না। সব সময় সুকৃতি ও সত্য নিষ্ঠার শিক্ষা দিয়ে যান। অন্যকে যা বলেন, নিজে তার উপর অনুশীলন করেন। তিনি নিজে যা বলেন কাজের সময় তার বিরুদ্ধাচারণ করেন এমনটি তাঁদের জীবনে কোনোদিন দেখা যায়নি। তাঁর কথায় ও কাজে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকেনা। অন্যের ভালোর জন্য তিনি নিজের ক্ষতি করেন এবং নিজের ভালোর জন্য অন্যের ক্ষতি করেন না। তাদের সমগ্র জীবন গঠিত হয় সভ্যতা, ভদ্রতা, মানসিক পবিত্রতা, উন্নত চিন্তা ও উচ্চ পর্যায়ের মানবতার আদর্শে। সর্বোপরি তাঁর অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা বা শক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিশ্ব স্রষ্টার নির্বাচিত ব্যক্তি অর্থাৎ নবী-রাসূল বা অনুরূপ। এ সব নির্বাচিত ব্যক্তিদের জ্ঞান, যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা:

১. এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে স্থির বিশ্বাসীদের একজন হয়। (সূরা আনয়াম, আয়াত-৭৪)

২. হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনাঃ আর তিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কিতাব হিকমত ও তওরাত ও ইঞ্জিল। তাকে রাসূল করেছেন বনি ইসরাইলদের জন্য। আমি তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে একটি পাখি বানাব তারপর আমি ওতে ফুঁ দেব। তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভালো করব। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন্ত করব। আর তোমাদের বলে দিব তোমরা কী খেয়েছ আর কী মজুদ রেখেছ। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৪৯)

৩. হযরত মুহাম্মদ (দ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআন, "শপথ অস্তমিত নক্ষত্রের, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, পথভ্রষ্ট নয়, আর সে নিজের ইচ্ছা মতো কথা বলে না। এ অহী (প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ) যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাঁকে শিক্ষা দেয় মহা শক্তিধর। (সূরা নজম, আয়াত-২-৪)

৪. আল্লাহর ওলী সম্পর্কে কুরআন, জানিয়া রাখ আল্লাহর বন্ধুদের (ওলী) কোনো ভয় নাই, তাঁরা দুঃখিত হইবে না। (সূরা ইউনুস, আয়াত-৬২)

৫. যাহারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নাই। ইহাই মহাসাফল্য।

নবী-রাসূল নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়োগঃ

আল্লাহ তায়ালা এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্মপন্ন ব্যক্তিদের বিশ্ব পরিচালনার জন্য তার প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। পবিত্র কুরআনে এই ধরনের নিয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

১. স্মরণ করো, যখন তার পালনকর্তা (রব) কয়েকটি বাক্য (বিষয়ে) দিয়ে ইবরাহীমকে পরীক্ষা করলেন, এবং সে সেইগুলি পূর্ণ করলেন, আল্লাহ বললেন আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম (নেতা যাকে অনুসরণ করা হয়, অনুকরণীয়) নির্বাচন/নিয়োগ করলাম। সে (ইবরাহীম) বলল, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও! আল্লাহ বলেন হ্যাঁ কিন্তু আমার অঙ্গীকার (এই নির্বাচন নিয়োগ প্রক্রিয়া) জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। (সূরা বাকারা, আয়াত-১২৪)

২. হে দাউদ আমি আপনাকে পৃথিবীতে আমার খলীফা নিয়োগ করলাম। (সূরা সাদ, আয়াত-২৬)

৩. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব

(নেতৃত্ব/মালিকানা, উত্তরাধিকারিত্ব) দান করবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের। (সূরা নূর, আয়াত-৫৫)

৪. এবং আমরা যাবুর কিতাবের উপদেশ নসীহতের পর লিখে দিয়েছি যে, এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী (মালিক, ওয়ারিস/নেতা) হবে আমার নেক ও সৎ কর্মশীল বান্দাগণ। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১০৫)

৫. হে ঈমানদারগণ আল্লাহর আনুগত্য কর, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের এবং তাদের যাদেরকে রাসূলের ন্যায় প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। (সূরা নিসা, আয়াত-৫৯)।

৬. আল্লাহ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনও তাহার কোনো পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক (ওলীয়া মুর্শিদ) পাইবেনা। (সূরা কাহাফ, আয়াত-১৭)

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, নবী-রাসূল, ইমাম, খলীফা, ওয়ালী, মুর্শীদ, উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) ক্ষমতা প্রদত্ত (উলিল আমর) ইত্যাদি যে সব পদবি ব্যবহার করা হয়েছে, এ সব পদবীর নিয়োগকর্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীর মহান প্রশাসক হিসেবে তাঁর নিয়োগকৃত এইসব প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে বিশ্ব পরিচালনা করে থাকেন। এটি আল্লাহর একটি স্থায়ী বিধান।

নবী রাসূল ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের দায়িত্বঃ

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলওয়াত করে তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৬৪)

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মানব জাতি আল্লাহর এই সব প্রতিনিধিদের সর্বোত্তম মানবীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্ব সহজভাবে মেনে নেয়নি। বরং এই সব ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করে বা তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে নিজেরাই নিজেদের নেতা নিয়োগ করে মানব জাতির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। এ ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনা–

"যখনই কোনো রাসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু আনে (বাণী নিয়ে) যা তাদের মনঃপূত হয়নি, তখনই তারা কতককে মিথ্যাবাদী ও কতককে তারা হত্যা করে।" (সূরা মায়েদা, আয়াত-৭০)

আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত প্রশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিকে আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় Theocracy বা ঈশ্বরতন্ত্র, ঐশীতন্ত্র বা দিব্যতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল সভ্যতায়ই এই ধরনের শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত মূল ব্যক্তিকে হত্যা বা তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার পর অবৈধ ক্ষমতা দখলদারগণ আল্লাহর নামে বিভিন্ন মিথ্যা আরোপ করে দুনিয়ার সকল পার্থিব সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। এবং মানব জাতির জন্য মূর্তিমান বিভীষিকা হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছে মর্মে দেখা যায়, যেমন ইউরোপে পোপতন্ত্র ও হোলি রোমান এম্পায়ের (Holy Roman Empire) Inquisition-এর মাধ্যমে ইউরোপীয় জনগণের উপর ধর্মের নামে যে অমানুষিক নির্যাতন করেছে তা সর্বজন বিদিত। অনুরূপভাবে উমাইয়া শাসকগণ রাসূল (দ.)-এর সাহাবী ও মহান আহলে বাইতদের উপর হত্যা, নির্যাতন এর যে স্টিমরোলার চালিয়েছে তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। আবার আব্বাসীয় শাসকগণ শরীয়ত রক্ষার নামে আল্লাহর ওলীদের উপর যে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করেছে তাও আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। এই বিষয়টি পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

"অতঃপর অযোগ্য উত্তর পুরুষগণ একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়। তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে 'আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে'। কিন্তু উহার অনুরূপ সামগ্রী তাহাদের নিকট আসিলে উহাও তাহারা গ্রহণ করে, কিতাবের অঙ্গীকার কি তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়নও করে যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি ইহা অনুধাবন করনা?" (সূরা আরাফ, আয়াত-১৬৯)।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা গাদীরে খুমের মূল শিক্ষা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

১. আল্লাহ তায়ালা এক এবং একক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও রসুল (দ.) তাঁর বৈধ প্রতিনিধি তাই সকল প্রকার আনুগত্য, মান্যতা ভয়, ভীতি পুরস্কার ও তিরস্কারের মালিক একমাত্র তিনি।

২. আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, যেহেতু আল্লাহ স্বয়ং মানব জাতির জন্য নেতা মনোনীত করেন তাই মানুষ নিজে থেকে তাদের নেতা নির্বাচন করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (দ.)-এর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হলেন আলী ইবনে আবি তালেব, হযরত হাসান (রা.) হযরত হোসেন (রা.) ও তাঁদের পবিত্র বংশধরগণ।

৩. পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করার জন্য আহলে বাইতগণ হলেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

৪. আল্লাহর মনোনীত পছন্দনীয় ও নির্বাচিত দ্বীন (মতবাদ, চিন্তাধারা, দর্শন, জীবন ব্যবস্থা) হলো আল ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর নিকট প্রকৃত আত্মসমর্পণ। অন্য কোনো জীবন দর্শন মতবাদ তথা নাস্তিকতাবাদ, ডারউইনবাদ, সমাজতন্ত্র, তথা কথিত মানবতাবাদ, পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, উদারতাবাদসহ সকল মানব সৃষ্ট দর্শন বা মতবাদ অথবা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের মাধ্যমে বেহেশত, দোজখের অস্বীকৃতি ইত্যাদি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

৫. মানবজাতি পার্থিব ও অপার্থিব যে কোনো ধরনের সমস্যায় পতিত হোক না কেন সে যেন সব সময় বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত মহান ব্যক্তিবর্গকে যথা ইমাম, ওলী, মুর্শিদ অনুসন্ধান করে।

৬. বিশ্ব পরিচালনায় ইমাম, ওয়ালী, মুর্শিদ, উলিল আমরদের তথা আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির উপস্থিতি একটি প্রশাসনিক অপরিহার্যতা। এই বিষয়টি কার্যত অবিশ্বাস বা অস্বীকার করার কারণে বর্তমান বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এক মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ.) যা হালাল ও হারাম ঘোষণা করেছেন কোনো বৈজ্ঞানিক, কোনো চিকিৎসক, কোনো দার্শনিক, কোনো অর্থনীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী তা রদ করতে পারবেনা।

৮. আল্লাহ, রাসূল (দ.) ও আহলে বাইতের দুশমন বা ঘৃণা পোষণকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা নিষিদ্ধ।

৯. সর্ব অবস্থায় পরহেজগারী তথা আল্লাহ সচেতন থেকে হবে।

১০. কিয়ামতের ভয় করতে হবে যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, ঐ সময়কার ভূমিকম্প খুবই কঠিন বিষয়।

১১. সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর কাছে হিসাবের কথা স্মরণ করতে হবে।

১২. আল্লাহর দরবারে পরীক্ষা আর জিজ্ঞাসাবাদকে স্মরণে রাখতে হবে।

১৩. সদাসর্বদা সওয়াব ও আযাবের স্মরণ রাখতে হবে।
১৪. স্মরণ রাখতে হবে যে ইমামবিহীন অবস্থায় সমাজে আমর বিল মারুফ (সৎ কাজে আদেশ) নাহি আনিল মুনকার (অসৎ কাজে নিষেধ) বাস্তাবায়ন সম্ভব নয়। তাই ইমামতের তথা সঠিক নেতৃত্বের বিষয়টি সমাজের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
১৫. ইমাম মাহদী (আ.) রাসূল (দ.) ও হযরত ইমাম আলীর রক্তধারা থেকে। তিনি সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয় লাভ করবেন। তিনি জালিমদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আল্লাহর বন্ধুদের সর্ব প্রকার অবৈধ রক্তপাতের প্রতিশোধ তিনিই গ্রহণ করবেন। তিনি সমস্ত ফজিলত প্রাপ্তদের ফজিলত এবং সমস্ত মূর্খের মূর্খতার পরিচয় তুলে ধরবেন। তিনি সমস্ত জ্ঞানের উত্তরাধিকারী আর উক্ত জ্ঞানের প্রতি তার পূর্ণাঙ্গ দখল থাকবে। তিনি হবেন স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে সংবাদ দাতা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমানসংক্রান্ত যাবতীয় কথা প্রচারকারী। তিনি হবেন সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞানী, আর ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব। সকল ব্যাপার তার নিকট হস্তান্তরিত হবে। পূর্বের নবী-রাসূলগণ তাঁর (ইমাম মাহদীর) শুভ সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহর দলিলরূপে তিনিই বেঁচে থাকবেন। সত্য কেবল তাঁর সঙ্গেই থাকবে। আর নূর কেবল তার কাছেই থাকবে। কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবেনা। এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেউ জয়ী থেকে পারবেনা। তিনি হবেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ওয়ালী (মনোনীত প্রতিনিধি) আর আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে তার নিযুক্ত হাকিম (শাসক) এবং জাহের ও বাতেনের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে আমানত রক্ষাকারী ও সত্যবাদী।

উপসংহারঃ

বর্তমান মুসলমানদের ইতিহাস থেকে গাদীরে খুমের ইতিহাস ও শিক্ষাকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করা হচ্ছে বিধায় মুসলিম উম্মাহ এক মহা ক্ষতির মধ্যে বিরাজ করছে। তাই গাদীরে খুমের প্রকৃত শিক্ষা জানা ও মানার মধ্যে মুসলিম উম্মাহর সকল প্রকার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের এই শিক্ষার তাৎপর্য ও গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন ও তা পালনের তৌফিক দিন। কারণ এই শিক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা দ্বীন-ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা রয়েছে মর্মে স্বয়ং ঘোষণা করেছেন।

হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে কিছু প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে হযরত মা ফাতেমা যাহরার বক্তব্যঃ

মহান আল্লাহ তায়ালা (আমাদের আহলে বাইতদের) যে বিশেষ নেয়ামত দিয়েছেন তার জন্য সকল প্রশংসা একমাত্র তারই প্রাপ্য। এ জন্য তার প্রতি আমাদের অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা। তিনি আমাদের যে অবিরাম দয়া ও অনুগ্রহ (সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে পার্থক্য নির্ণয়ের জ্ঞান) প্রদান করেছেন এবং যে অফুরন্ত করুণা আমাদের দান করেছেন তার জন্য আমরা প্রকাশ করি তার প্রতি আমাদের আনুগত্য তিনি প্রদান করেছেন সকলকে অপরিসীম ও অপরিমিতভাবে, অনাবিল ও অবারিতধারায় (এগুলো এমন) যা গননার অতীত হিসাবের বাইরে যা অননুমেয়, তুলনার উর্ধ্বে, সীমাহীন, চিরন্তন, অনন্তস্থায়ী ও চির অম্লান। এসব নেয়ামতের ধরণ, প্রকৃতি, পরিমাণ ও সীমানা অনুধাবন করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব এই সকল নেয়ামতের প্রাচুর্য ও অবিরাম ধারা বিরাজমান রাখার লক্ষ্যে তিনি তাঁর সকল প্রশংসা করা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাদের স্বীয় অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে উভয় জগতে সফল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ আর কেউ নেই। এই সাক্ষ্য আত্ম সমর্পনের নিদর্শন বহন করে। এভাবে এ সাক্ষ্য প্রত্যেকের সমর্থ অনুযায়ী তাদের অন্তরকে পরিপূর্ণ ও চেতনাকে প্রস্ফুটিত করে। আমাদের চোখে তিনি দৃশ্যমান নন। তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করার ভাষা আমাদের সাধ্যের অতীত। তাঁর অস্তিত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে কিছু অনুমান করতে আমরা অক্ষম, যখন কিছুই বিদ্যমান ছিলনা তখন তিনি এই বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই বিশ্ব জগতকে অস্তিত্ব দিয়েছেন হয়ত সৃষ্টিরই কারণে অথবা শুধু অতীত ও ভবিষ্যতের বিদ্যমানতার উদাহারণ হিসাবে। তিনি তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে এই অস্তিত্ব প্রদান করেছেন এবং আপন শক্তি ও ক্ষমতাবলে তিনি এগুলোকে আকৃতি প্রদান করে দৃশ্যমান করেছেন। কিন্তু এই সৃষ্টি সম্ভার না তার কোনো প্রয়োজন ছিল, আর না এগুলোর আকৃতি ও রূপ প্রদান তার

কোনো উপকারের জন্য ছিল। তিনি (এই বিশ্বজগতের রূপ পরিগ্রহের মাধ্যমে) তাঁর সীমাহীন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং চেয়েছেন তাঁর এই সৃষ্টি তার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করুক ও তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হোক ও আমরা বাধ্য থাকি এবং তাঁর ঐশ্বরিক লক্ষ্য অম্লান হোক।

অতঃপর তিনি তাঁর প্রতি আনুগত্যের জন্য পুরস্কার এবং আদেশ অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির বিধান নির্দিষ্ট করেছেন যাতে এই বিশাল সৃষ্টিজগত তার ক্রোধ থেকে পরিত্রান পায় এবং তার সৃষ্টি জান্নাতে স্থান পায়।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (দ.) তার বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে এই পৃথিবীতে প্রেরনের পূর্বেই মনোনীত করে রেখেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টির পূর্বেই তাঁর মুযিযা ও নাম নির্ধারন করে রেখেছিলেন। তিনি তাকে নবুয়ত প্রদানের পূর্বেই এই পদে অধিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন। এসব কিছুই ঘটেছে যখন এই সমস্ত সৃষ্টি জগত ছিল গুপ্ত ও অনস্তিত্বের অন্ধকারে লুকায়িত।

আল্লাহ ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত। কেননা তিনিই এর কারিগর ও স্রষ্টা। তাই তিনি জানতেন এর পরিণতি আর ভবিষ্যত। এই বিশ্বজগতের দুঃখ-দুর্দশা এবং এর পরিবর্তিত অবস্থা। আল্লাহ তার ঐশ্বরিক পরিকল্পনা পরিপূর্ণ করার মানসে এবং তার ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন।

(আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে) তিনি লক্ষ্য করলেন যে, মানবতা বিভিন্ন অনৈতিক ও অসম ধারায় দ্বিধা বিভক্ত। কেউ আগুনকে পূজা করছে, যা সে নিজেই প্রজ্জ্বলিত করেছে, অন্যেরা নিজেদের তৈরী মূর্তিকে পূজা করছে। তাদের অন্তরগুলো আল্লাহ ও সত্যকে সাক্ষ্য দিলেও কার্যত তা তারা অস্বীকার করছে।

আল্লাহ ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, মুহাম্মদ (দ.)-এর মাধ্যমে তিনি অন্ধকার দূরীভূত করে (এ সব অন্তরগুলোকে) আলোয় উদ্ভাসিত করবেন, তাদের মন থেকে কলুষতা ও অবিশ্বাস দূর করবেন এবং কুয়াশার পর্দা যা তাদের চোখগুলোকে অন্ধকার রেখেছে তা বিদূরিত করবেন।

রাসূল (দ.) অতুলনীয় অধ্যবসায় ও অসীম বলিষ্ঠতায় মানবজাতিকে সত্যের পথে আহ্বান জানিয়ে তাদের হেদায়তের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাদের পথভ্রষ্টতার হাত থেকে রক্ষা করেন, তাদের চোখের অন্ধত্ব দূর করেন

(অন্তরগুলো কলষমুক্ত) এবং তাদের অটল ও অবিচল বিশ্বাসের প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা গ্রহণ করেন, স্রষ্টা হিসেবে তাঁর ঐশ্বরিক ইচ্ছার আলোকে তার অসীম ক্ষমাশীলতা ও সহৃদয়তার নিদর্শন হিসেবে এবং তাঁর সীমাহীন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি তাকে ফিরিয়ে নেন।

মুহাম্মদ (দ.) এখন সকল প্রকার কষ্ট, লাঞ্ছনা ও উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত। তাঁর আত্মা এখন পরম শান্তিতে স্বর্গসুখে অবস্থান করছে। আল্লাহর একান্ত অনুগত ফেরেশতাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি এখন মহান আল্লাহর পবিত্র সান্নিধ্যে কালযাপন করছেন। আল্লাহ তায়ালার সর্বোৎকৃষ্ট রহমত ও দয়া আমার পিতার উপর বর্ষিত হোক। যিনি তার রাসূল তাঁর প্রত্যাদেশের ধারক ও সবচেয়ে প্রিয়তম সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। অনন্তকালব্যাপী তাঁর উপর অবিরাম ধারায় আল্লাহর অশেষ নেয়ামত ও বরকত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর বান্দারা তাঁর আদেশ নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা তোমাদের জন্য ওয়াজিব। তোমরা তার ধর্ম ও দ্বীনের বাহক। আল্লাহ তোমাদের নিজ নিজ আত্মার প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর বাণী অন্যদের কাছে পৌছানো ও তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর আল্লাহ যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন তা পুরোপুরি যথার্থ। কারণ পূর্বে শর্তাবলি নির্ধারন করা হয়েছে তার আলোকে তোমরা তার নির্দেশ পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে রাসূল (দ.)-এর মাধ্যমে প্রেরিত মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ (কুরআন)।

অতএব আমাদের সঙ্গে রয়েছে কুরআন-এ নাতিক (সবাক কুরআন) কুরআন এ সাদিক (সত্য নিষ্ঠ বা জীবন্ত কুরআন) উজ্জ্বল নূর এবং প্রাচুর্যপূর্ণ ও অত্যুৎকৃষ্ট দীপ্তময়তা।

এই মহাগ্রন্থের দৃশ্যমান দিক অকাট্য ও স্পষ্ট এবং অন্তর্নিহিত চেতনা সহজবোধ্য। এর বাণীসমূহ দীপ্তিময় সুস্পষ্ট ও অতি প্রাঞ্জল। এর অনুসারীদের জীবন সাফল্যের ক্ষেত্রে ঈর্ষনীয় এরা যথা সম্মানিত। এই মহাগ্রন্থই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ প্রদর্শক। এই মহাগ্রন্থ তাদের মুক্তির নিশ্চয়তা দেয় যারা আন্তরিকতা ও গভীর প্রেমে এর অনুসরণ করে।

এই মহাগ্রন্থের যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা হলো:

- এর অন্তর্নিহিত মর্মবানী ও দিক নির্দেশনা,
- এর মৌলিক বাণী ও ঐশ্বরিক নির্দেশনার বিষয়বস্তু
- যা কিছু আমাদের জন্য নিষেধ বা হারাম তা নিয়ন্ত্রনের বিধান
- আল্লাহর বিধান ও আহকামের সুস্পষ্ট বর্ণনা
- এর যৌক্তিকতার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত নৈতিক উৎকর্ষ
- এর যথার্থতার প্রগাঢ়তা
- আমাদের জন্য যা কিছু বৈধ তার বর্ণনা
- মানবীয় শিষ্টাচারের সুনিপুন ব্যাখ্যা

অতএব আল্লাহ (এই কিতাবের মাধ্যমে) আমাদের

- ঈমান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন বহু ঈশ্বরবাদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য; নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য থেকে বিমুক্ত ও বিশোধিত থাকার জন্য
- দান খয়রাতের নির্দেশ দিয়েছেন, বিশ্বাসের ভিত দৃঢ় করার জন্য
- হজ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, দ্বীনকে নিরাপদ ও শক্তিশালী করার জন্য
- ন্যায়পরায়ণাতর নির্দেশ দিয়েছেন পরস্পরের মাঝে সংহতি বজায় রাখার জন্য
- আমাদের (আহলে বাইত) মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন সুষ্ঠু শাসনকার্য পরিচালনা ও সংহতি সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে আমাদের ধারাবাহিক নেতৃত্ব মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।
- তোমাদের ঐক্যমত্য অপুষ্ট রাখার ও অবিচ্ছিন্নতার বিচ্যুতি প্রতিরোধের জন্য,
- জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে (আর ভণ্ড ও অবিশ্বাসীদের অবদমিত করার জন্য)
- ধৈর্য্যশীল ও সংযমী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পরকালীন পুরস্কার প্রাপ্ত সহজতর করার লক্ষ্যে, সহানুভুতি, সহমর্মিতা ও সৎ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন জনগণের কল্যান নিশ্চিত করা ও নিরপেক্ষতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে

- নিকট আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সমবেদনা ও ভালোবাসা পোষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন ভবিষ্যত বংশধরদের উন্নতি নিশ্চিত করার (এবং জীবনের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে)
- অপরাধের জন্য ক্ষতিপূরনের (কিসাস ও রক্তপন) বিধান নিশ্চিত করেছেন
- অন্যায় ও উচ্ছৃঙ্খল রক্তপাতের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার লক্ষ্যে
- তাওবা প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তির লক্ষ্যে
- ওজন ও মাপের নির্ভুলতা বজায় রাখতে বলেছেন অন্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না করার লক্ষ্যে
- মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষেধ করেছেন অসচ্চরিত্রতা ও অতি জঘন্য আচরণ থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে
- অপবাদ ও মিথ্যা কলঙ্ক ছড়াতে নিষেধ করেছেন ঐশ্বরিক শান্তি ও আযাব থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে
- চুরি ডাকাতি করতে নিষেধ করেছেন বিশুদ্ধতার ও সচ্চরিত্র অর্জন করার লক্ষ্যে এবং শিরক (অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা) তিনি পরিপূর্ণভাবে বাতিল করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক হিসেবে তাঁর উপর তোমাদের বিশ্বাসের অনাবিলতা অটুট রাখার লক্ষ্যে

অতএব আল্লাহর বিধান পালন করো এবং তাকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করে নিজেদের সুরক্ষা করো এবং তাঁর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন না করে মৃত্যুবরণ করোনা (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০২)

এবং আল্লাহ যেভাবে যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তা পালন করো এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকো তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা সঠিক জ্ঞানের আলোকে আলোকিত শুধু তারাই সত্যিকারভাবে আল্লাহর প্রতি সশ্রদ্ধ ভয় রাখে। (সূরা ফাতির, আয়াত-২৮)

হে লোক সকল! তোমরা অবগত আছ যে, আমি ফাতিমা যাহরা এবং আমার পিতা মুহাম্মদ। আমি যা বলি তাতে কখনো বৈপরিত্য খুঁজে পাবে না এবং আমার আমল ত্রুটি বিহীন। অবশ্যই তোমাদের মাঝ থেকেই তোমাদের জন্য রাসূল এসেছেন। তাঁর উপর অর্পিত প্রত্যাদেশ অত্যন্ত ভারী যা (ভবিষ্যতে)

বহনে (প্রতিপালানে) তোমরা অনেক কষ্টের সম্মুখীন হবে। তোমাদের নিয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং মুমিনদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সদয় ও সহানুভূতিশীল। (সূরা তাওবা, আয়াত-১২৮)

তোমরা যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো এবং তার মহিমান্বিত অবস্থান (আল্লাহর দৃষ্টিতে) স্বীকার করো তাহলো তোমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, তিনি শুধু আমারই পিতা, তোমাদের কোনো নারীর নয় এবং আমার স্বামী আলীর ভাই তোমাদের কোনো পুরুষের নয়। আর তাঁর সঙ্গে এভাবে সম্পর্কিত থেকে পারাটা কতই সম্মানের। তিনি মানবজাতির কাছে আল্লাহর বাণী পৌছিয়েছেন এবং তাঁর (আল্লাহর) অসন্তুষ্টির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বহু ঈশ্বরবাদের মতবাদকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি মানবজাতিকে সত্যের পথে মহান প্রভুর পথে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, তাদের নিবিড়ভাবে পরামর্শ দিয়েছেন এবং যারপরনাই প্রানান্তকর চেষ্টা করেছেন যেন তারা অন্ধকার ছেড়ে আলোর পথে ফিরে আসে। তিনি তাদের মূর্তিগুলো ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তাদের দর্প চূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তার সংগ্রাম অব্যহত রেখেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না বাতিলের মিলিত শক্তি বিভক্ত হয় এবং তারা পরাজয় মেনে নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। অতঃপর অন্ধকারকে বিদীর্ন করে আলো তার পথ করে নিল। যা সত্যকে তার আসলরূপে উম্মোচিত করল।

সত্যের বাহকের দৃঢ় কণ্ঠ তখন হলো আরও দৃঢ় এবং তা ধীরে ধীরে স্তব্ধ করে দিলো অবিশ্বাসীদের কুপ্ররোচনা ও সকল শয়তানি কর্মকাণ্ড। এভাবেই অসৎ মতাদর্শের বিশ্বাসীরা ধ্বংস হয়ে গেল এবং আক্রোশ ও অবিশ্বাসের শেষ যোগসূত্রও (যা ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এরপর তোমরা (নিজ কণ্ঠে) কালেমা (সত্যের ঘোষণা) পাঠ করলে যা তোমরা (শিখেছিলে) তাদেরই কাছ থেকে যারা প্রায়ই অন্ধকারে থাকলেও তাদের মুখমণ্ডল থাকত অজাগতিক এক আলোয় উদ্ভাসিত (আল্লাহ তায়ালা যাদের কলুষতার কালিমা থেকে মুক্ত রেখেছেন এবং যথাযোগ্য পবিত্রতায় শোভিত করেছেন। সংকটপূর্ণ এই সন্ধিক্ষণে তোমরা ছিলে ভয়াবহ এক অতল গহ্বরের প্রান্তসীমায়। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩)

তখন তোমরা ছিলে অসহায়, দুর্বল ও সংখ্যালঘু। তোমরা ছিলে এক গ্রাস খাবারের সমতুল্য, যা মানুষের পক্ষে পানি দিয়ে গিলে খাওয়া অসম্ভব ছিল না। তোমরা ছিলে অঙ্গারের ন্যায় যে কোনো ব্যক্তি তাকে নিমেষের মধ্যে

নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারত। তোমরা ছিলে তেমনই যা বিনা দ্বিধায় পদদলিত করা মোটেও কঠিন কাজ ছিলনা। তোমরা এতটাই অপরিণত ও অমার্জিত ছিলে যে, তোমরা ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত পানি পান করতে এবং প্রাণীর দেহ ও গাছের পাতা ছিল তোমাদের আহার্য। তোমরা ছিলে সবচেয়ে হীনাবস্থা সম্পন্ন এবং সবার কাছে প্রত্যাখ্যাত তোমাদের নিয়ে এই ভয় ছিল যে, পাছে সবাই মিলে তোমাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে না ফেলে। মহান আল্লাহ আমার পিতা মুহাম্মদ (দ.)-এর মাধ্যমে তোমাদের পরিত্রাণ দান করেছেন। অনেক প্রতিকুলতা পেরিয়ে অনেক উত্থান পতন, যন্ত্রনা ও তিক্ততার সম্মুখীন হয়ে নেকড়েতুল্য বেদুইনদের মধ্য থেকে ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রকৃতির বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি এই সফলতা লাভ করেছেন, বার বার তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করেছে আর আল্লাহ তা নির্বাপিত করেছেন। (সূরা মায়েদা, আয়াত-৬৪)

উটের পিষ্ঠে আরোহন পুর্বক দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে তাদের অন্ননালি চেপে ধরার জন্য রাসূল তার চাচাত ভাইকে নিয়োগ করলেন। আর তিনি (আলী) তাদের মস্তকগুলো পদদলিত না করা পর্যন্ত আপন তরবারি দিয়ে তাদের অগ্নিশিখাগুলো নির্বাপিত না করা পর্যন্ত কখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত আসেননি। (উল্লেখ্য, অনেক সাহাবাই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফেরত গেছেন সেই ইতিহাস প্রচলিত উমাইয়া ইতিহাস রচয়িতাগণ এড়িয়ে গেছেন)। আল্লাহর মাহাত্ম সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তার (আল্লাহর) ইচ্ছা ও নির্দেশ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সদা সর্বদা সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন তাঁর (আল্লহর) রাসূলের সবচেয়ে প্রিয় ও আপনজন। তিনি ছিলেন আমীরুল মুমিনীন "বিশ্বাসীদের নেতা"। ন্যায়ের স্বপক্ষে তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। পরামর্শের ক্ষেত্রে আন্তরিক। আল্লাহর ইচ্ছা পূরনের লক্ষ্যে ছিলেন সদা সন্ধানী। আল্লাহর পথে ছিলেন সার্বক্ষণিক অক্লান্ত পরিশ্রমে লিপ্ত এবং অবিশ্বাসীদের অভিযোগ ও অন্যায় আচরনের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন সদা প্রস্তুত। অথচ তোমরা উচ্ছৃঙ্খল ভোগ বিলাসে কালযাপন করছ। সবাই ধোয়ার থেকে জীবনের আরাম আয়েস ও সুখশান্তি উপদেশ করেছ এবং অপেক্ষা করেছ সেই সময়ের যখন দিন আমাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে এবং সেই দুসংবাদ করে তোমাদের কানে পৌছাবে। বিপদের দিনে তোমরা সব সময় দূরে সরে থেকেছ এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছ। (হযরত আলী

ও মাবিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময় মুসলমানরা যেভাবে হযরত আলীকে সহায়তা করার কথা ছিল তা করতে ব্যর্থ হয়েছ)

যখন আল্লাহ তাঁর নবীগণের ও বান্দাগণের পবিত্র ভূমিতে তার রাসূলের আগমন ঘটালেন তখন বিদ্বেষ, শত্রুতা ও কপটতা তোমাদের মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যা ধর্মের পবিত্রতাকে আঘাত করতে শুরু করল। যারা নীরবে অসন্তোষ বয়ে বেড়াচ্ছিল তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অখ্যাত কুখ্যাত অনেকেই মুখ খুলতে শুরু করল। অবিশ্বাসীরা গাধার ডাকের ন্যায় একে অন্যের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাতে শুরু করল এবং তোমাদের সঙ্গে মিলিত হলো। শয়তান এই সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াল এবং তোমাদের আহ্বান জানাল। সে তার ছলনা ও প্রতারণার ডাকে তোমাদের কাছ থেকে দ্রুত সাড়া পেয়ে গেলো। সে তোমাদের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হলো। এরপর তোমরা রোষের আগুন জ্বালাতে শুরু করলে এবং ক্রোধের দাবানলে আত্মহারা হয়ে পড়লে তোমরা অন্যের প্রাণী অন্যের জলাধার ইত্যাদি জোরপূর্বক ব্যবহার ও জবর দখল করতে শুরু করে দিলে। এসব যখন ঘটছিল তখনও রাসূলের চিরবিদায়ের ঘটনা একেবারেই সদ্য ঘটে যাওয়া একটি বিষয়, যার নিদারুণ ব্যথা তখনও মানুষের হৃদয় থেকে মুছে যায়নি এবং গভীর ক্ষতে এতোটুকুও প্রশমিত হয়নি। এমনকি রাসূলকে তখনও সমাধিস্থ করা হয়নি।

পাছে কোনো সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি হয় এই খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে তোমরা তোমাদের এই কাজগুলো অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সম্পন্ন করে চলেছিলে। কিন্তু এর চেয়ে জঘন্যতম যুক্তি আর কি থেকে পারে? সাবধান তারাই ফিতনাতে লিপ্ত আছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদের গ্রাস করবে।

হায় সত্য পথ থেকে তোমরা কতইনা দূরে সরে গিয়েছো। তোমরা এ কোন অপ্রত্যাশিত পথে পা বাড়িয়েছো। পথভ্রষ্ট হয়ে তোমরা এ কোন পথে চলতে শুরু করেছো। মহান আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ তোমাদের হাতেই রয়েছে। এর ঘোষণা সুস্পষ্ট এর হুকুম পরিষ্কার এর পথ নির্দেশনা অত্যুজ্জ্বল। এর বিধি নিষেধ বৈশিষ্টপূর্ণ এবং এর আদেশ স্পষ্টত প্রতীয়মান।

তথাপি তোমরা এই ধর্মগ্রন্থ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো। তোমরা এ থেকে বিমুখ থেকে চলেছ? নাকি তোমরা পৃথক কোনো ধর্মগ্রন্থ দ্বারা পরিচালিত

থেকে চাইছ। হায় আফসোস। অত্যাচারীরা পবিত্র কুরআনের পরিবর্তে কতইনা নিকৃষ্ট এর আদর্শকে অনুসরণ করতে চলেছে। (সূরা কাহাফ, আয়াত-৫০)

এবং তোমরা জেনে রেখো যদি কেউ ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোনো ধর্মের অনুসরণ করে তবে তা তার নিকট কখনই গ্রহণযোগ্য হবেনা। পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৮৫) তোমরা সামান্যতম সময়ের জন্যও অপেক্ষা করোনি এই উষ্টি (খেলাফত) তো নির্দিষ্ট সময়ে আপন পথেই নিজের দায়ভার মুক্ত করত এবং শান্ত হয়ে যেত এবং সর্বসম্মত পথেই চলতে শুরু করত। তোমরা ফিতনার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছো এবং এর জলন্ত অঙ্গারে ইন্ধন জুগিয়ে শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়েছো। কারণ তোমরা মহান আল্লাহর পবিত্র ধর্মের দীপ্তিমান আলোক রশ্মি নিভিয়ে দিতে এবং তাঁর নির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তার রেখে যাওয়া নিদর্শন ও সুন্নাতসমূহ মুছে ফেলে দিতে চেয়ে ছিলে।

দুধের ফেনা সরানোর উসিলায় সুকৌশলে তোমরা এখন মাখন খেয়ে নিয়েছ। তোমরা গোপনে চক্রান্ত ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে রাসূলের আহলে বাইতের ক্ষতি করার পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছ। আমরা এসব কিছুই ধৈর্য্যের সঙ্গে এভাবে সহ্য করে নিয়েছি অথচ খঞ্জরের আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমাদের অন্তরগুলো বর্শার ফলায় বিদ্ধ হয়ে পড়েছে। এখন তোমরা দাবি করছ যে, উত্তরাধীকারী হওয়া থেকে আমরা বঞ্চিত? তারা কি সেই সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকদের আইনের অধীনেই শাসিত থেকে চায়? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিচারক আর কে থেকে পারে (সূরা মায়েদা, আয়াত-৫০) তোমরা কি এসব বিষয়ে অবহিত নও। নিশ্চয়ই তোমরা জানো। উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় এ কথা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, আমি হলাম পবিত্র রাসূলের কন্যা। ওহে মুসলমানেরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমার পৈত্রিক সম্পত্তি কি এভাবেই বেদখল হয়ে যাবে? হে আবু কুহাফার সন্তান। আল্লাহর কিতাবে কি এ কথা লিখা আছে যে, তুমি তোমার পিতার উত্তরাধিকারী থেকে পারবে আর আমি আমার পিতার ক্ষেত্রে তা থেকে পারব না। কতই না নিকৃষ্ট সব পন্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে। (সূরা মরিয়াম, আয়াত-২৭) মহান আল্লাহর এই ধর্ম গ্রন্থ কি তোমরা সজ্ঞানে পরিত্যাগ ও উপেক্ষা করছ? পবিত্র এই গ্রন্থে বলা হয়েছে সুলাইমান ছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী (সূরা আনাম, আয়াত-১৬) এবং নবী জাকারিয়ার ঘটনা বর্ণনা করার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। তোমার মহিমা থেকে আমাকে প্রদান করো এমন একজন প্রতিনিধি

যিনি হবেন আমার উত্তরাধিকারী এবং ইয়াকুব বংশেরও উত্তরাধিকারী। (সূরা মরিয়াম, আয়াত-৫)। আরও বলা হয়েছে আল্লাহর বিধান অনুসারে রক্তের সম্পর্কযুক্ত আত্মীয় স্বজন অন্যান্যদের চেয়ে অধিকতর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। (সূরা আনফাল, আয়াত-৭৫) সন্তানদের উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে ঐ মহান গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ হবে এক পুত্রের অংশ। (সূরা নিসা, আয়াত-১৪) তোমাদের জন্য (এটাই নির্ধারিত যে) যদি তোমাদের কেউ ধনসম্পত্তি রেখে মৃত্যুবরণ করে তবে সে যেন ন্যায় পরায়নতার সঙ্গে তা তার পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অসিয়তের মাধ্যমে দান করে যায়। এটা তাদের কর্তব্য। যারা ঐশ্বরিক বিধানের প্রতি পরিপূর্ণ সজাগ থাকে এবং এর ব্যত্যয় থেকে নিজেদের সুরক্ষিত থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮০) তোমরা দাবি করছ যে, আমি আমার উত্তরাধিকারত্বে হকদার নই এবং এতে আমার কোনো অংশ নাই (যেন আমাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ কি এমন কোনো আয়াত নাজিল করেছেন যার ফলে আমার পিতাকে পূর্বোক্ত বিধান থেকে রহিত করা হয়েছে? নাকি তোমরা বলতে চাও যে, আমরা (আমি ও আমার পিতা) পৃথক দুই আদর্শ বা বিশ্বাসের অনুসারী আর তাই আমরা একে অপরের উত্তরাধিকারের কোনো হক রাখিনা? আমি এবং আমার পিতা কি একই গোত্র, বংশ ও আদর্শের (দ্বীন) মানুষ নই? নাকি তোমরা কুরআনের সাধারণ ব্যাখ্যা ও বিশেষ তাৎপর্য সম্পর্কে আমার পিতা এবং আমার চাচাত ভাই আলীর চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখ? তাই যদি ভেবে থাকো, তবে ফাদাক (রাসূল (দ.) কর্তৃক ফাতেমাকে দান করা সম্পত্তি) এবং খেলাফত উভয়ই প্রস্তুত রয়েছে, নিয়ে যাও।

তবে মনে রেখো, কিয়ামতের দিন তোমাদের অবশ্যই এর মুখোমুখি থেকে হবে। সে দিন কতইনা উত্তম হবে, ওই শেষ বিচারের দিন। যেদিন স্বয়ং আল্লাহ হবেন বিচারক, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর রাসূল হবেন ফরিয়াদি। সেদিন অবিশ্বাসী ও বিপথগামীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেদিন তাদের অনুতাপ কোনো উপকারে আসবেনা। (সূরা মায়িদা, আয়াত-২৭) (ভুলে যেয়ো না) মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি দানের বিপরীতেই রয়েছে আমাদের জবাবদিহিতা ও তার পরিণতি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। কারা সেই দুর্ভাগা অসহনীয় কলঙ্কময় যন্ত্রনা যাদের গ্রাস করবে এবং তারা আল্লাহর চিরন্তন শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা হুদ, আয়াত-৩১) এরপর ফাতিমা যাহরা আনসারদের উদ্দেশ্যে

বললেন হে বীর পুরুষ নেতারা, হে জাতীয় সেনারা, হে ইসলামের রক্ষাকারী, আমার ন্যায্য অধিকারের ব্যাপারে তোমাদের এরূপ অনীহা ও দোদুল্যমানতার সমর্থনের কারন কি? আমার পিতা আল্লাহর রাসূল কি তোমাদের বলেন নি যে, প্রতিটি মানুষকে তার সন্তানের অধিকার ভোগের মর্যাদা দিতে হবে? কত স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই না তোমরা সবকিছু বদলে দিয়েছ কত দ্রুতই না তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছ এবং বিচ্যুতির শিকার হয়েছ। অথচ আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আমার দাবি আদায়ের যথার্থ শক্তি ও সামর্থ তোমাদের রয়েছে। নাকি তোমরা ভাবতে বসেছ যে, মুহাম্মদ (দ.) ইহকাল ত্যাগ করেছেন, আর সেই সঙ্গে সব কিছুর সমাপ্তি ঘটেছে। তবে তাঁর এই প্রস্থান নিঃসন্দেহে একটি মহাদুর্যোগসম ঘটনা অসহনীয় এই কষ্ট-যন্ত্রণা গভীর এই বিচ্ছিন্নতা। তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। তাঁর বিয়োগ ব্যথায় পৃথিবী হয়ে পড়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। গ্রহ নক্ষত্র হয়ে পড়েছে শোকাচ্ছন্ন। সূর্য-চন্দ্র হয়ে পড়েছে গ্রাসাচ্ছন্ন, পাহাড় পর্বতের শির হয়ে পড়েছে ন্যুব্জ, সকল প্রত্যাশা আজ রূপ নিয়েছে হতাশায়।

তাঁর গৃহের পবিত্রতাকে অমান্য করা হয়েছে। তার মহা প্রয়ানের পর যার যার প্রাপ্য সম্মান, শ্রদ্ধা পদদলিত করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ, এটাই (রাসূলের বিদায়) মানুষের জন্য গভীরতম দুঃখের ঘটনা এবং ভয়াবহতম এক যন্ত্রনার কারণ। আর কোনো কষ্টই এতটা অসহনীয় কিংবা এতো বেশি দুর্ভাগ্যজনক নয়।

মহান প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রেরিত সেই মহাগ্রন্থে এই বিষয়ের ঘোষণা পূর্বেই দিয়ে দিয়েছেন। যে গ্রন্থ (কুরআন) তোমরা প্রতিনিয়ত, সকাল-সন্ধ্যা ঘরে বাইরে সর্বত্র, সর্বক্ষণ চর্চা করো, সুমধুর সুরে তিলওয়াত করো কখনো উচ্চ কণ্ঠে আবার কখনো বা মৃদু কণ্ঠে কখনো অশ্রুসিক্ত নয়নে। পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের ক্ষেত্রেও একই দুর্যোগ এসেছিল। কারন মৃত্যু হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এটা আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যার কোনো ব্যত্যয় হবেনা।

মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তার পূর্বের সকল রাসূলই বিদায় নিয়েছেন। তিনিও আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাই বলে কি তোমরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে (ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বের অবস্থায়) নেবে? কিন্তু কেউ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাতে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে

পারবে না। তার প্রতি যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ অতি শীঘ্রই তাদের পুরস্কৃত করবেন। (সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৪৪)

হে কিলাইর (কিলাহ মদিনার একজন সম্ভান্ত নারী যার মাধ্যমে আনসারদের দুটি বংশ ধারার উদ্ভব হয়েছিল) সন্তানেরা? তোমরা যারা আমাকে দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ আমার চার পাশে সমবেত হয়ে আছ, তথাপি কি উত্তরাধিকা সূত্রে লব্ধ আমার পিতার সম্পত্তি জবর দখল হয়ে যাবে?

এখানে কি ঘটছে তা তোমরা ভালো করেই জানো। তোমাদের রয়েছে যথেষ্ট জনবল, শক্তি সম্পদ ও উপায়। তোমাদের সঙ্গে রয়েছে প্রচুর অস্ত্র সম্ভার। বারবার আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি কিন্তু তাতে তোমরা সাড়া দিচ্ছনা। সাহায্যের জন্য আমার এই আকুল আবেদন, যা তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিন্তু আমাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসছ না।

তোমাদের বীরত্ব সুবিদিত এবং অন্যের কল্যানে তোমাদের এগিয়ে আসাটাও প্রশংসনীয়। তোমরা সেই নির্দিষ্ট গোত্র যাদের পূর্ব থেকেই মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের পাশে থাকার জন্য রাসূল কর্তৃক তোমরাই নির্বাচিত। তোমরা অবিশ্বাসী আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ এবং অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছ। তোমরা যুদ্ধবাজ গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করেছ এবং সবচেয়ে অনমনীয় মুশরিকদের ছত্রভঙ্গ করেই এবং তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছ। তোমরা কখনও আমাদের অবাধ্য হওনি। নির্দেশ অমান্য করনি, সবসময়ই আমাদের পাশে থেকেছ এবং আমাদের নেতৃত্বাধীনে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করেছ।

জনগণ এর সুফল ভোগ করতে শুরু করেছিল। অবিশ্বাসীদের খোড়া যুক্তি ধুলোয় মিশে গিয়েছিল এবং অন্যায় ও অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের দণ্ডের প্রচণ্ডতা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস ও বহু ঈশ্বরবাদের অগ্নিশিখা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের বিধান পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অতএব (পবিত্র কুরআন ও রাসূলাল্লাহর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও) তোমরা কেন দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছ? যে সত্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছিল আজ কেন তাকে তোমরা গোপন করছ? এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর আজ কেন তোমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার পথে পা বাড়িয়েছ? ঈমান আনার পর আবার কেন তোমরা শিরকের পথে ধাবিত হচ্ছ?

যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল, রাসূলকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং তোমাদের বিরুদ্ধাচারন করেছিল তোমরা কি আজ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না? কী হলো আজ তোমাদের? তোমরা কি তাদের ভয় পাও। সত্যিকারের মুমিনের জন্য আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাওয়া সমীচীন হবে না। (সূরা তাওবা, আয়াত-৩১)

আজ আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা সত্যের পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছ। ন্যায় অধিকারের আলোকে নেতৃত্ব যার (একমাত্র) প্রাপ্য তোমরা তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছ। তোমরা আরাম-আয়েশ ও সহজলভ্যতার সঙ্গে সমঝোতা করেছ এবং দুঃখ-কষ্টময় জীবনের হাত থেকে পালিয়ে সুখ সম্ভোগের জীবন বেছে নিয়েছ। যে আদর্শ তোমরা লালন ও ধারণ করে ছিলে তা তোমরা নিজেদের চোখের আড়াল করে দিয়েছ এবং যে সত্য গ্রহণ করেছিলে তা পরিত্যাগ করেছ।

তবে মনে রেখ, যদি তোমরা এবং বিশ্বের সবাই অকৃতজ্ঞ হয়ে যাও তবু আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সকল প্রশংসার অধিকারী। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৮)

ভুলে যেয়ো না, আমার যতটুকু বলার ছিল তা আমি বলেছি, সবকিছু জেনে শুনেই তোমরা আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। কেননা তোমাদের অন্তরগুলো এখন ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসহীনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সত্যিই হতাশা ও বেদনা (দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে) আমাকে এতটাই দহন করছিল যে, নিরুপায় হয়েই আমাকে এসব বলতে হয়েছে। আর তাই তো দুঃখ-ব্যথায় পরিপূর্ণ আমার অন্তরের কষ্ট কিছুটা লাঘব হলো। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমি যে প্রচণ্ড ক্রোধে জর্জরিত হয়ে ছিলাম তা কিছুটা প্রশমিত হলো। যে নিদারুণ যন্ত্রনা আমার আত্মাকে কুঁড়ে কুঁড়ে মারছিল তা কিছুটা বিদূরিত হলো।

কারণ আমি তোমাদের সম্মুখে আমার যুক্তি সংগত দাবি উত্থাপন করতে পেরেছি, অন্যায়ের মুখোশ খুলে দিয়েছি এবং সত্যকে উন্মোচিত করেছি। যেন তোমরা কেউ কোনোদিন কোনো অজুহাত দাড় করতে না পরো। অতএব তোমরা যদি এমনটিই চাও তাহলে এই খেলাফত এবং আর যা কিছু চাও। তা নিয়ে যাও এবং তবে স্মরণ রেখো তোমাদের জন্য এই খেলাফত বাহন যথার্থই যন্ত্রনাদায়ক প্রমাণিত হবে। কেননা অন্যায়ভাবে বলপূর্বক দখলের স্থায়িত্ব কখনেই শুভ হয় না। এর পাদানিগুলো অমসৃন, এর আসন গর্তে

পরিপূর্ণ। আল্লাহর অনন্ত ক্রোধের চিহ্নাবলী এতে লিপিবদ্ধ করা আছে। অনাদি কলঙ্ক এর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আল্লাহর ক্রোধাগ্নিতে এটি প্রজ্জ্বলিত হবে, যা হৃদয়কে করে দিবে অশান্ত। তোমরা যা কিছুই করোনা কেন সবই আল্লাহর দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর শপথকে ভুলে (যেয়োনা) যারা মিথ্যার পথে চলছে তারা অতি সত্তরই জানতে পারবে যে, কত ভয়ানক পরিণাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তারই কন্যা যিনি তোমাদের এক ভয়াবহ শাস্তির ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের মতো কর্ম সম্পাদন করতে থাকে, আমরা আমাদের মতো আল্লাহর পথে চলি। আর অপেক্ষা করো আমরাও অপেক্ষায় থাকব। (সূরা হুদ, আয়াত-১২১-১২২)

এরপর হযরত আবু বকর জবাবে বললেন, হে রাসূলাল্লাহর কন্যা! নিসঃসন্দেহে আপনার পিতা বিশ্ববাসীদের জন্য ছিলেন স্নেহশীল, দয়ালু, সান্তনাদাতা ও সহানুভূতিশীল এবং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে (তাঁর সাবধানবাণী) আল্লাহ তায়ালার ভয়াবহতম শাস্তি এবং কঠোরতম প্রতিদান। গোত্রীয় বিচারে তাঁকে আমরা আপনার পিতা হিসেবে পাই। অন্য কোনো নারীর নয় এবং নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আপনার স্বামীর ভাই, অন্য কোনো সুহৃদের নয়।

তিনি (রাসূল) তাঁকে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে স্থান দিতেন। তিনিই (আলী) রাসূলকে সকল সংঘাতময় পরিস্থিতিতে সর্বাধিক সমর্থন প্রদান করতেন। আপনাকে যারা ভালোবাসতে সক্ষম হয়েছেন তারা অবশ্যই আশীর্বাদপুষ্ট ও সৌভাগ্যবান। আর যারা আপনার বিরোধিতা করেছে তারা নিঃসন্দেহে অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। কারণ আপনি রাসূলের পরিবারভুক্ত যারা সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে নির্ধারিত।

মঙ্গল ও করুণাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপনারা (আহলে বাইত) আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য। আপনারা আমাদের জন্য জান্নাত প্রাপ্তির পুরোধা। আর আপনি নিঃসন্দেহে আপনিই নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলের কন্যা। আপনি যা বলেন তাই-ই সত্য। জ্ঞানালোকের সর্বোচ্চ শিখরে আপনার অবস্থান। আপনার অর্জিত অধিকার থেকে আপনাকে বঞ্চিত করার কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই এবং আপনার মুখ নিঃসৃত বাণীর সত্যতাও আমরা অস্বীকার করতে চাইনা।

আল্লাহ শপথ, আমি আল্লাহর রাসূলের মতো ধারার বিপক্ষে এতোটুকুও অগ্রসর হইনি এবং তাঁর অনুমোদনে বিপরীতেও কিছু করিনি। নেতৃত্বে অবস্থানকারীরা কখনোই জনগণের সঙ্গে মিথ্যাচার করতে পারেনা। আমি মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য মানছি এবং তিনিই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি। আমারা যারা আল্লাহর রাসূল তারা বংশধরদের জন্য না কোনো সোনা-রূপা রেখে যাই। না কোনো বসত বা জমি জমা রেখে যাই। আমরা রেখে যাই শুধু আল্লাহর ধর্মগ্রন্থ এবং জ্ঞানভাণ্ডার, পাণ্ডিত্য আর নবুয়ত। জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবিক চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের যা কিছু আছে তা শাসকের নিয়ন্ত্রনে অর্পিত হবে এবং তিনি প্রয়োজনের আলোকে সেগুলো ব্যবহার করবেন। আপনি যা দাবি করছেন তা আমরা যুদ্ধ সমাগ্রী ক্রয় করার জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি যেন মুসলমানেরা এর সাহায্যে ভালোভাবে যুদ্ধ করতে পারে। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরিক থেকে পারে এবং সকল বিদ্রোহী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাদের পুরোপুরি দমন করতে পারে।

এটা আমার একার সিদ্ধান্ত নয়; সকল মুসলমানের সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাতে কোনো বল বা শক্তি প্রয়োগ করা হয় নি। ... আপনি আপনার পিতার গোত্রের প্রধান এবং সবচেয়ে অগ্রগন্য। আপনার বংশধরদের জন্য আপনি বৃক্ষ স্বরূপ এবং অত্যধিক শ্রদ্ধেয়জন। আপনি যা বলবেন তা অস্বীকার করার বা নবী কন্যা হিসেবে আপনার সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করব এমন দুঃসাহস আমাদের নাই। আমার ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু আপনি কি প্রত্যাশা করেন যে, এ বিষয়ে আমি আপনার পিতার বক্তব্যের বিপক্ষে অবস্থান নেব?

এ প্রেক্ষিতে ফাতিমা যাহরা বলেন, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আমার পিতা কখনোই পবিত্র কুরআনের সঙ্গে অসঙ্গতিপুর্ণ কোনো কিছু বলেননি এবং করেন নি। তিনি এর নির্দেশেরও কখনো কোনো বিরোধিতা করেননি; বরং তিনি পূর্ণ আস্থার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে একে অনুসরণ করেছেন এবং এর প্রতিটি পারা ও আয়াত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, আপনারা কি তবে বিশ্বাসভঙ্গ করে মিথ্যা উদ্ভাবনের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে তাঁকে দোষারূপ করার লক্ষ্যে একত্র হয়েছেন? তাঁর মৃত্যুর পর আপনাদের একটি পদক্ষেপ (এ ভাবে তার

চরিত্র হনন) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে হত্যা চক্রান্তের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মর্মে প্রতীয়মন হচ্ছে।

এখন এই গ্রন্থই (পবিত্র কুরআন) আমাদের বিচারক যা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এখানে (নবী জাকারিয়া (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হবে এবং ইয়াকুবের পরিবার থেকে। (সূরা মারইয়াম, আয়াত-৬) আরও বলা হয়েছে, "সুলায়মান প্রাপ্ত হয়েছিলেন দাউদ থেকে। (সুরা আন নামাল, আয়াত-১৬) আল্লাহ এভাবেই যার যার প্রাপ্য অংশের সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে কী বিধান হবে তাও বলেছেন। পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে বণ্টনের পরিমাণ কী হবে তাও বলেছিলেন। এ ভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সকল খোঁড়া যুক্তি চূর্ণ-বিচূর্ন করেছেন আগামী প্রজন্মের জন্য এভাবে সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ দূরীভূত করেছেন। নিশ্চয়ই আপনার বিবেক আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে এবং আপনাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। কিন্তু আমি সুচিন্তিতভাবেই আমার অবস্থান গ্রহণ করেছি তুমি যখন কোন সিদ্ধান্ত আরোপ করো তখন তুমি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত-১৮)

এ প্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্যের পথে রয়েছেন এবং তাঁর রাসূলও এবং তাঁর রাসূলের কন্যাও সত্য কথা বলেছেন। নিঃসন্দেহে আপনি জ্ঞানালোকের সূতিকাগার। নেতৃত্বও করুণার উৎসস্থল। বিশ্বাসের স্তম্ভ এবং তাঁর (আল্লাহাতায়ালার) চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রস্রবনধারা। আমি আপনার যুক্তি অস্বীকার করছিনা কিংবা আপনার বক্তব্য প্রত্যাখ্যানও করছিনা। কিন্তু এখানে আপনার ও আমার মাঝে উপস্থিত (বিচারক ও সাক্ষী হিসাবে।) মুসলমানেরা রয়েছেন, যারা আমাকে এই গুরু দায়িত্ব (খেলাফত) অধিষ্ঠিত করেছে এবং যে মতামত আমি ব্যক্ত করেছি তা এদের সম্মতিক্রমে। কারণ আমি নিজের মতো বা ধারণা যে নির্ভুল তৎসম্বন্ধে অতিমাত্রায় অনড় স্বভাবের কিংবা স্বনির্ধারিত বা স্বেচ্ছাচারী কিংবা স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত এমন প্রকৃতির কোন ব্যক্তি নই। এগুলোই আমার স্বপক্ষের যুক্তি। এরপর হযরত ফাতিমা যাহরা জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, হে মুসলমানরা! তোমরা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছ এবং অতিশয় ঘৃণ্য ও অনিষ্টকর এক কর্মযজ্ঞ দেখেও চোখ বন্ধ করে আছ। তোমরা কি পবিত্র কুরআনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করোনা? নাকি তোমাদের অন্তরগুলো মোহর অংকিত হয়ে গেছে। (সুরা মুহাম্মদ, আয়াত-২৪)

বস্তুতপক্ষে তোমাদের অন্তরগুলো অসৎ কর্মের আতিসয্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে যা করতে তোমরা অভ্যস্ত। (সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত-১৪) তোমাদের শ্রবনশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিগুলো ফাঁদের জালে আটকে গেছে। তোমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ তা অত্যন্ত অনৈতিক ও অধার্মিকতাপূর্ণ। তোমরা চলেছ অসৎ পথে। পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে তোমরা বিদ্বেষকে বেছে নিয়েছ। আল্লাহর শপথ। বেশি ভারী হয়ে উঠবে তোমাদের এই বোঝা বহন করা এবং ধ্বংসই হবে এর শেষ পরিনতি। একদিন সকল পর্দা উন্মোচিত হবে। পর্দার আড়ালে পুঞ্জিভুত সকল দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রনা-বেদনা অন্যায়-অত্যাচার পরিস্ফুটিত হয়ে পড়বে। সেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে এর এমন প্রতিদান তোমরা পাবে যা তোমরা ধারণাও করতে পারছনা যারা মিথ্যার উপর অটল ছিল তা সেদিন ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। (সূরা মুমিন, আয়াত-৭৮)

হযরত আবু বকর ও হযরত উমর হযরত ফাতিমা যাহরা এর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা করছিলেন এবং এ ব্যাপারে তারা হযরত আলীর শরণাপন্ন হলেন এবং হযরত ফাতিমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করেন। ফাতিমা যাহরা তাদের অনুমতি দিলেন।

তাঁরা হযরত মা ফাতিমার সামনে উপস্থিত হলে তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। তাদের কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি প্রশ্ন করলেন। এখন আমি তোমাদের রাসূল (দ.)-এর কিছু কথা বলব, তোমরা কি তা গ্রহণ ও মান্য করবে?

অবশ্যই তারা জবাব দিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা রাসূল (দ.)-কে বলতে শুনেছ, "ফাতিমার সন্তুষ্টি আমার সন্তুষ্টি আর ফাতিমার ক্রোধ আমার ক্রোধ। আবার যে আমার কন্যা ফাতিমাকে ভালোবাসে সে পক্ষান্তরে আমাকেই ভালোবাসে। যে আমার কন্যা ফাতিমাকে সন্তুষ্ট করে, সে আমাকেই সন্তুষ্ট করে।" তোমরা কি তা শোনো নি? হ্যা, আমরা আল্লাহর রাসূল (দ.)-কে এমনটা বলতে শুনেছি, তারা নিশ্চিত করলেন।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এবার আমি আল্লাহর ও তাঁর ফেরেশতাদের সাক্ষী করে বলছি যে, তোমরা আমাকে অসন্তুষ্ট করেছ এবং আর কোনোদিন সন্তুষ্ট করতে পারবেনা। অবশ্যই আমি রাসূল (দ.)-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমাদের

বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। তার উপর আরো তীব্র ভাষায় হযরত ফাতিমা তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন "আল্লাহর কসম আমি আমার প্রত্যেক নামাজে তোমাদের উপর আল্লাহর লানত প্রদান করব।"[৮]

উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে রাসূল (দ.) ওফাতের পর এক বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত পেতে ব্যর্থ হয়। কারণ রাসূল (দ.) যাদেরকে কুরআন ব্যাখ্যার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন পবিত্র কুরআনের সঙ্গে আমার আহলে বাইত হলো নূহের নৌকা এবং কুরআন ও আহলে বাইতের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে যা কিয়ামত পর্যন্ত একই সঙ্গে থাকবে। মুসলিম জাতির দুর্ভাগ্য যে নবী (দ.)-এর আহলে বাইতকে বাদ দিয়ে অথবা কুরআন হাদীসের ব্যাপারে তাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা রাষ্ট্রীয়ভাবে অগ্রাহ্য করার ফলে এই মহান আহলে বাইয়াতের সম্মানিত সদস্যগণই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

মা ফাতেমাতুজ যাহরা কর্তৃক কিছু সংখ্যক সাহাবীর কুরআনের ও হাদীসের ব্যাখ্যা জনিত জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পারিবারিক ক্ষতির জন্য দায়ী করে আল্লাহ ও তার রাসূলের দরবারে বিচার প্রার্থনা করা ও প্রতিটি নামাজের পর তাদেরকে লানত বা অভিসম্পাত করা যে একটি ভয়াবহ ব্যাপার। সবচেয়ে বড় বিষয় যে তাদের এই ব্যাখ্যা যে সঠিক ছিলনা তার বাস্তবতাই প্রমাণ করে। অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান্যের কারণে রাসূল (দ.) কর্তৃক ঘোষিত গাদীরে খুমের নির্দেশনা ইসলামের ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং মুসলিম জাতি এক মহা বিভ্রান্তির শিকার হয় এবং রেসালাতের মূল ভিত্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও ধর্মীয় নেতৃত্ব একই ব্যক্তির হাতে ন্যাস্ত থাকবে, বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর এই স্পষ্ট নির্দেশনা বাতিল করা হয়। এবং এই দুই ক্ষমতা থেকেই মহা পবিত্র আহলে বাইতদের নির্বাসিত করা হয়। এ কারণে যে কোনো লোক এমনকি জঘন্য পাপাচারী, ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার আলেম সমাজের সৃষ্টি হয়। যাদের প্রধান কাজই হলো এসব অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তাদের

[৮] ইবনে কুসায়বা আল ইমামাহ ওয়া আল হিয়াসা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪, ইবনে শাহরা শুর আল মানকিব, খণ্ড ২, পৃ. ১৩১; হযরত যয়নাব বিনতে আলী (রা.) ইসলামের পুর্নজীবন দান কারিনী, লেখক আবু তালিব আত তাবতিজী অনুবাদ মোস্তফা কামাল।

ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে সহায়তা করা। আহলে বাইতের মহান সদস্যবর্গ তাঁদের বক্তব্যে এই বিষয়টি বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন অথচ বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহ তাদের বক্তব্য কার্যত গুরুত্বহীন বিবেচনা করে ইসলামের যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন যা আজ পর্যন্ত পূরন করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আলেম সমাজ কর্তৃক যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো পদ্ধতিতে শাসন ক্ষমতা দখলের তথা কথিত বৈধতা দানের মাধ্যমে রাজনৈতিক শাসন কতৃত্বের মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মকে পদদলিত করার এই মানবতা বিরোধি প্রক্রিয়ারই এক পর্যায় কারবালার এই মর্মান্তিক ঘটনার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

হযরত ইমাম হোসাইন ও কারবালা

জান্নাতের যুবকদের সর্দার, মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ্ (দ.)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র, শহীদদের নেতা ও মজলুম ইমাম হোসাইন, ৪ঠা হিজরী সনে শাবান মাসের ৫ তারিখ বৃহস্পতিবার পবিত্র নগরী মদিনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রা)'র বহুবিধ গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে যাকী, রাশীদ, তাইয়েব, সাইয়েদ মুবারক এবং আল্লাহর আনুগত্যকারী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

পবিত্র কুরআনে হযরত হোসাইনের জন্ম-সম্পর্কিত আয়াতঃ

ইবনে শাহ আশাহব আশোব তাঁর 'মানক্বিব' গ্রন্থে কিতাব আল আনওয়ার এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহাতা'লা রাসূল (সা.)-কে ইমাম হোসাইনের মাতৃগর্ভে আসা ও তাঁর জন্ম সম্পর্কে অভিনন্দন পাঠালেন এবং একই সঙ্গে তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে শোকবার্তা পাঠালেন। হযরত মা ফাতিমাকে তা জানানো হলো তিনি শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়:-

> **"কষ্ট নিয়ে তাঁর মা তাঁকে বহন করেছে এবং কষ্টের ভেতরে সে তাঁকে প্রসব করেছে এবং তাঁকে গর্ভে ধারণ ও দুধ খাওয়ানো ছিল ত্রিশ মাস।"** (সূরা আহকাফ্, আয়াত-১৫)।

সাধারণত একজন নারীর গর্ভকাল হলো নয় মাস এবং কোনো শিশু ছয় মাসে জন্মগ্রহণ করে বেঁচে থাকে না ব্যতিক্রম ছিলেন নবী ঈসা (আ.) এবং ইমাম হোসাইন।

হযরত ইমাম হোসাইন রাসূল (দ.)-এর পুত্র সন্তান হওয়া সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণাঃ

"আপনার কাছে এই জ্ঞান আসার পর এ নিয়ে কেউ বিতর্ক করতে এলে তাকে বলুন, "এসো আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের আমাদের নিজ সত্তা (প্রাণ, নফস) ও তোমাদের নিজ সত্তাকে, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ)।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত-৬০)

ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতকে আয়াতে 'মোবাহালা' বলা হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ নজরানে খৃষ্টান পাদ্রীগণ রাসূল (দ.) ইসলামের দাওয়াত কবুল না করে তাঁর সঙ্গে এই বলে চ্যালেঞ্জ করল যে, রাসূল (দ.)-এর পক্ষ এবং তাঁদের পক্ষের ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট অভিসম্পাত প্রদান করবে। মিথ্যাবাদীর দল ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং সত্য বিজয়ী হবে। এ প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূল (দ.)-এর পক্ষে কারা থাকবেন সে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁর পুত্রগণ হিসেবে হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন, নারী হিসেবে মা ফাতেমা তুজ যাহ্‌রা ও রাসূল (দ.) স্বীয় সত্তা বা প্রাণ তথা নফস হিসেবে হযরত আলীকে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছেন। এদের চেহারা মোবারকের নূরের তাজাল্লী দেখে খৃষ্টান পাদ্রীগণ তাঁর সাথিদের জানালেন যে, তাঁরা এমন ব্যক্তিত্ব, যদি তাঁরা পাহাড়কে আদেশ করেন তবে তাও সরে যাবে। আর এদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জে গেলে খৃষ্টান জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা গেল যে, হোসাইন আল্লাহর নির্দেশের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর পুত্র।

মহাপবিত্র ইমাম হোসাইন:

"হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের নিকট থেকে সকল অপবিত্রতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে পুতঃপবিত্র রাখতে।" (সূরা আহযাব, আয়াত-৩৩)

আলোচ্য আয়াতে নবীর 'আহলে বাইত' বলে নবী পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সকল আলেম এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেন যে, নবীর আহলে বাইত হলেন- হযরত আলী, মা ফাতেমা যাহ্‌রা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন এবং তাদের বংশধরগণ। তাই এটা তর্কাতীত যে,

নবী-পরিবারের পবিত্রতা কিয়ামত পর্যন্ত একটি স্বীকৃত ব্যাপার। তাই এই পরিবারের সদস্যগণেই প্রকৃতপক্ষে অন্যদেরকে পরিশুদ্ধতা দান করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব বা কর্তৃপক্ষকে হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আর অন্যকে এই পরিশুদ্ধ করার ক্ষমতা নবী ও নবীর উত্তরাধিকারীদের জন্যই সংরক্ষিত। পবিত্র কুরআনে নবীদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"অবশ্যই আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাঁদের জন্য তাঁদের (জাতির) থেকেই এক রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ আবৃত্তি (তেলাওয়াত) করে শুনিয়ে থাকেন। তাঁদেরকে (আত্মাসমূহকে) পরিশুদ্ধ করো। আর তাঁদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা (হিকমত) শিক্ষা দেন এবং নিশ্চয় তাঁরা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৬৪)

বর্ণিত আয়াতের মর্মানুযায়ী জানা যায় যে, নবীদের দায়িত্বের মধ্যে মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা অন্যতম। আর এই দায়িত্ব পালন করতে হলে তাঁকে অবশ্য চিরপবিত্র থেকে হবে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা নবীদের উত্তরাধিকারীকে এভাবে মহাপবিত্রতা দান করেছেন।

ইমাম হোসাইনকে ভালোবাসা বাধ্যতামূলক বা ঈমানের অংশঃ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

"এটাই সেই বিষয়, যার সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দান করেন যাঁরা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। হে রাসূল! আপনি বলে দিন। আমি এর (ধর্ম প্রচারের) জন্ম তোমাদের নিকট থেকে আমার পরমাত্মীয়দের প্রতি সোহার্দ (মোয়াদ্দাত বা অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ী ভালোবাসা) ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাহি না এবং যে ব্যক্তি উত্তম কর্ম করবে আমি তাঁর জন্য এতে কল্যাণ বৃদ্ধি করে দেব, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা শুরা, আয়াত-২৩)।

তাফসীরে 'কাশ্‌শাফ', 'রূহুল বায়ান', 'তাফসীরে কবীর', 'তাফসীরে দুররে মানসুর' প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি নাযিল হলে মহান নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালোবাসার উপর মৃত্যুবরণ করে সে শহীদের মৃত্যুবরণ করে, সে পূর্ণাঙ্গ ঈমানসহ মারা যায় তাঁকে মালাকুল মওত ও মুনকির-নাকীর বেহেশতের সুসংবাদ দান করেন। তাঁকে বেহেশতে সেভাবে প্রেরণ করা হবে যেমন নববধূ স্বামীর গৃহে যায়। আর যারা তাঁদের

প্রতি শত্রুতায় মৃত্যুবরণ করে, কিয়ামতে তাঁদের ললাটে লেখা থাকবে, "এরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।" স্মরণ রেখো তারা কাফির, তারা বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না।" তখন জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, তাঁরা কারা, যাঁদের ভালোবাসা আল্লাহ আমাদের জন্য ফরয করেছেন? জবাবে তিনি (রাসূল দ.) বলেন, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন। তিনি আরো বলেন, যারা এদের উপর জুলুম করবে এবং এদের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেবে তাদের জন্য বেহশেত হারাম হয়ে যাবে। তাফসীরে সালাবীতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত 'উত্তম কর্ম' বলতে মহানবী (সা.)-এর বংশধরদের প্রতি ভালোবাসাকে বুঝানো হয়েছে। তাফসীরে কাশ্‌শাফ্ থেকে রেওয়াতটি বর্ণিত হয়েছে।[৯]

ইমাম হোসাইনের ইমামত প্রসঙ্গেঃ

বিশ্ব জাহানের প্রভু। আকাশ ও সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, মালিক ও শাসনকর্তা তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের পরিচালনা করার জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের 'ইলাহা' তথা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে তিনি তাঁর সৃষ্ট মানবকূলের মধ্য থেকে এমন সব লোকদের নির্বাচিত ও নিয়োগ করে থাকেন। যাঁরা তাঁর উপর দৃঢ়ভাবে ঈমান আনয়ন করেন। তাঁর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর প্রনয়ণকৃত বিধি-বিধান অর্থাৎ আদেশ-নির্দেশ বা আইন অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে থাকেন। এই সব মহান ব্যক্তি হলেন মানবজাতির পথপদর্শক (হাদী) নবী-রাসূল (আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা ও আল্লাহর প্রতিনিধি। সাধারণভাবে এই সব মহান ব্যক্তি নবী-রাসূল পদবি ব্যবহার করার জন্য এবং 'ধর্ম' ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্যক না জানার কারণে আমরা তাঁদেরকে শুধু 'ধর্মীয় নেতা' বা ধর্ম প্রচারকারী হিসেবে জানি এবং অন্যান্য পার্থিব কর্মকাণ্ডে তাঁদের কোনো ভূমিকা বা ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করি না। অথচ আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে এই বিশ্ব পরিচালনা তথা শাসন করে আসছেন। নবী-রাসূল পদবি যেন এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো বিভ্রান্তিতে না ফেলে অর্থাৎ মানবীয় বিবেচনায় যেন আমরা এদেরকে শুধুমাত্র 'ধর্মীয় নেতা' হিসেবে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ না করি সে কারণে কুরআনে

[৯] তাফসীরে কাশশাফ্- ৩য় খণ্ড, পৃ-৬৮।

আল্লাহ তায়ালা সরাসরি প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এই সব মহান ব্যক্তিদের জন্য আরো কয়েকটি পদবি নির্ধারণ ও ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের একটি পদবি হলো 'ইমাম'। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। 'স্মরণ করো যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বাক্য (বিষয়ে) দিয়ে পরীক্ষা করলেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ বললেন- আমি তোমাকে মানবজাতির 'ইমাম (নেতা, অনুকরণীয় মান্যবর, বিশ্বনেতা) নিয়োগ/নির্বাচন করলাম। সে বলল, আমার বংশ ধরদের মধ্য থেকেও। আল্লাহ বলেন–

(হ্যাঁ কিন্তু) আমার অঙ্গীকার (তথা এ নিয়োগ) জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১২৪)

এই আয়াত থেকে স্থিরভাবে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, আল্লাহ কর্তৃক এই বিশ্ব পরিচালনা পদ্ধতি আমাদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী শুধু ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পার্থিব কর্মকাণ্ড ও তাঁদের পরিচালনাধীন এবং এই কর্মকাণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের এই বিশ্ব পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জালিম, ফাসেক, পাপাচারী, দুরাচার, অসৎ ব্যক্তির ইমামতি বাতিল। এ ধরনের ব্যক্তি জনগণের বা জাতির ইমাম তথা নেতা হওয়ার জন্য অযোগ্য। কোনো ব্যক্তি যদি স্বঘোষিত পন্থায় এ পদে জেঁকে বসে তবে তার অনুগমন, অনুসরণ, আনুগত্য ও সম্মান করা জনতার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

অনুরূপভাবে সূরা আম্বিয়ার ৭৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন–

"...তাদেরকে ইমাম (নেতা) বানিয়েছিলাম তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত..."।

আবার সূরা সাজদার ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এই 'ইমাম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন–

"আর আমি তাহাদের মধ্য থেকে ইমাম (নেতা) নির্ধারণ/নিয়োগ করেছিলাম। যাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।"

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গ প্রকৃতপক্ষে জনগণের সার্বিক নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন

অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতি (আমাদের সংজ্ঞায়) আলাদা কোনো বিষয় নয় বরং আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ইমাম পার্থিব সকল কর্মকাণ্ড নির্বাহ করবেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে ইংরেজিতে Theocracy, বাংলায় ঈশ্বরতন্ত্র, ঐশীতন্ত্র বা দিব্যতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এই ধরনের আল্লাহর নির্বাচিত জননেতা, শাসক বা ইমাম ছিলেন।

বিদায় হজের পর রাসূল (দ.) 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণের মূল ভিত্তি ছিল আয়াতে 'তাবলীগ' যা সূরা মায়েদার ৬৭ নম্বর আয়াত–

"হে রাসূল! পৌঁছে দিন, যা আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর রেসালাতের কোন কিছুই পৌঁছালেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।"

আয়াতটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম যা প্রচার করার জন্য রাসূল (দ.)-কে বিশেষভাবে গুরুত্বরোপ করা হয়েছে, তা ভিন্ন মাত্রার এবং বিশেষ অর্থবহ। আর এটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ যা উম্মাহকে জানানো না হলে নবুওত ও রেসালাতের সমস্ত শিক্ষা কার্যত অকার্যকর বা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার হুকুমটি এমনই স্পর্শকাতর যে, তা প্রচার ও বাস্তবায়ন করতে গেলে মানুষের পক্ষ থেকে রাসূল (দ.)-এর অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে। আর সঠিকভাবে এই হুকুম বা নির্দেশনা জানা বা প্রতিপালন না করা হলে সেই সে সম্প্রদায় কার্যত কাফের বা খোদা অস্বীকারকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (দ.) ১০ হিজরী ১৮ জিলহজ 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। সুদীর্ঘ এই ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন।" আলী ইবনে তালিব হলো আমার ভাই, আমার ওয়াসি, আমার খলিফা, ও আমার পরবর্তী ইমাম। আমার সঙ্গে তাঁর মর্যাদা ও সম্পর্ক ঠিক তদ্রূপ যেমন নবী মুসার সঙ্গে হারুনের ছিল। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, আমার পরে আর কেউ নবী হবে না। আল্লাহ ও আমার পরে সে (আলী) তোমাদের ওলী (অভিভাবক) অতঃপর কিয়ামত দিনপর্যন্ত আমার ইমামত আমার বংশধারায় জারি থাকবে। যা এর (আলীর) ঔরস থেকে

হবে। এ ধারাবাহিকতা ঐ দিন পর্যন্ত জারি থাকবে যখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে আখেরাতে উপস্থিত থাকবে, আলী ও আমার সন্তানদের মধ্য থেকে যারা মাসুম (নিষ্পাপ) তাঁরা সকলেই শিকলে আজগর (হালকা ওজনবিশিষ্ট) আর কুরআন হলো শিকলে আকবর (ভারী ওজনবিশিষ্ট)। এ দুটো কখনো আলাদা হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার নিকট পৌঁছাবে। এরা হলো আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁরা হলেন আমিন, বিশ্বস্ত বা সত্যবাদী এবং আল্লাহর জমিনে তাঁরই মনোনীত হাকীম (শাসক)। আমি হলাম আল্লাহর সিরাতে মুস্তাকীম, যাঁর আনুগত্য করার আদেশ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। অতঃপর আমার পরে (সিরাতে মুস্তাকীম) হলো- আলী, তারপর আমার সন্তানগণ, যাঁরা তাঁর ঔরস থেকে হবে। তারাই ইমাম হবে। তারাই সত্যের পথ প্রদর্শক এবং হকের প্রতি ন্যায়পরায়ণ।

হে জনমণ্ডলী! কুরআন মাজীদ তোমাদের বলে দিচ্ছে যে, এর (আলীর) পরে আগত সকল ইমাম তাঁরই বংশধারার মধ্য থেকে হবে। আল্লাহ তায়ালা এ কথা বলেছেন যে, "তিনি (আল্লাহর) তাঁর (আলীর) বংশধরদের মধ্যেই চিরঞ্জীব কালেমাকে স্থায়ী করে দিয়েছেন।"[১০]

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, 'গাদীরে খুমে' প্রদত্ত ভাষণের পর পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি নাজিল হয়-

> **"... আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামতসমূহকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীনে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।"** (সূরা মায়েদা, আয়াত-৩)

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াত ও খাদীরে খুমে রাসূল (দ.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূল-ইমাম তথা আহলে বাইত এ পৃথিবীতে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত/নির্বাচিত/নিয়োগকৃত মানব জাতির বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য প্রকৃত ইমাম বা নেতা, যাঁরা আল্লাহর নির্দেশে জনগণকে পরিচালনা করেন এবং জনগণকে হেদায়েত করেন।

---

[১০] আল্লামা আবু মনসুর আহমেদ ইবনে আলী আত তাবারসী (রহ.) বর্ণিত রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণটির বঙ্গানুবাদের অংশবিশেষ।

যে কুরআন ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আহলে বাইতঃ

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নবী/রাসূলদের দায়িত্ব যা আল্লাহ নির্দেশ করেছেন তা হলো–

> **"তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা তার (জিবরাইলের) সঙ্গে নাড়াবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠের দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি যখন তা পাঠ করি আপনি তার অনুসরণ করুন। এর বিশদ ব্যাখ্যা আমারই।"** (সূরা কিয়ামা, আয়াত-১৬-১৯)

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবুওতের উত্তরাধিকারত্ব কোনো সাধারণ আরবি ভাষার পাণ্ডিত্যর ব্যাপার নয়; বরং এটি আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ এ দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষও নয়। এ প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক যে, রাসূল (দ.)-এর ওফাতের পর আল্লাহর এ বিধান লঙ্ঘন করা হয়। ফলে নবুওতের উত্তরাধিকার তথা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুইটি আলাদা হয়ে যায়। অর্থাৎ পার্থিব রাষ্টীয় তথা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় নেতৃত্বের মধ্যে এক মারাত্মক বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে ইসলাম ধর্মে এক ব্যাপক ফিতনার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে ইসলাম ধর্মীয় সকল ফিরকার সমাধান এই বিষয়ের সঠিক সমাধানের উপর নিহিত রয়েছে যাহোক পরবর্তীতে 'ইমাম' পদবি নিয়ে যথেচ্ছাচার শুরু হয়। তাই আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত ইমামের কনসেপ্ট (Conceft) সমাজ থেকে বলপূর্বক অপসারণ করা হয় এবং এর বদলে মানব সৃষ্টি ইমাম পদবি ব্যবহারের রেওয়াজ চালু করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খেলাফতে রাশেদার সময় রাষ্ট্রীয় প্রধান কেন্দ্রে ও রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রাদেশিক প্রশাসক বা গভর্নরগণ নামাজের ইমামতি করতেন। তাদেরকে ইমাম বলা হতো না। বা তাদের পদবি ও ইমাম ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে উমাইয়া শাসকগণ তাদের কুকর্ম ও অপশাসনের জন্য জনগণকে ভয় পেত এবং জণগণের কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে তারা সালাতে ইমামতির দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করতে থাকে। ফলে শুধুমাত্র অন্যা লোকদের নামাজ আদায়ের দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয় এবং তিনি জনগণের নামাজের ইমাম হয়ে গেলেন। অথচ সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তার কোনো ভূমিকাই ছিল না বর্তমানেও বিরাজমান। আবার কোন ব্যক্তি আরবি ভাষা বা কুরআন/হাদিস

নিয়ে প্রচুর গবেষণা করলেন তাদেরকে আলাদাভাবে ইমাম খেতাব দেওয়া হলো। উল্লেখ্য, এ সব মহান ব্যক্তিবর্গ/ধর্মীয় গবেষকগণ কখনও নিজেদেরকে আল্লাহ কতৃক নিয়োজিত ইমাম হিসেবে দাবি করেননি। অথচ আহলে বাইত-এ রাসূল গাউসুল আযম শেখ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জীলানী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাসিদা শরীফে স্বয়ং উল্লেখ করেছেন-

"করিল প্রভু বাদশা (ইমাম/নেতা/প্রশাসক) মোরে
সকল ওলী কুতুবদের
তরিকা মোর রহিবে জারী
হোক না যত রকম ফের।"

অথচ তাঁর নামের পূর্বে ইমাম পদবি ব্যবহার করা হয় না। অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত বাদশা বা ইমামের ক্ষেত্রে ইমাম পদবি ব্যবহার করা হয় না। অথচ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যাকে 'ঈমাম' মনে করেন তিনিই 'ইমাম' পদবীতে ভূষিত হন। ফলে মুসলিম সমাজ/রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় 'ইমাম-ইমামত' সম্পর্কে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা যে বিশেষ অর্থে ইমাম শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং এর সঙ্গে মানবীয় সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত/নির্বাচিত/নিয়োগকৃত ইমামের গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা মুসলিম জনতা ভুলে গেছে। পবিত্র কুরআন ও রাসূল (দ.)-এর প্রমান্য হাদীসের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি যে, হযরত ইমাম হোসাইন হলেন, নবীর উত্তরাধিকারী, পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যাকারী, সিরাতুল মুস্তাকীম তথা আল্লাহর নিয়োগকৃত ইমাম বা শাসক।

হযরত ইমাম হোসাইনের আমীরুল মুমিনীন হওয়ার প্রেক্ষাপটঃ

হযরত ওসমান (৫৫৬ খ্রি.) শাহাদাতের পর হযরত আলী ইসলামি রাষ্ট্রের আমীরুল মুমিনীন হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনিই একমাত্র খলীফা যিনি প্রকাশ্যে মসজিদে জনগণের ভোটে নির্বাচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তদানীন্তন মুসলিম সমাজে ইমামত ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে এক চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারই ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে জনমনে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে অরাজকতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে জন মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা বহুলাংশে হ্রাস পায়। তাই আমরা দেখতে পাই যে, হযরত আলী যখন হযরত ওসমান কর্তৃক নিয়োজিত দুর্নীতিবাজ উমাইয়া গভর্ণরদেরকে বরখাস্ত করেন। তখন সিরিয়ার গভর্ণর

মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান কেন্দ্রীয় খেলাফতের নির্দেশ অমান্য করে এক পর্যায়ে আলীর বিরুদ্ধে এক প্রতারণামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে 'সিফফীনের' যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই যুদ্ধে (৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) উমাইয়া শাসক কর্তৃক আল্লাহর পবিত্র কুরআন বর্শায় মাথায় নিয়ে এক ভয়াবহ প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়। ইসলামের জঘন্যতম শত্রু আবু সুফিয়ান। তিনিই মুহাম্মদ (দ.)-এর বিরুদ্ধে ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে কাফেরদের নেতৃত্ব দান করেন। ইসলামকে ধ্বংস করার এমন কোন প্রচেষ্টা বাকী ছিল না, যা আবু সুফিয়ান করেননি। ইসলামের অন্য এক জঘন্য শত্রু উৎবা। এই উৎবার কন্যা হিন্দা। ইসলামের দুশমন এই জঘন্য দম্পতির পুত্র মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান। উৎবা বদর যুদ্ধে হযরত হামজার কর্তৃক নিহত হন। ওহুদের যুদ্ধের সময় তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হিন্দা ওয়াসী নামক এক বর্শায় লক্ষ্যভেদী ব্যক্তিকে নিয়োগ করে। সে যুদ্ধের তৎকালীন রীতিনীতি ভঙ্গ করে হযরত হামজাকে শহীদ করে। রাসূল (দ.)-এর শ্রদ্ধেয় চাচার পবিত্র দেহ মোবারক হিন্দা বিকৃত করে তার নাক, কান কেটে মালা তৈরী করে গলায় পরে। এমনকি হিন্দা তাঁর হৃৎপিন্ড বের করে চিবিয়েছিল। আবু সুফিয়ান দম্পতি ৬৩০ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী মক্কা বিজয়ের সময় জীবন রক্ষার খাতিরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই সময়ে এই দম্পতির সুযোগ্য পুত্র হিসেবে মাবিয়া ইসলামে দাখিল হয়। মুসলমান হলেও রাসূল (দ.) হিন্দার মুখ দর্শনে অস্বীকৃতি জানান। তাই রাসূল (দ.) যার মুখ দেখতে চান না তার চেয়ে হতভাগা আর কে থেকে পারে। এই মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তার পিতা-মাতার কুকর্মের পূর্ণ অনুসারী ও উত্তরাধিকারী হিসেবে ইসলামের বৈধ খলীফা রসূলের ওয়াসি ও নবুওতের বৈধ উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, গুপ্ত হত্যা, কূটনীতি, মিথ্যাচার, ঘুষ ও বিচারের প্রহসন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় মুসলমানদের নেতা হয়ে বসে। কি পদ্ধতিতে সে ক্ষমতা কুক্ষিগত করল সেই পদ্ধতির ও কার্যকলাপের বৈধতা বা অবৈধতার বিষয়ে প্রশ্ন না করে বর্তমানেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এক শ্রেণীর লোক বুঝে অথবা না বুঝে তার অনুসারী হয়ে রয়েছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মাবিয়া অন্যায়ভাবে কেন্দ্রীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এক পর্যায়ে মাবিয়া ইবনে সুফিয়ানের সৈন্যগণ বর্শার মাথায় পবিত্র কুরআনের পাতা ছিড়ে বলতে থাকে, "এই কুরআন আমাদের মধ্যে ফায়সালাহ করবে।" এই কুরআনী প্রতারণার

দ্বারা হযরত আলী'র সৈন্য বাহিনী বিভ্রান্তি হয় এবং হযরত আলীর সৈন্য বাহিনী তাঁর বৈধ নির্দেশ কার্যত অমাণ্য করে। ফলে তিনি যুদ্ধ বিরতি করতে তাঁকে বাধ্য হন। অতঃপর হযরত আলী ও মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের পক্ষে দুইজন সালিশকারী নিয়োগ করা হয়। মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের প্রতিনিধি আমর ইবনুল আস এর প্রতারণামূলক বাক্য জালে হযরত আলী'র প্রতিনিধি আবু মুসা আলি আশআরী বিভ্রান্ত হন। ফলে ইসলামি সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান স্বাধীন নৃপতি ন্যায় ব্যবহার করতে লাগলেন। তিনি সমস্ত মসজিদে মসজিদে হযরত আলীর গালিগালাজের নীতি প্রচলন করলেন যা উমাইয়া শাসক যা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজরে সময়কাল পর্যন্ত বহাল ছিল। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে হযরত আলীর শাহাদাতের পর মাবিয়া আমীরুল মুমেনীন উপাধি ধারণ করে তার নিজের ধাঁচে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন।

হযরত ইমাম হাসানের খিলাফতঃ

আল্লাহর নির্দেশ ও হযরত রাসূল (দ.)-এর সুন্নত মোতাবেক হযরত আলী ওসিয়তনামা রেখে যান। 'সিফফীনের' যুদ্ধের পর যেটা লিখা হয়: "এটি আল্লাহর বান্দা আলী ইবনে আবু তালিবের ওসিয়তনামা। আল্লাহর রহমত হাসিলের জন্য তার সম্পত্তি কিভাবে ব্যায়িত হবে এটা তারই নির্দেশ। (অর্থাৎ তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন)। যে রহমত তাঁকে দেবে শান্তি আর বেহেশতের প্রবেশাধিকার। আমার পর আমার পুত্র হাসান হবেন আমার সম্পত্তির মুতওয়াল্লী বা তত্ত্বাধায়ক ও পরিচালক। তিনি আল্লাহর হুকুম আর ইসলামি আইন অনুসারে গরিব, দুঃখী, অভাবগ্রস্তদের সাহায্যে এ সম্পত্তি থেকে ব্যয় করতে পারবেন। যদি হাসান'র কিছু ঘটে আর হোসাইন জীবিত থাকেন তাহলে হাসানের পর তিনিই মুতওয়াল্লী ও তত্ত্বাবধায়ক হবেন। এবং এখানে লিখিত নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবেন।[১১]

উক্ত অসীয়তের মর্মানুযায়ী হযরত আলীর পর হযরত ইমাম হাসান 'আমীরুল মুমেনীন' হিসেবে নিয়োজিত হন। ইরাকীদের হযরত হাসান খলীফা ঘোষণা এবং হিজাজ, ইয়েমেন, পারস্য থেকে কোন প্রতিবাদের অনুপস্থিতি ছিল

[১১] হযরত আলী, আবুল ফজল, পৃ. ১৬১।

মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের জন্য একটি বিরাট ভয়ের কারণ। কারণ মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান হযরত ওসমান এর শাহাদতের পর থেকেই ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। বর্তমানে যেহেতু আলী আর জীবিত নাই তাই শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পথকে একেবারে নিষ্কন্টক দেখতে পেয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে আর দেরী করলেন না। তিনি হযরত হাসানকে আমিরুল মুমিনীন বা খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া তিনি হাসানের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য বহু গুপ্তচর নিয়োগ করেন। এসব গুপ্তচরেরা নানা মিথ্যাচার অপপ্রচার ও হযরত হাসানের অনেক সেনা নায়কদের ঘুষ বা ভয় দেখিয়ে আবার ক্ষেত্র বিশেষে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে তাঁর খেলাফতের অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকায় এক ধরনের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ফলে সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ট্রান্স জর্ডানের সমস্ত সেনাপতিদের ডেকে ব্যাপক যুদ্ধের আয়োজন করে। অল্পদিনের মধ্যে সিরিয়াধিপতি ষাট সহস্রের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মেসোপটোমিয়া থেকে মাসকিমনের মধ্যে সাওয়াদের দিকে টাইগ্রীস নদীর তীর ধরে হযরত হাসানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। হযরত হাসানের সংক্ষিপ্ত খেলাফতকাল ছিল ছয় মাস। খিলাফতের ইতিহাস, ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উত্তরাধিকার প্রভৃতি ইসলামের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হযরত ইমাম হাসান ও মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে এই সময়কার পত্রালাপ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস।

হযরত হাসান তাঁর পত্রে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর আহলে বাইতদেরকে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করার ঘটনাবলি পুনর্ব্যক্ত করে তাঁর পত্রে লিখেছিলেন:

"...আর এখন হে মাবিয়া, তোমার অধিকার চর্চার দৃশ্য দেখাটা কি গভীর মর্ম বিদারক। কি অদ্ভুত! দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমার কোন খ্যাতি নেই। তোমার মধ্যে ইসলামের এমন কোন আসেননি যা কখনো প্রশংসিত হয়েছে, বরং তুমি হচ্ছো গিয়ে হিযবে মিনাল আহযাবো" (মাবিয়া ও তার কুখ্যাত পিতা মদিনা ধ্বংস করার যে প্রয়াস গ্রহণ করেছিল তার ইঙ্গিত)। তোমার পিতা ছিলেন কুরাইশদের মধ্য থেকে রাসূল (দ.)-এর সবচেয়ে বড় শত্রু। সুতরাং বাতিলের পক্ষে সংগ্রাম করা থেকে বিরত হও এবং অন্যান্যদের মতো তুমিও আমার আনুগত্য স্বীকার করে নাও। এটাও তুমিও সুনিশ্চিত জান যে, আল্লাহ্, ফেরেশতাকুল ও বিবেকবানদের দৃষ্টিতে খেলাফতের ব্যাপারে আমি তোমার

চেয়ে যোগ্য। সুতরাং তোমার উচিত আল্লাহকে ভয় করা ও বিদ্রোহ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করো না। তবে তুমি যদি বিদ্রোহ ও পথভ্রষ্টতার নীতি অব্যহত রাখ, তাহলে আমি মুসলমানদের নিয়ে তোমাকে আক্রমণ করব এবং আল্লাহর নির্দেশনা আসা পর্যন্ত তোমার বিনাশে সচেষ্ট থাকব। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনিই একমাত্র যার নির্দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ।"[১২]

এই পত্রের উত্তরে মাবিয়া ইবেন আবু সুফিয়ান বিভিন্ন মিথ্যাচার ও কুটতর্কের জাল বিস্তারমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করে সে তার মতামত ও সিদ্ধান্ত হিসেবে লিখেন যে ..." আমি তোমার চেয়ে অধিক অবিজ্ঞতা সম্পন্ন ও বয়োজ্যেষ্ঠতার কারণে তোমার উচিত আমার নিকট নতি স্বীকার করা। আমার পরে খেলাফত তোমার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। তুমি চাইলে ইরাকের বাইতুল মাল থেকে যত খুশি নিতে পার। তাছাড়া ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য ইরাকের যে কোনো অঞ্চল থেকে তুমি কর আদায় করতে পার। সুতরাং হে আবু মুহাম্মদ! (হাসান)! তোমার নিজের ও তোমার দ্বীনের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করো ...।" পরবর্তীকালে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ইমাম হাসানের নিকট আরেকটি পত্র লিখেছিল থাতে লিখা ছিল। "... যদি তুমি আমার নিকট খেলাফত হস্তান্তর করো এবং আমার হাতে বাইয়াত হও, তবে আমি আমার সকল ওয়াদা পূরণ করবো এবং তোমার সঙ্গে করা সকল চুক্তি মেনে চলব। তাছাড়া আমার পর খেলাফত তোমার নিকটেই থাকবে। কারণ সকলের মধ্যে তুমিই এর যোগ্য"।[১৩] অতঃপর নিম্নোক্ত ধারা ও শর্তগুলোর উপর ভিত্তি করেই ইমাম হাসান বিন আলী ও মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে সন্ধি সম্পন্ন হয়েছিল-

১। হাসান বিন আলী মাবিয়ার নিকট শাসন ক্ষমতা বা সরকার ব্যবস্থা (খিলাফত/ইমামত নয়), যাতে সে আল্লাহর কুরআন, রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী ধার্মিক ও আমানতদার খলিফাদের ন্যায় পরিচালনা করেন।

২। তার (মাবিয়ার পরবর্তীকালে) কাউকে খলিফা মনোনয়ন দেয়ার ক্ষমতা মাবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের থাকবে না। তারপর খেলাফত হাসান বিন

[১২] বালাযুরী, আনসাব আল আশরাফ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০।
[১৩] আবুল ফারাজ, মাকাতিল আল তালিবিন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮।

আলীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাঁর অবর্তমানে হোসাইন বিন আলীর উপর তা বর্তাবে।

৩। সিরিয়া, ইরাক, তোহামা, হেযাজ বা যে কোন অঞ্চলের সাধারণ জনতার জান, মাল, ইজ্জত নিরাপদ থাকবে।

৪। হযরত আলী এবং তার পরিবারের সকল সদস্যেরও অনুসারীদের জান-মাল ইজ্জত সুরক্ষিত থাকবে। আর এ বিষয়ে মাবিয়া বিন আবু সুফিয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ থাকবে এবং আল্লাহর সঙ্গে কৃত এই ওয়াদা প্রতি সম্মান বজায় রাখবে।

৫। হাসান বিন ও রাসূল (সা.)-এর আহলে বাইতদের বিরুদ্ধে মাবিয়া বিন আবু সুফিয়ান গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার আক্রমণ করতে পারবে না। এবং তাঁদের কাউকে পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে আতংকিত করতে পারবে না।

৬। হযরত আলীকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা হবে এবং তাঁকে কোনো প্রকার গালাগালাজ দেয়া যাবে না।

সন্ধির শর্ত প্রতিপালন করা ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশঃ

"সুতরাং তাঁরা তাদের অংঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের লা'নত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহ করেছি কঠোর তাদের শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত থেকে থাকবে, তাঁদের অল্পসংখ্যক ছাড়া।" (সূরা মায়েদা, আয়াত-১৩)।

"যারা আল্লাহর দৃঢ়কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যা জোড়া লাগোনোর নির্দেশ নিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং জমীনে ফাসাদ করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।" (সূরা বাকারা, আয়াত-২৭)

ইতিহাস সাক্ষী মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান হযরত ইমাম হাসানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কোনো ধারাই প্রতিপালন করেননি; বরং ইসলাম ধর্মীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদেশ-নিষেধ বা বিধি-বিধান ও মহান আহলে বাইত ও তাঁদের অনুসারীদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা, সরকারি চাকুরি থেকে অপসারণ, হত্যা, গুম, খুন, বিচারের নামে প্রহসন ও নির্যাতন উমাইয়া শাসকগণ তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত একটি প্রণালিবিদ্ধ নীতি হিসেবে বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অনেকেই এই অধর্মীয়

নীতি অনুসরণ করেন। ইতোমধ্যে মাবিয়ার ইঙ্গিতে হযরত হাসানকে বিষপান করানোর ফলে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। যাহোক, এই চুক্তির আওতায় মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর (৬৮০ খৃ:) পর হযরত ইমাম হোসাইন আমিরুল মুমিনিন পদে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ এই চুক্তির আলোকেই হযরত ইমাম হোসাইন একই সঙ্গে ধর্মীয় দিক থেকে নবীর উত্তরাধিকারী তথা আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত জনগণের ইমাম-নেতা-পরিচালক ও শাসক। আবার রাজনৈতিকভাবে তিনি মুসলমানদের নেতা তথা আমিরুল মুমিনীন পদে অধিষ্ঠিত হন। মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন করার পর দামেসকো ফিরে এসে তার সকল আস্থাভাজন লোকদের সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদের সকলের উপস্থিতিতে মাবিয়া দাড়িয়ে বলতে লাগলো, "হে লোকেরা! আল্লাহর নবী আমাকে বলেছিলেন, অবশ্যই তুমি আমার পরে ক্ষমতা হাতে পাবে। ন্যায়পরায়ণ লোকদের দ্বারা শাসন কাজ চালাবে। আমি তোমাকে মনোনীত করলাম। আবু তোরাব (হযরত আলী)-কে অভিসম্পাত করবে। (কি জঘণ্য মিথ্যাচার) এরপর থেকে মূলত হযরত আলীর প্রতি লা'নত বর্ষণের প্রথার প্রচলন করা হয়।[১৪]

এই বক্তব্যের পর থেকেই মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান জাহেলিয়াতের প্রথা অনুযায়ী হযরত আলীর প্রতি লা'নত দিতে থাকে এবং রাষ্ট্রের সকল মসজিদের মিম্বার থেকে একযোগে জুমাহ্ ও ঈদের নামাজের খুতবায় হযরত আলীর প্রতি অভিসম্পত রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা হয়। বক্তব্য শেষ করে মাবিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল- "হে আল্লাহ আলীর প্রতি লা'নত বর্ষণ করো (নাউজুবিল্লাহ্ মিনজালিক) কারণ সে তোমার দ্বীনকে অস্বীকার করেছে এবং তা থেকে মুখ ফিরেয়ে নিয়েছে এবং তাকে জাহান্নামের সুকঠিন শাস্তি দান কর।"[১৫] (নাউজুবিল্লাহ্ মিনজালিক) এই সভা শেষে মাবিয়া তার সকল গভর্নরদের প্রতি রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর ভাই তার ওয়াসি বা উত্তরাধিকারী মহান আহলে বাইত এ রাসূল যাদের মর্যাদা ও পবিত্রতা ও যাদেরকে ভালোবাসা ফরজ বলে আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন তাঁর প্রতি লা'নত বর্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় (নাউজুবিল্লাহ্ মিনজালিক)। এই ধর্মীয় অপপ্রচার ও মিথ্যাচার এবং নবীবংশের প্রতি লা'নতের ফলেই ইয়াজিদ এতো বিপুল সংখ্যক নবীবংশ বিদ্বেষী সেনাবাহিনী

[১৪] ইবনে আবল হাদিদ, শরহে নাহাজুল বালাঘা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬১।
[১৫] আল নাসাই আল কাফিয়াহ, পৃ. ৭২।

গঠনে সমর্থ হয় এবং যারা হযরত ইমাম হোসাইনের হত্যা ও তাঁর পরিবারকে নির্যাতন ও অবমাননা করার মতো জঘন্য অপরাধ করতে তৎপর হয়। তাছাড়া এই প্রচারনার কতখানি গভীরভাবে মুসলিম সমাজে গ্রোথিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন সিরিয়া দেশের কতিপয় আলেম ও মাশায়েখ আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। খলীফা তাদেরকে বলেন, "তোমরা সর্বদা বনু ও উমাইয়ার হিতৈষী রহিয়াছ। কখনও বনি হাশিমের নিকট আসনি। তোমরা এ কথা মনে কর নাই যে, বনি হাশিম রাসূল (দ.)-এর বংশ তথা আত্মীয়।" সেই আলেম ও মাশায়েখগণ কসম খাইয়া বলিয়াছিলেন, আজ পর্যন্ত আমাদের ছিল না যে বনি হাশিম রাসূল (দ.)-এর আত্মীয়। আমরা জানি যে, বনু উমাইয়াগণ সকল সম্মানের মালিক।[১৬]

তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমদের যখন রাসূল বংশীয় জ্ঞানের মাত্রা এই ধরনের থাকে তবে সাধারণ লোকের এ সম্পর্কিত ধারণা কি ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রেক্ষাপটে হযরত ইমাম হোসাইনকে তাঁর নবুওতের উত্তরাধিকারী ও বৈধ আমিরুল মুমিনীন হিসেবে ভূমিকা রাখতে হয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের নীতি:

মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে রঈসুল মুফাসসিরিনের (কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সঙ্গে বিতর্ক হয়। সেই বিতর্কে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান নিজেকে হযরত আলীর চেয়ে যোগ্য প্রমাণের ঘৃণ্য ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের সূত্র মতে সন্ধির বছরের শেষে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান কাবা যিয়ারত গমন করেছিলেন। সেখানে সে একদল কোরাইশের পার্শ্ব অতিক্রম করছিল। সেখানে উপস্থিত সকলেই তার সম্মানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস দাঁড়াননি।

তখন মাবিয়া তাকে বলল- ওহে ইবনে আব্বাস। সিফফিন যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধেও ফলে সৃষ্ট ক্ষোভ কি তোমার অন্য সাথিদের মতো

[১৬] খিলাফতের ইতিহাস, লেখক আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, পৃ. ১৪৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতে বাধা দিয়েছে? নিশ্চয়ই ওসমান মজলুম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।" উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে দেখিয়ে বললেন- উমর ইবনুল খাত্তাবও মজলুম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তিনি তার 'কিসাসের' ভার পুত্রকে দিয়েছিলেন। আর এই তার পুত্র। (মাবিয়া যে হযরত ওসমান এর শাহাদতের জন্য 'কিসাস' এর দাবি উত্থাপন করেছিল তা প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত সম্মত ছিল না তার প্রতি ইঙ্গিত)।

মাবিয়া- নিশ্চয় তাকে (হযরত ওসমান) কোনো কাফের হত্যা করেছিল?

ইবনে আব্বাস- কে তাকে (হযরত ওসমান) হত্যা করেছে?

মাবিয়া- তাকে মুসলামানরা হত্যা করেছে।

ইবনে আব্বাস- তাহলে তা তোমার দাবি প্রত্যাখ্যান করার জন্য এটাই যথেষ্ট। যদি মুসলামানেরা তাকে অমর্যাদা ও হত্যা করে থাকে এখানে জুলুমের কোনো অবকাশই থাকে না।

মাবিয়া- আমরা সকল স্থানে কিতাবে লিখে দেব। যেখানে আলী ও তার পরিবারের গুণগান থেকে লোকেরা বিরত থাকবে। এরপর তোমার জিহ্বাকে বন্ধ করা হবে। ওহে ইবনে আব্বাস।

ইবনে আব্বাস- তুমি আমাদেরকে কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখতে চাও?

মাবিয়া- না।

ইবনে আব্বাস- তুমি কি এর ব্যাখ্যা থেকে আমাদের দূরে রাখতে চাও?

মাবিয়া- হ্যাঁ।

ইবনে আব্বাস- তাহলে কি আমরা কুরআন পড়তে পারব, অথচ জিজ্ঞাসা করতে পারব না যে এখানে আল্লাহ কী বলেছেন?

মাবিয়া- হ্যাঁ।

ইবনে আব্বাস- আমাদের জন্য কোনটা ওয়াজিব? কুরআন তেলওয়াত করা নাকি কুরআন অনুযায়ী আমল করা?

মাবিয়া- কুরআন অনুযায়ী আমল করা।

ইবনে আব্বাস- তাহলে যা তিনি আমাদের প্রতি নাজিল করেছেন তা যদি আমরা না জানি কিভাবে আমরা সেই অনুযায়ী আমল করব?

মাবিয়া- এ ক্ষেত্রে তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে। যাদের ব্যাখ্যা তোমার ও তোমার পরিবারের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্নতা পোষণ করে।

ইবনে আব্বাস- কুরআনে আমাদের পরিবারের কাছে নাজিল হয়েছিল। আমি কি এ সম্পর্কে আবু সুফিয়ান ও আবু মুহিতের পরিবারের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারি?

মাবিয়া- কুরআন তেলওয়াত তাহলে তোমাদের সম্পর্কে যা নাজিল হয়েছে এবং রাসূল (দ.) যা বলেছেন তা ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। অন্য কোনো কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারো।

ইবনে আব্বাস- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, ওরা চায় মুখের ফুঁৎকারে আমার নূরকে নিভিয়ে দেবে। কিন্তু আমি আমার নূরকে প্রজ্বলিত রাখব। যতই তা কাফেরদের জন্য তা গাত্রদাহের বিষয় হোক না কেন? (সূরা তাওবা, আয়াত-৩২)।

মাবিয়া- ওহে ইবনে আব্বাস, আমার থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখ এবং তোমার জিহ্বাকে আমার থেকে হেফাজত করো। যদিও তুমি এসব বলো তবে গোপনে। কারো সম্মুখে প্রকাশ্যে এসব বলতে চেষ্টা করো না।[১৭]

এই বিতর্কে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাবিয়া তথা উমাইয়া শাসকগণ কুরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সেন্সরশীপ আরোপ করেছিল। ফলে কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যাজনিত ভিন্নতা তথা পরস্পর বিরোধিতা একটি স্থায়ী ধর্মীয় সমস্যার সৃষ্টি করে। যা অদ্যাবধি বিরাজমান। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনের তাফসীর প্রণয়ন ও হাদিসের সংকলন সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত থেকে এত দীর্ঘ সময় লেগে গেছে। আর এ কারণেই কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে বর্তমান সময় পর্যন্ত মতবিরোধিতা বা পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে।

মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের দৃষ্টিতে ইয়াজিদঃ

মাবিয়া ইয়াজিদের সকল প্রকার অবৈধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিল। তাই তার সংশোধনের জন্য পত্রের মাধ্যমে জানাল যে-

[১৭] শরহে নাহজুল বালাঘা, খণ্ড-৩, পৃ.-১৫।

"আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি শরাব আর বাইজী নিয়ে আসরে মত্ত থাকো। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন- তোমরা কি প্রতিটি স্থানে বেহুদা স্তম্ভ নির্মাণ করছ? আর তোমরা সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করছ। যেন তোমরা স্থায়ী হবে।" (সূরা আশ শুয়ারা, আয়াত-১২৮-১২৯)

তুমি পাপকে এমন প্রকাশ্যে আনজাম দাও যে, আমাদের গোপন বিশ্বাস এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জেনে রেখ, ওহে ইয়াজিদ। মাতলামি তোমাকে আল্লাহর দরবারে তাঁর রহমত ও করুণার জন্য শুকরিয়া আদায়ের সুবিধা সম্পর্কে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে রাখছে যা সবচেয়ে বড় অপরাধ ও দূর্ভাগ্য। তুমি প্রাত্যহিক সালাতে অংশগ্রহণ করছ না, যা আমাদের পরিকল্পনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। অথচ তুমি অবলীলায় তোমার অযোগ্যতা, পাপ, অপরাধ এবং গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করে দিচ্ছো।"[১৮]

মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তার পুত্র ইয়াজিদের পাপাচারী জীবন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। সেখানে কিভাবে সে এমন এক ব্যক্তিকে মুসলমানদের উপর শাসন ক্ষমতার জন্য মনোনীত করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে সে ইসলাম ধর্মের নৈতিক মূল আদর্শ বিশ্বাস করত না এবং উমাইয়া বংশীয় সামাজিক মতাদর্শের পরাজয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ও জাহেলিয়াতের যুগ থেকে লালিত তার পূর্বপুরুষদের অনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মুসলিম উম্মাহর উপর ইয়াজিদের শাসন কতৃত্ব করার ক্ষেত্রে মাবিয়া কোন উপায়কেই বাদ রাখেনি। জাহেলিয়াতের যুগের রীতি-নীতিতে সে জনগণকে সাত বছর ধরে অভ্যস্ত করে নিচ্ছিল। বহু উমাইয়াদের পাপাচারী সদস্যদেরকে রাষ্ট্রের সকল স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে, তাদের অর্থের বিনিময়ে তার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের নেতাদের মুখবন্ধ করেছিল। এ জন্যই ইসলাম নেতৃত্বের বিষয়ে এতো গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ নেতৃত্ব এমন একটি বিষয় যার পদস্খলনে পুরো জাতি পথভ্রষ্ট হয়। যদি নেতৃত্ব তার সঠিক স্থানে না থাকে তখন কোন জাতির না থাকে আত্মমর্যাদা আর না থাকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষমতা। ইয়াজিদ যখন ৬৮০ খৃষ্টাব্দে রাষ্টীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন মুসলিম উম্মাহর মূল ইসলাম ধর্মীয় চিন্তা চেতনার পরিবর্তে ব্যাপক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিকৃতি ও বিভ্রান্তি রাষ্ট্র ও সমাজ

[১৮] অলি আক্বদ আল ফারিদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০।

জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে- যথা খলীফা নিয়োগের রীতিতে পরিবর্তন, খলীফাদের জীবন-যাত্রার পরিবর্তন, রায়তুল মালের মালিকানার পরিবর্তন। স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতার বিলুপ্তি। বংশীয় এবং গোত্রীয় ভাবধারার উদ্ভব, যুদ্ধ ও জেহাদের সংজ্ঞা পরিবর্তন, আইনের শাসনের অবসান, সর্বোপরি কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা তো রয়েছে।

বাইয়াত ও এর তাৎপর্যঃ

'বাইয়াত' শব্দের অর্থ হলো বিক্রয় হওয়া, বিনীত হওয়া অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকারকারী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কাজ করার স্বাধীনতা বর্জন করার নাম বাইয়াত। অর্থাৎ এই আনুগত্যে ফলে কেউ কোন প্রশ্ন না করে নিজের জীবন বিসর্জনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। এই প্রথা তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীনদের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল। বাইয়াত বা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি (Oath of Allegiancc)-এর তাৎপর্য হলো শপথকারী স্রষ্টার নামে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করবেন যে, কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বিরোধিতা করবে না। বাইয়াত গ্রহণ করার পর প্রাণের ভয়ে বা বস্তুগত সুবিধার লোভে তা প্রত্যাখ্যান করা ধর্মীয় দিক থেকে প্রায় অসম্ভব ও সমাজিক দিক থেকে খুব অবমাননাকর ছিল। তৎকালীন সামাজিক রীতি অনুযায়ী বাইয়াত ভঙ্গকারীর স্ত্রী তালাক হয়ে যেত এবং দাস-দাসী থাকলে তারা মুক্ত হয়ে যেতো। মোটের উপর তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে এক মহা ক্ষতির মধ্যে আপতিত হতেন। সর্বোপরি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে এ ধরনের বাইয়াত গ্রহণকে ক্ষমতা দখলকারীরা এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুমোদন হিসেবে বিবেচনা করতো। এ কারণেই ক্ষমতাসীনদের কাছে বাইয়াতের ব্যাপারটি অপরিহার্য হিসেবে গণ্য হতো।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ইমাম হোসাইনকে এই কারণেই ক্ষমতা জবর দখলকারী ইয়াজিদ বাইয়াত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। হযরত ইমাম হোসাইন এমন এক পরিস্থিতির শিকার হন যার বিরোধির আয়ত্ত্বাধীন রয়েছে তথাকথিত 'আদর্শ', 'ধর্ম', 'কুরআন', 'সম্পদ', তরবারী'। প্রচার মাধ্যম 'জনতা' এবং নবী (দ.)-এর মিথ্যা উত্তরাধিকার।

হযরত ইমাম হোসাইন রাসূল (দ.)-এর একমাত্র জাহেরী ও বাতেনী ক্ষমতার প্রতিনিধি ও বেহেশতের বর্ণনকারী পিতা, বেহেশতের সম্রাজ্ঞী মাতার পুত্র। নিজে বেহেশতের সর্দার, জীবন্ত কুরআন, ও সাক্ষাৎ লা'ইলাহার ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ এর প্রতিচ্ছবি। তিনি কেমন করে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীর পুত্র, অবৈধভাবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়োজিত রাষ্ট্র প্রধান, ইসলামে প্রকাশ্য দুশমনকে কিভাবে কোন যুক্তিতে ইয়াজিদের মতো দুশ্চরিত্র, পানাসক্ত, ধর্মহীন, ফাসেক ব্যক্তির রাজত্ব মেনে নিতে পারেন?

হযরত ইমাম হোসাইনের নিকট বাইয়াত তলবঃ

হযরত ইমাম হোসাইন মদিনার গর্ভনর ওয়ালীদের আহ্বানে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। মদিনার গভর্নর বললেন, ইয়াজিদ আপনার বাইয়াত তলব করেছেন। হযরত ইমাম বললেন, ইসলামের খলীফা হওয়ার জন্য ইয়াজিদ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী। তাই তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে ইয়াজিদ ইমাম হোসাইনকে গুপ্তভাবে হত্যা করার জন্য ঘাতক নিয়োগ করে মদিনায় প্রেরণ করে। তাই ইমাম হোসাইন মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান। গুপ্ত ঘাতক সেখানেও তাঁকে অনুসরণ করে। মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে কুফাবাসীর নিকট থেকে তিনি ব্যাপকভাবে চিঠি পেতে থাকেন। এসব চিঠিতে সবাই তাঁকে মাবিয়ার সঙ্গে হযরত হাসান চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে বৈধ আমীরুল মুমিনীন হিসেবে বরণ করে নেয়। অনেকে এও লেখেন যে, হে মহান নেতা, আপনি যদি আমাদের কাছে না আসেন, আমাদেরকে বাধ্য হয়ে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত থেকে হবে। কারণ ইয়াজিদের সরকারের মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ তায়ালা যখন জিজ্ঞেস করবেন কেন আমরা ফাসেক ও অনুপযুক্ত ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি, তখন আমরা বলব, হে আমাদের প্রভু, আমরা নবী (দ.)-এর দৌহিত্রের কাছে পত্র দিয়েছিলাম, সংবাদ পাঠিয়েছিলাম জান-মাল কোরবানী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি তশরীফ আনেননি আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করেন নি তাই আমরা বাধ্য হয়ে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত করেছি। তাই এ ব্যাপারে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব আপনার উপরই বর্তাবে।" এ প্রেক্ষিতে হযরত ইমাম হোসাইন প্রকৃত অবস্থা যাচাই এর জন্য এবং হযরত মুসলিমকে তাঁর পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য কুফায় প্রেরণ করেন। কুফায় পৌঁছে

আমন্ত্রণকারীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হামী ইবনে উরওয়ার বাড়িতে তিনি অবস্থান করলেন। তার আগমনে কুফায় সাড়া পড়ে গেল। এবং প্রতিদিন হাজার হাজার লোক ইমামের পক্ষে মুসলিমের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। অল্প দিনের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার লোক বাইয়াত গ্রহণ করে। মুসলিম ইমাম হোসাইনকে পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করেন। এবং বিষয়টি জানতে পেরে ইমাম হোসাইন মক্কা থেকে কুফার পথে রওয়ানা হয়ে যান। ইতোমধ্যে ইয়াজিদ এ খবর জানতে পেরে কুফার তৎকালীন গভর্নর নোমান বিন বশীরকে পদচ্যুত করে আবু সুফিয়ানের অবৈধপুত্র যীয়াদের পুত্র উবাইদুল্লাহকে নিজ দায়িত্ব (বসরার গভর্নর পদসহ) কুফার গর্ভনর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। এই উবাইদুল্লাহ বিন যীয়াদ কুফায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবং এক পর্যায়ে হযরত মুসলিমকে হত্যা করে এবং আহলে বাইতদের অনুসারীদের খতম ও নিরস্ত্র করল।

কারবালার ঘটনাঃ

হযরত ইমাম হোসাইনের পরিবার ও সাথিদেরকে সঙ্গে নিয়ে কুফার দিকে কিছু দূর অগ্রসর হতেই উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের এক সামরিক কর্মকর্তা হোর ইবনে ইয়াজিদ এক হাজার সৈন্যসহ উপস্থিত হয়। তার প্রতি নির্দেশ ছিল যে, সে হযরত ইমাম হোসাইনের কাফেলা অনুসরণ করবে এবং তাকে ঘিরে থাকবে (Escort করে থাকবে) ইমাম হোসাইন এই সেনাবাহিনীর কাছে একাধিকবার তাঁর মর্যাদা, অবস্থান ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। হযরত ইমাম হোসাইন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলে হোর বাধা দেয়। ইতোমধ্যে কুফা থেকে ইবনে যীয়াদের এক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে সে যীয়াদের পত্র হোরকে হস্তান্তর করে। এই পত্রে নির্দেশ ছিল যে, ইমাম হোসাইনকে যেন কোথায়ও আশ্রয় নেবার সুযোগ না দেওয়া হয়। তাঁর জন্য খোলা মেলা প্রান্তর ছাড়া কোথায়ও তাবু ফেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হোর উবাইদুল্লাহর এই নির্দেশনা ইমাম হোসাইনকে অবহিত করে। এবং বলে যে আমি নিরুপায় আমি আপনাকে বৃক্ষলতা ও পানিশূন্য প্রান্তর ছাড়া অন্য কোথায়ও তাবু ফেলবার সুযোগ দিতে অপারগ। অতঃপর হোসাইন আকর নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করার অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, আকর অর্থ কাটা, ব্যর্থতা, নিষ্ফল। অতএব সেখানে শিবির স্থাপন করা সমীচীন নয়। অতঃপর তিনি আরও অগ্রসর হয়ে এক নিদারুণ প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। এই

স্থানের নাম জানতে চাইলে তাকে বলা হলো যে এটির নাম কারবালা। তখন তিনি বললেন, "এটি কারব এবং বালা অর্থাৎ কষ্ট ও বিপদ। এই স্থান ফোরাত নদী থেকে দূরে এবং একটি পাহাড়ের ব্যবধানে ছিল। বর্তমান ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে এই স্থানের দূরত্ব ৪০ মাইল। এই ঘটনা ৬১ হিজরীর ২রা মহররম তারিখে অর্থাৎ ৬৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর সংঘটিত হয়। পরদিন হোরের বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় পানিহীন কারবালা প্রান্তরে সঙ্গী ও পরিবারবর্গসহ হযরত ইমাম হোসাইন তাবু ফেলে রইলেন। ওমর ইবনে সাদ (কারবালার যুদ্ধের কমান্ডার ইন চীফ) আরও চার হাজার সৈন্যসহ উপস্থিত হলো। হযরত ইমাম হোসাইনের সঙ্গে ওমরের আলোচনা চলাকালীন সময়ে উবায়দুল্লাহ এর নির্দেশনামা ওমর বিন সা'দ এর নিকট পৌঁছানো হলো। নির্দেশনামা উল্লেখ করা ছিল-" হোসাইনকে বলো, প্রথমে তিনি তাহার সকল সাথিসহ ইয়াজিদ ইবনে মাবিয়ার প্রতি আনুগত্যের শপথ করুন। আর হোসাইনের সাহাবীদের জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ করে দাও। এক ফোঁটা পানিও যেন তাঁরা পান না করতে পারে। যেমন ওসমানকে পানি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। স্মরণযোগ্য যে বিদ্রোহীগণ কর্তৃক ওসমান'র বাড়ী অবরোধ করা হলো স্বয়ং ইমাম হাসান ও হোসাইন আহত হওয়া সত্ত্বেও ওসমান এর জন্য খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করেছিলেন।

১০ই মুহাররম শুক্রবার। ওমর ইবনে সা'দ প্রভাতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। এদিকে হোসাইন পরিবারের সদস্যদের সান্তনা দিয়ে বলেন, শিশুদের কান্না থামাও। কারণ শত্রুগণ আমাদের দুরবস্থা বুঝতে পারলে আরো উৎসাহিত হবে এবং আমাদের সৈন্যদের সাহস কমে যাবে। অতঃপর তিনি নিজ পক্ষীয় সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন এবং নিজে যুদ্ধসাজ পরিধান করলেন। মাথায় নবীজী (দ.)-এর পাগড়ী বাঁধলেন এবং গায়ে নবী (দ.)-এর ব্যবহৃত জামা পড়লেন, কোমরে পড়লেন ভাই হযরত ইমাম হাসান'র কটিবন্ধ এবং হাতে নিলেন শেরে খোদা আলীর বিশ্ব বিখ্যাত তলোয়ার- 'জুলফিকর' পৃষ্ঠদেশে ঢাল বাম হাতে বর্শা। অতঃপর তার প্রিয় ঘোড়া দুলজানায় সওয়ার হলেন। শরীরে উজ্জ্বল কান্তি, মাথায় সামান্য পাকা লম্বা চুল, মুখে ধুসর বর্ণের দাড়ি এবং চোখের তারায় গভীর মর্মভেদী দৃষ্টি সব মিলিয়ে আমীরুল মুমিনীনকে এমনই সৌম্যদর্শন ও মহীয়ান করে তুলেছিল সর্বোপরি রাসূল (দ.)-এর সঙ্গে তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারকের সাদৃশ্য দেখে বক্ত ও অনুচরগণের প্রাণে এক অপূর্ব উম্মাদনার সৃষ্টি হলো।

ক্ষনিকের তরে তারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চিন্তা-ভাবনা সব ভুলে ঘন ঘন আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে রণক্ষেত্র কাঁপিয়ে তুলল।

শত্রুবাহিনী নিকটবর্তী হলে হযরত ইমাম হোসাইন তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহন করলেন এবং কুরআন শরীফ সম্মুখে রেখে তাহাদিগকে সম্বোধন করে উচ্চ স্বরে 'এতমাউ হুজ্জুত' -অর্থাৎ নিজের দাবি বা নায়েবে রাসূলগণ কর্তৃক তাদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য সঠিক যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করা। এই যুক্তি অগ্রাহ্য করা হলে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর উপর তার বান্দাদের এই দাবি করার অধিকার থাকে না যে, প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তারা বেখবর ছিল। তাই এই যালেমদের জন্য প্রদেয় শাস্তি মাফের পক্ষে আর কোন যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ থাকে না। অর্থাৎ এই বক্তব্য শুনার, জানার ও বুঝবার পর ঐ ব্যক্তিবর্গকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত থেকে হবে যে, তারা আল্লাহর রাসূল বা নায়েবে রসূলের কথা অনুযায়ী কাজ করবে কি না। যে বা যারা তাঁর অনুসরণ করবে সে বা তাঁরা আল্লাহর নিকট প্রকৃত মোমিন হিসেবে বিবেচিত হবে অন্যথায় তারা কাফের হিসেবে গণ্য হয়ে কঠোর শাস্তির উপযোগী হবে। "দ্বীন ইসলামের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি বলতে লাগলেন, "তোমরা তাড়াহুড়া করিও না। প্রথমে আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। আমার উপদেশ শুন। আমার কৈফিয়ত শুনিয়া লও। আমার আগমনের কারণ বলিতে দাও। যদি আমার কৈফিয়ত যুক্তি সঙ্গত হয় এবং তোমরা তা গ্রহণ করতে পার আর আমার প্রতি সুবিচার কর, তবে এটা তোমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হবে এবং তোমরা অনর্থক আমার সাথে শত্রুতা থেকে বিরত থাকবে। তবে আমার বলার কিছু থাকবে না। তোমরা তোমাদের সকল সৈন্যসহ একযোগে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়িও। সর্বাবস্থায় আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহরই উপর, কেননা তিনি সৎকর্মশীলদের সঙ্গে সহায়ক। তোমাদের অন্তরের নিকট একবার গভীরভাবে প্রশ্ন করে দেখ আমি কে? আমাকে হত্যা করা এবং আমার মর্যাদাকে পদদলিত করা তোমাদের পক্ষে জায়েজ কি না?" অতঃপর তিনি তাঁর পিতা-মাতা মহান চাচার মর্যাদাও আল্লাহর কাছে প্রাপ্ত সম্মান, তাঁরা যে কুরআনে বর্ণিত আহলে বাইত ও তিনি ও তাঁর ভাই ইমাম হাসান বেহেশতের যুবকদের সর্দার। এমন ব্যক্তি হত্যা করা উচিত কি না তা উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তার অপরাধ কি? কোন অপরাধে তাঁকে এই সৈন্যরা হত্যা করতে চায়। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আছে কে এমন সহায় যে, আমাদিগকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাহায্য করবে, আছে কি

এরূপ রক্ষক, যে রাসূলাল্লাহর (দ.) পুণ্যবর্তী কুলনারীদেরকে রক্ষা করিবে? হযরত ইমাম হোসাইনের বক্তব্যে ইয়াজিদ পক্ষের সামরিক কর্মকর্তা হোর যিনি হোসেনকে এতদিন পাহারা দিচ্ছিলেন ওমর বিন সা'দকে বলিলেন, আপনি কি সত্যিই হোসাইনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। ওমর বলে যে হ্যাঁ সত্যিই যুদ্ধ ভয়াবহ যুদ্ধ। হোর বলিলেন, তিনি যে, তিনটি শর্ত দিয়েছিলেন উহার একটিও কি গ্রহণযোগ্য হইল না- ১) এজিদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ ২) মদিনায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ ৩) আরব ভূখণ্ড থেকে চলে যাওয়ার সুযোগ। ওমর বলল, "তোমাদের শাসনকর্তা তা মঞ্জুর করলেন না। তাই বর্তমানে আমার কিছু করণীয় নেই। হোরের একজন স্বগোত্র মোহাজের তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তার সিদ্ধান্ত কি? হোর খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, আমি বেহেশত ও দোজখের কোনটি গ্রহণ করব। এই চিন্তাই করছিলাম। খোদার কসম দুইটির মধ্যে বেহেশত বেঁচে নিলাম। আমাকে যদি খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলা হয় তবুও আমার কোনো দুঃখ নাই। হোর ইহা বলেই দ্রুত বেগে অশ্ব চালাইয়া হোসাইনের সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে মিশে গেলেন।

ইমাম হোসাইনের নিকট গিয়ে হোর বলিলেন, হে রাসূল (দ.)-এর সন্তান। আমিই সেই নরাধম যে আপনাকে মদিনায় ফিরে যেতে বাধা দিয়েছি এবং সারা পথ আপনার পাশ্চাতে থেকে এই কারবালায় অবতরণ করিতে বাধ্য করিয়াছি। আল্লাহর শপথ! আমি এ কথা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, আপনার শর্তগুলির কোন একটিও মঞ্জুর হইবে না এবং ব্যাপার এতদূর গড়াইবে। উবাইদুল্লাহ ইবনে যীয়াদ আপনার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবে ইহা আমি পূর্বে জানতে পারলে কখনই আপনাকে এমন বিপদের মুখে টানিয়া আনিতাম না। হে রাসূল (দ.)-এর সন্তান। আমি নিজর কৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ করার জন্য আপনার নিকট এসেছি। আমি আর ইয়াজিদের সৈন্যপক্ষে ফিরে যাব না। আমি আপনার পদতলে কোরবান হইব। ইহাতে কি আমার অপরাধ মাফ হবে। (ঈমানদার ঠিকই জানেন কে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী রাসূল (দ.)-এর আহলে বাইতগণই আল্লাহর নিকট একমাত্র সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত) হযরত ইমাম হোসাইন স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করে দেবেন। তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন ইয়াজিদের পুত্র হোর। হযরত ইমাম হোসাইন বলিলেন, তুমি হোর বটে, হোর অর্থ মুক্ত তোমার মা যেমন নাম রাখিয়াছেন খোদা চান তো তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্ত।" বেহেশতের সর্দার। হোরকে বেহেশতের

সনদ দিলেন। হোর এবার ইয়াজিদ বাহিনীর সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন যে তিনটি শর্ত পেশ করিয়াছেন। উহার যে কোন একটি মানিয়া লও। যেন আল্লাহ তায়ালা এই মহা পরীক্ষার হাত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করেন। অতঃপর তিনি কুফাবাসীদের বিশ্বাস ঘাতকতার বিস্তারিত বিবরণ করিয়া উপস্থিত সকলকে হোসাইনের বিরোধিতা না করার পরামর্শ দিলেন। এর প্রত্যুত্তরে শত্রুপক্ষ হইতে তীর বর্ষণ শুরু হলো।

শুরু হলো কারবালার মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রথমদিকে প্রত্যেক পক্ষ থেকে একজন বা দুইজন করে সৈন্য অবতীর্ণ হয়ে সামনা সামনি যুদ্ধ চলাকালীন সময় হযরত ইমাম হোসাইনের বাহিনীর সম্মুখে বিপক্ষীয় যে এল সে আর ফিরিল না। এই রীতিতে যুদ্ধ করে বিফল হয়ে ওমর বিন সা'দ ব্যাপক আক্রমনের নির্দেশ দিল "ইমাম বাহিনীর বাম বাহু ভীষনভাবে প্রতিরোধ করতে লাগলেন মাত্র ৩২ জন অশ্বারোহী ছিলেন। তাঁরা যেদিকে আক্রমণ করতেন সেদিকে সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতেন। শত্রুগণ দেখিল এভাবে যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব। সুতরাং শত্রুপক্ষের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হলে তাদের সব অশ্বসমূহ অকেজো হয়ে পড়লে তাঁরা পদাতিক বাহিনীতে পরিণত হলেন।

হোর বিন ইয়াজিদ ইমামের পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ইয়াজিদ বাহিনী জয়ের কোনো লক্ষণই দেখতে পেল না। শেষ পর্যন্ত ওমর বিন সা'দ আহলে বাইতদের শিবিরে আগুন দেয়ার নির্দেশ দিল।

সেদিন ছিল শুক্রবার। জুময়ার নামাজ তো দূরের কথা যোহরের সময় হলেও শত্রুগণের আক্রমণ বন্ধ হলো না তারা বন্য পশুর ন্যায় হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আহলে বাইতগণ যুদ্ধরত অবস্থায় অগ্রপশ্চাৎ হয়ে একে একে 'কসর' (সংক্ষিপ্ত) নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর দেখা গেল ইমাম পক্ষে সৈন্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু ইমামের কয়েকজন ভাই ও কয়েকজন বিশিষ্ট খাদেম এবং ইমাম পরিবারের সন্তানগণ অবশিষ্ট আছেন। ইমামের সাহায্যকারীরা যতক্ষণ জীবিত ছিলেন ততক্ষণ ইমাম বংশের কাউকে যুদ্ধ করতে দেননি। এরপর ইমামের পুত্ররা হায়দারী হাঁক দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে এলেন ও শাহাদাত বরণ করলেন। শহীদ হলেন হাসান'র পুত্র কাসিম। ইমামের শিশু পুত্র পিপাসায় কাতর অবস্থায় পত্নী শাহারবানু তাঁকে দিলেন ইমামের কোলে। ইমাম দুশমনদের কাছে শিশুর জন্য এক ফোঁটা পানি চেয়েও পেলেন না; বরং শত্রু পক্ষের তীর তার শুষ্ক কণ্ঠে বিদ্ধ হয়ে তাঁর পানির পিপাসা চিরতরে মিটিয়ে দিল। হযরত আব্বাস তাঁর তিন সহোদর

আব্দুল্লাহ, জাফর ও ওসমানকে যুদ্ধে পাঠালেন তারাও শহীদ হলেন। পিতার ইশারা পাওয়া মাত্র হযরত আব্বাসের ৮/১০ বৎসরের পুত্র মোহাম্মদ শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। বাকী রইলেন ইমাম হোসাইন ও তার ভাই আব্বাস। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত আব্বাস পানি আনার অনুমতি চাইলেন। ইমাম পাক বললেন, "যাও ভাই আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব তোমার সহায়।" এক হাতে বর্শা অন্য হাতে মশক নিয়ে ফোরাতের দিকে রওয়না করলেন। আঁকা (ভাই হলেও তিনি হযরত ইমামকে আঁকা বা প্রভু হিসেবে সম্বোধন করতেন) নির্দেশে তিনি পানি আনতে রওয়ানা হলেন। হযরত আলীর বীর পুত্র যুদ্ধ করে ফোরাত শত্রু মুক্ত করে পানি নিয়ে ফিরাছিলেন। কিন্তু ঘাপটি মারা শত্রু অন্যায় যুদ্ধে পিছন থেকে আক্রমণ করে তাঁর হাত কেটে ফেলে এবং তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্মার এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন হযরত ইমাম হোসাইনের যুদ্ধ সম্পর্কে তার বর্ণনা: আমি বর্শা দ্বারা হযরত ইমাম হোসাইনকে আক্রমণ করিয়াছিলাম এবং একেবারে তাহার কাছে পৌঁছিয়াছিলাম। ভালোবাসা সব দিক দিয়ে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যেদিকে ফিরিতেন সেদিকেই শত্রু সৈন্যদেরকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যাইতেন। দেহে জামা, মাথায় পাগড়ী বাঁধা অবস্থায় তিনি লড়ছিলেন। খোদার নামে বলছি, এরূপ ভগ্ন হৃদয় ব্যক্তি যার পরিবারের সকলেই একের পর এক চোখের সামনে শত্রুর হাতে নিহত হয়োছ; সেই মানুষের মধ্যে এরূপ বীরত্ব, সাহস, দৃঢ়চিত্ততা এবং স্থিরতা আমি জীবনে আর কখনও দেখিনি।

তিনি ডানে বামে যে দিকে ফিরিতেন সেই দিকেই শত্রুদল ব্যাঘ্র তাড়িত ভীরু মেষপালের ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই অবস্থা চলিল। তখন ওমর ইবনে সা'দ আসরের নামাজ কাজা হয়ে যাবে (নামাজের মধ্যে যাদের জন্য দোয়া করা হয় তাদেরকে হত্যা করার জন্য) তাই সহসাই যুদ্ধ শেষ করার নির্দেশ দেয়। এই লক্ষ্যে আক্রমণ জোরদার করার নির্দেশ দিল। তাই সবাই একযোগে ইমাম পাককে আক্রমণ করল। কোন তীর ঘোড়ার পায়ে লাগছিল। কোনটা তাঁর নিজের পবিত্র শরীর মোবারকে লাগছিল। এভাবে যখন তীরের আঘাতে তাঁর পবিত্র শরীর ঝাঁঝরা হয়ে ফিনকি দিয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত বের থেকে লাগলো। তখন ইমাম পাক

বার বার মুখে হাত দিয়ে বললেন, 'বদবখত', তোমরা তোমাদের নবী (দ.)-এর লেহাজ করলে না, তোমরা নবী (সা.)-এর আহলে বাইতকে হত্যা করলে।" মহান ইমাম ঘোড়া থেকে পতিত হলেন। যাকে নবী (সা.) নিজের কাঁধে রাখতেন। ঘোড়া থেকে পতিত হওয়ায় সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী সীমার হাওলা বিন ইয়াজিদ, সেনান বিন আনাস প্রমুখ জালিম এগিয়ে আসল। সীমার হযরত ইমাম হোসাইনের বুকের উপর বসল। তাকে দেখে হোসাইন বললেন, আমার নানাজান (রাসূল দ.) ঠিকই বলেছেন এক হিংস্র কুকুর আমার আহলে বাইতের রক্তের উপর মুখ দিচ্ছে। ইমাম পাক সিজদায় মাথা রাখলেন তাসবীহ সুবহানা রাব্বিল আলা পাঠ করে বললেন, "মওলা, যদি (হোসাইন)-এর কুরবানী তোমার দরবারে গৃহীত হয় তাহলে এর সওয়াব নানাজান (দ.)-এর উম্মতের উপর বকশিশ করে দাও।" (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাহি রাজিউন) ইমাম পাকের মস্তক মোবারক বিচ্ছিন্ন করা হলে তাঁর ঘোড়া জুলজানা স্বীয় কপালকে তাঁর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত করে এবং দৌড়তে থাকে। তখন সীমার বলতে লাগল, ঘোড়াটিকে ধর। যতজন ঘোড়াটিকে ধরতে এগিয়ে এলো সে সবাইকে আক্রমণ করলো। এভাবে সতের জন খোদার দুশমন খতম হয়ে গেল। তারপর ঘোড়া দৌড়ে ইমাম পরিবারের তাঁবুর কাছে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেছেন, নিহত হওয়ার পর হযরত ইমাম পাকের পবিত্র দেহে ৩৩টি বর্শার আঘাত ৩৪টি তরবারির আঘাত দেখা যায়।

ওমর বিন সা'দের প্রতি যিয়াদের নির্দেশ ছিল। ইমামের লাশ মোবারক যেন পদদলিত করা হয়। এবার সেই কাজের পালা। ওমর বলল, "হোসাইনের দেহ অশ্বখুরে দলিত করার জন্য কাহারা তৈয়ার আছ?" অমনি দশ জন সিপাহী প্রস্তুত হলো এবং ইমামের পবিত্র দেহ মোবারকের উপর দিয়া ঐ দশ জন সিপাহী ঘোড়া ছুটাইয়া চলে গেল। কারবালার মহা রণ শেষ হলো।

কারবালার ঘটনা দুঃখদায়ক ও লোমহর্ষক। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের জঘণ্যতম কোন ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এটি এমন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা যার চেয়ে লজ্জাজনক আর কোনো ঘটনা ইলসামে ঘটেনি। আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক সেই সব লোকের প্রত্যেকের উপর যাদের হাত ছিল সেই ঘটনায় অর্থাৎ যারা হুকুম চালিয়েছে এবং যারা এই কাজ সম্পাদনে কোন না কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী বলেছেন, "হোসাইন ছিলেন বাদশাহ। তিনি ছিলেন বাদশাহদের বাদশাহ। তিনি ছিলেন স্বয়ং ইসলাম ধর্ম, তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী। তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন কিন্তু (মিথ্যার কাছে) আত্মসমর্পণ করেননি।

প্রকৃতপক্ষে হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের দ্বীন ইসলামেরই মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল আর আহলে বাইতের মহান ওলী হযরত গাউসুল আযম আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) মহিউদ্দিন নাম ধারণ করে এই দ্বীনকে পুনর্জীবন দান করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে আহলে বাইতের প্রকৃত অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন!

ইয়াজিদ বাহিনীর সৈন্যদের দ্বারা ইমাম হোসাইনের শাহাদতের পর তাঁর পবিত্র দেহ মোবারকের ওপর অত্যাচার, তাঁর জিনিসপত্র লুট ও নবী পরিবারের সম্মানিত মহিলাদের সঙ্গে বেয়াদবি

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, যিনি সর্ব দয়ালু, সর্ব করুণাময়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বন্য পশুদের গর্জন এবং বান্দাহর গোপনে করা গুনাহ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। যিনি গভীর সমুদ্রে মাছদের এদিক ওদিক পরিচালনা করেন। তিনি শক্তিশালী বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে পানির ঢেউ সৃষ্টি করেন। রহমত ও সালাম বিশ্ব জগতের সর্দার, আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর যাঁকে দেওয়া হয়েছে আশ্চর্যজনক মোজেযা এবং তর্কাতীত প্রমাণের নিদর্শনসমূহ এবং আল্লাহর রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল (সা.)-এর পবিত্র বংশধরগণের (আহলুল বাইত) ওপর। যাঁরা নির্যাতিত, যাঁরা অন্ধকারের বাতি এবং বিপদে মুসলিম উম্মাহর আশ্রয়স্থল এবং রহমত ও সালাম বিশেষ করে নির্যাতিত শহীদ ইমামের ওপর যাঁকে সফরের পথে হত্যা করা হয়েছে এবং দুঃখের সাগরে বন্দি করা হয়েছে সেই হোসাইন যিনি হেদায়েতের বাতি ও নাজাতের কিস্তি।

হযরত ইমাম হোসাইন ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত না করার কারণ হিসেবে স্বয়ং বলেছেন– আম্মা বাদ, হে জনতা, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রাপ্য অধিকারের স্বীকৃতি দাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আর আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহলুল বাইত এবং আমরা এ বিষয়ে (খিলাফতের) তাদের চেয়ে (ইয়াজিদের খেলাফতের দাবি) বেশি অধিকার রাখি যারা এর দাবি করে। তারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও অত্যাচারের বীজ বপন (আহলুল বাইত ও তার অনুসারীও অবৈধ রাষ্টীয় ক্ষমতার অধিকারীদের মধ্যে) করেছে। . . . হে জনতা, রাসূল (দ.) বলেছেন যে, যখন তোমরা দেখবে কোনো অত্যাচারী শাসক, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করেছে এবং তাঁর (আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা- মানব সৃষ্টির আদিতে আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছে যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত

আছে (আলাসতু বি রাব্বিকুম) সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং নবীর সুন্নাহর বিরোধিতা করছে এবং আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে অন্যায় ও জবরদস্তিমূলক আচরণ করছে এবং তখন যদি কোন ব্যক্তি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে তার (অবৈধ শাসকের) বিরোধিতা না করে তাহলে আল্লাহর ওপর তা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, ওই ব্যক্তিকে (যে বাধা না দেয়) ওই অত্যাচারীর মর্যাদা দেয়া। জেনে রাখ, এ শাসক (ইয়াজিদ ও বনী উমাইয়া শাসক) শয়তানের আদেশ মেনে চলছে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করছে এবং দুর্নীতিকে প্রতিদিনকার নিয়ম বানিয়েছে। তারা অধিকারসমূহকে এক জায়গায় জমা করছে এবং মুসলমানদের সম্পদের ভাণ্ডারকে (বায়তুল মাল) তাদের নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে এবং আল্লাহর হারামকে অনুমতি দিয়েছে এবং তার হালালকে নিষেধ করে দিয়েছে। সব মানুষের চেয়ে আমি সবচেয়ে যোগ্য (আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ইমাম হিসাবে) তাদের বিরোধিতা করাতে। তোমরা চিঠি দিয়েছ আমাকে এবং অঙ্গীকার করেছো যে, আমাকে শত্রুর কাছে তুলে দেবে না এবং আমাকে পরিত্যাগ করবে না। যদি তোমরা তোমাদের আনুগত্যের শপথে এখনও দৃঢ় থাকো তাহলে তোমরা সত্য পথে আছো। আমি হোসাইন আলী ও রাসূল্লাল্লাহ (দ.)-এর কন্যা ফাতিমার সন্তান। আমার জীবন তোমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আমার পরিবার, তোমাদের (পরিবারে) (গাদিরে খুমে রাসূল (দ.)-এর প্রদত্ত ভাষণের প্রতি ইঙ্গিত)। তোমাদের উচিত আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তোমরা যদি তা না কর এবং বিশ্বাস ভঙ্গ করে থাকো এবং তোমাদের ঘাড় থেকে আনুগত্যের শপথ তুলে নিয়ে থাকো তাহলে আমি আমার জীবনের শপথ করে বলছি যে, তা তোমাদের কাছ থেকে নতুন কিছু নয়। তোমরা তাই করেছ, আমার পিতা আলী, ভাই ইমাম হাসান, এবং চাচাত ভাই (মুসলিম বিন আকীল) এর সাথে। যে তোমাদের ধোঁকার শিকার হয় সে অসহায় হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের হাত থেকে তোমাদের অংশ চলে যেতে দিয়েছো এবং তোমাদের সৌভাগ্য উল্টে ফেলেছো। যে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে সে নিজেই ধোঁকার মুখোমুখি হবে এবং খুব শীঘ্রই আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী (তাঁর শাহাদাতের প্রতি ইঙ্গিত) করে দেবেন। . . . তোমরা দেখেছ কি অসততা এসেছে, পৃথিবীর রং বদলেছে এবং অপরিচিত হয়ে গেছে। এর ধার্মিকতা বিদায় নিয়েছে এবং তা ওই পর্যন্ত চলেছে যে ভালোর শেষটুকু যা আছে, তা পানি পান করার পাত্রের মত। তোমরা কি দেখছো না

যে, সত্য অনুসরণ করা হচ্ছে না এবং ভুলকে অনুৎসাহিত করা হচ্ছে না। ন্যায়পরায়ণ বিশ্বাসী হলো সে, যে ন্যায়পরায়ণতা আশা করে। আমি নিজে মৃত্যুকে একটি সমৃদ্ধি ভাবি, আর অত্যাচারীদের সঙ্গে বেঁচে থাকাকে ঘৃণা ছাড়া কিছু ভাবি না।"[১৯]

হযরত ইমাম হোসাইনের ধর্মীয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ যে সঠিক ছিল এবং তার কর্মকাণ্ড যে ন্যায় ও ধর্মের আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল তাঁর শাহাদাতের পর ইয়াজিদ বাহিনীর তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক, তাঁর সম্পদ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আচরণের মাধ্যমেই প্রমাণ হয় যে তারা প্রকৃত ধর্ম অর্থাৎ রাসূল (দ.)-এর আহলে বাইতের 'মুয়াদ্দাত' (কুরআনে বর্ণিত নবী পরিবারের প্রতি চিরস্থায়ী ভালোবাসা) ত্যাগ করে গিয়েছিলো তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করব। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

> **". . . বল আমি এর (ধর্ম প্রচারের বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আমার নিকটতম আত্মীয়ের মোয়াদ্দত) চিরস্থায়ী মহব্বত ছাড়া অন্য প্রতিদান চাই না।"** (সূরা শু'আরা, আয়াত-২৩)

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আহলে বাইতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। আর তারা কি করেছে তার কিছুটা আলোকপাত করব।

হযরত ইমাম হোসাইন শাহাদতের পর তাঁর পবিত্র দেহ মোবারকের ওপর জুলুমঃ

ইমাম জাফর সাদিক বলেন, যখন ইমাম হোসাইনের ওপর একটি আঘাত করা হলো, তিনি তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন এবং তারা দৌড়ে এল তাঁর মাথা কেটে ফেলতে। একটি কণ্ঠ আকাশ থেকে শোনা গেল। হে, যে জাতি তাদের নবীর ইন্তেকালের পর উদ্ধত হয়ে গেছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে আল্লাহ যেন তাদের রোযা ও ঈদুল ফিতরের অনুগ্রহ দান না করেন। তখন ইমাম বললেন, অতএব আল্লাহর শপথ তারা সমৃদ্ধি লাভ করেনি এবং তারা বৃদ্ধি পেতে থাকবে যতক্ষণ না প্রতিশোধ গ্রহণকারী (ইমাম মাহদী) উঠে দাঁড়াবেন ইমাম হোসাইনের জন্য। ইমাম জাফর সাদিক বলেন যে, ইমাম হোসাইনের দেহে তেত্রিশটি বর্শার আঘাত ও চৌত্রিশটি তরবারির আঘাত ছিল।

---

[১৯] তাবারী শরীফ।

ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, উমর বিন সা'আদ (কারবালার যুদ্ধে ইয়াজিদ বাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ) তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের মাঝে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলো– "কে চায় স্বেচ্ছায় হোসাইনের পিঠ ও বুকের ওপর ঘোড়া চালাতে? দশজন লোক তা করার জন্য এগিয়ে এলো। তাদের মধ্যে ছিল ইসহাক বিন হেইওয়াহ হশযরামে, আখলাম বিন মুরশিদ, হাকীম বিন তুফাইল, সুমরোসি, উমর বিন সাবীহ সাইদাউই, রাজা বিন মানকায আবাদি, সালীম বিন খাইমামাহ জুফী, ওয়াহেয বিন নায়েম, সালেহ বিন ওয়াহাব জুফী, হানি বিন সাবীত হাযরাম এবং উসাইদ বিন মালিক (আল্লাহর অভিশাপ তাদের সবার ওপর)। তারা ইমাম হোসাইনের পবিত্র দেহ মোবারক ঘোড়ার খুরে পিষ্ট করতে থাকে যতক্ষণ না তার বুক ও পিঠ পিষে যায়। বর্ণনাকারী বলেন যে, এ দশজন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের (কুফার গভর্নর যার নির্দেশে কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয়) কাছে আসে এবং উমাইদ বিন মালিক তাদের মধ্য থেকে বলে যে, আমরা শক্তিশালী ঘোড়ার খুর দিয়ে তার পৃষ্ঠ ও বক্ষদেশ পিষে দিয়েছি।" উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ বলল, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা হোসাইনের পিঠ ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষ্ট করেছি যতক্ষণ না তার বুকের হাড়গুলো গুঁড়ো হয়ে গেছে।" উবায়দুল্লাহ তাদেরকে কিছু উপহার দিল।

ইমাম হোসাইনের সম্পদ লুটঃ

হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদতের পর তার গায়ের জামা লুটে নেয় ইসহাক বিন হেইওয়াহ হাশযরাম, সেটা পরার পর সে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয় ও তার চুল পড়ে যায়। তাঁর পাজামা লুট করে বাহর বিন কাব তামিমি এবং বর্ণিত আছে যে, সে শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিলো এবং তার পাগুলো অবশ হয়ে গিয়েছিলো। ইমাম'র পাগড়ী কেড়ে নেয় আখনাস বিন মুরসিদ হাযরামি, যে তা নিজ মাথায় পরেছিলো এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর স্যান্ডেলগুলো কেড়ে নেয় আসাদ বিন খালিদ এবং তাঁর আংটি নেয় বাজদুল বিন সালীম কালাব যে তার আঙ্গুল কেটে তা নিয়ে যায়। (আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর)। ইমামের গোসলের পর পরার জন্য পশমের তৈরি লম্বা জামা ছিল তা লুট করে নিয়ে যায় কায়েস বিন আল আশআস। তাঁর বর্ম নিয়ে যায় উমর বিন সা'আদ। আর তাঁর তরবারি নিয়ে যায় জামী বিন খালক আউদী। ইমাম

পাকের তরবারিটি জুলফিকার ছিল না, ছিলো অন্য একটি যা ছিল নবুয়ত ও ইমামতের একটি আমানত এবং তাঁর বিশেষ (দাপ্তরিক) আংটিটি নিয়ে যায়, যে তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা হেফাজত ছিলো।

ইব্নে শহর আশোব তার মানাকেব-এ এবং মুহাম্মদ বিন আবি তালেব বলেন যে, ইমাম হোসাইনের ঘোড়া ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর ঘেরাও থেকে পালিয়ে এলো এবং তার কপালের চুল রক্তে ভেজালো। ঘোড়াটি দ্রুত নারীদের তাঁবুর দিকে ছুটে গেলো এবং চিৎকার করতে লাগলো। তারপর সে তাঁবুর পিছনে গেলো এবং তার মাথাকে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করলো। যখন পবিত্র নারীরা দেখলেন ঘোড়াটিতে আরোহী নেই তাঁরা বিলাপ শুরু করলেন এবং সাইয়েদা উম্মে কুলসুম তাঁর মাথাতে আঘাত করতে লাগলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বললেন, মুহাম্মদ (দ.), হে নানা, হে নবী, হে আবুল কাসিম, ও আলী, ও জাফর, ও হামযা, ও হাসান, এই হলো হোসাইন। যে মরুভূমিতে পড়ে গেছে, এবং তার মাথা ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার পাগড়ী ও পোশাক লুট করে নিয়ে গেছে।" এ কথা বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

পবিত্র নারীদের উট, অলংকার ও বোরখা লুট ও তাঁবুতে অগ্নি সংযোগঃ

শাইখ মুফীজ বলেন যে, ইয়াজিদ বাহিনীর সৈন্য, ওমর বিন সা'দ এর নেতৃত্বে ইমাম হোসাইনের পরিবারের জিনিসপত্র, উট এবং নারী সদস্যদের বোরখাগুলো পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। হামীদ বিন মুসলিম বলে যে, আল্লাহর শপথ, আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, তারা (ইয়াজিদ বাহিনী) মহিলাদের ও কন্যাদের কাঁধ থেকে বোরখা গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়েছে। পবিত্র মহিলাদের অলংকারগুলো এই দুরাচাররা লুটে নেয় যদিও বলা হয়েছিলো যে যারা তাদের জিনিসপত্র লুট করেছে তাদের উচিত সেগুলো তাঁদেরকে ফেরত দেয়া। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলে যে, আল্লাহর শপথ কেউ কিছু ফেরত দেয়নি।

বর্ণিত আছে যে, নারীদের তাঁবু থেকে টেনে বের করে তাঁবুগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। নবী পরিবারের পবিত্র মহিলাদের মাথার চাদর ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল তাঁরা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন খালি পায়ে এবং বন্দি অবস্থায় সারি বেঁধে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাঁরা

বলেছিলেন আল্লাহর শপথ, আমাদেরকে হোসাইনের শাহাদাতের স্থানটি দেখিয়ে দাও। যখন তাঁদের দৃষ্টি শহীদদের ওপর পড়ল তাঁরা বিলাপ করতে শুরু করলেন এবং তাঁদের চেহারায় আঘাত করতে লাগলেন। বলা হয়েছে, আল্লাহর শপথ, আমি আলীর কন্যা জয়নাবকে ভুলতে পারি না যিনি হোসাইনের জন্য কাঁদছিলেন এবং শোকাহত কণ্ঠে বলেছিলেন, হে মোহাম্মদ (দ.) আকাশের ফেরেশতাদের সালাম আপনার ওপর। এ হলো হোসাইন, যে পড়ে গেছে (নিহত হয়েছে) যাঁর শরীর রক্তে ভিজে গেছে এবং তাঁর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে এবং আপনার কন্যারা বন্দি হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করি এবং মুহাম্মদ মুস্তাফা (দ.)-এর কাছে এবং আলী ও ফাতেমা যাহরা এবং শহীদের নেতা হামযার কাছে, হে মুহাম্মদ (দ.), এ হলো হোসাইন, যে মরুভূমিতে গড়িয়ে পড়েছে এবং বাতাস তাঁর ওপর শ্বাস কষ্ট পাচ্ছে এবং সে নিহত হয়েছে অবৈধ সন্তানদের হাতে। (উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ) আহ শোক, হায় মুসিবত, আমার নানা রাসূল (দ.) পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, হে মুহাম্মদ (দ.)-এর সাথিরা, আসুন ও দেখুন মুস্তফা (দ.)-এর বংশকে কিভাবে কয়েদীদের মতো বন্দি করা হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, এই সব বাণী পাঠ করা হচ্ছিল। হে মুহাম্মদ (দ.), আপনার কন্যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আপনার বংশকে হত্যা করা হয়েছে। বাতাস তাঁদের ওপর ধুলো ফেলছে। এ হলো হোসাইন, যাঁর মাথা ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং তাঁদের পোশাক ও চাদর লুট করা হয়েছে। আমার বাবা কোরবান হোক তাঁর জন্য, যাঁর দলকে সোমবার দিন হামলা করা হয়েছে। আমার পিতা তাঁর জন্য কোরবান হোক যার তাঁবুর দড়ি ছিড়ে ফেলা হয়েছে। আমার পিতা তাঁর জন্য কোরবান হোক যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এখন আর সম্ভব নয় এবং তাঁর আঘাতগুলো সুস্থ হবার নয়। আমার পিতার জীবন তাঁর জন্য কোরবান হোক যাঁর জন্য আমার জীবন কোরবান। আমার পিতা কোরবান হোক তাঁর জন্য যিনি দুঃখের ভিতর ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় নিহত হয়েছেন। আমার পিতা তাঁর জন্য কোরবান হোক যার দাড়ি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়েছে। আমার পিতা তাঁর জন্য কোরবান হোক যার নানা মুহাম্মদ আলা মুস্তফা (দ.) আমার পিতা তাঁর জন্য কোরবান হোক, যাঁর নানা আকাশগুলোর রাসূল। আমার পিতা কোরবান হোক খাদিজাতুল কুবরার জন্য। আমার পিতা কোরবান হোক ফাতিমা যাহরা'র ওপর যিনি

নারীদের সর্দার। আমার পিতা তাঁর জন্য কোরবান হোক যাঁর জন্য সূর্য ফিরে এসেছিলো যেন তিনি নামাজ পড়তে পারেন। (রাদ্দে শামস-এর দিকে ইঙ্গিত)

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ, এ কথাগুলো শুনে প্রত্যেকেই, হোক সে বন্ধু অথবা শত্রু কেঁদেছিল। এরপর সাকিনা তাঁর পিতার দেহ জড়িয়ে ধরেন এবং বেদুইনরা চারিদিকে জমা হয় এবং তাঁকে হোসাইনের পবিত্র শরীর মোবারক থেকে সরিয়ে নেয়।

কা'ফ আমর 'মিসবাহতে' আছে যে, সাকিনা বলেছেন যে, যখন হোসাইন শহীদ হয়ে যান। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম এবং আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, হে আমার অনুসারীরা আমাকে স্মরণ করো যখন পানি পান করো এবং আমার জন্য কাঁদো যখন ভ্রমণকারী অথবা শহীদের কথা শুন।" তা শুনে আমি ভয়ে উঠে পড়ি এবং কান্নার কারণে আমার চোখ ব্যথা করছিল। এরপর আমি আমার মুখে আঘাত করতে থাকি।

সাইয়েদ ইবনে তাউস তার 'ইকবাল' গ্রন্থে বলেন, জেনে রেখো যে, আশুরার সন্ধ্যায় ইমাম হোসাইনের পরিবারের কন্যা ও শিশু সন্তানেরা শত্রুদের হাতে বন্দি হন। তাঁরা শোক, দুঃখ ও কান্নার মাঝেও ঘেরাও হয়ে পড়লেন। তাঁরা সারা দিন যে অবস্থায় পার করেছেন সে ব্যথা ও অসম্মান বর্ণনা করা পৃথিবীর কোনো কলমের শক্তির বাইরে। তাঁরা রাত কাটালেন পরিত্যক্ত অবস্থায় এবং কোনো সাহায্যকারী ও তাদের পুরুষদের অনুপস্থিতির মাঝে। অন্যদিকে শত্রুরা তাদেরকে চরম ঘৃণা করছিল এবং তাদেরকে ঘৃণ্য মনে করে ফেলে রেখেছিলো। এর মাধ্যমে তাঁরা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) উমর বিন সা'আদ এর নৈকট্য চেয়েছিল, যে মুহাম্মদ (দ.)-এর সন্তানদের এতিম করেছিলো এবং যে তাঁদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। আর নৈকট্য চেয়েছিলো উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের যে ছিল নাস্তিক এবং ইয়াজিদ বিন মাবিয়ার নৈকট্য, যে ছিলো বিদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী কথায় ও ঔদ্ধত্যের চূড়ায়।

ইমাম জাফর সাদিক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার পিতা ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী বাকের আমাকে বলেছেন যে, আমি আমার পিতা আলী বিন হোসাইন (জয়নুল আবেদীন)-কে বহন করার জন্য ইয়াজিদ যে বাহন পাঠিয়েছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি একটি দুর্বল ও উলঙ্গ উটের পিঠে (হাওদার আসন ছাড়া) চড়েছিলাম, আর ইমাম হোসাইনের মাথা একটি বাঁশের মাথায় উঠিয়ে রাখা হয়েছিল। আর আমার

পিছনে নারীদের বসানো হয়েছিলো জিন ছাড়া খচ্চরের ওপর। একই সময়ে রক্ষীরা আমাদের মাথার পিছনে এবং চারিদিকে ঘেরাও করেছিল বর্শা লম্বা করে যদি আমাদের কারো চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি পড়েছে তাদের মাথায় আঘাত করা হয়েছে বর্শা দিয়ে। যতক্ষণ না আমরা দামেস্কে প্রবেশ করলাম। একজন ঘোষক ঘোষণা করল, সে সিরিয়াবাসীরা, এরা হলো অভিশপ্ত পরিবারের বন্দিরা (নাউজুবিল্লাহ)।

ইমাম আলী জয়নুল আবেদীন বলেছেন যে, আমাদের ওপর যা আপতিত হয়েছিলো কারবালার সমতলে তা যখন ঘটলো আমার পিতা ও তাঁর সন্তানদের মাঝে তাঁর সঙ্গীরা, ভাইয়েরা এবং অন্যান্য শহীদ হয়ে গেলেন এবং তাঁর নারী স্বজনদের এবং পরিবারকে উটগুলোয় উঠানো হলো। যেগুলোতে বসার জন্য কোন আসন ছিলো না এবং কুফার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, আমার দৃষ্টি পড়লো শহীদদের ওপর যাঁরা মাটিতে পড়েছিলেন এবং তাঁদের কেউ দাফন করেনি। আমার হৃদয় চাপে সংকুচিত হয়ে গেলো। তা আমার ওপরে এতো মারাত্মক ছিল যে, আমি শোকে প্রায় মৃত্যুর কাছে চলে গিয়েছিলাম। আমার ফুফু জয়নাব। যিনি ছিলেন আলীর কন্যা, আমার অবস্থা অনুভব করতে পারলেন এবং বললেন, হে আমার নানা, বাবা ও ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি। কেন তুমি তোমার জীবনকে বিপন্ন করছো? আমি জবাব দিলাম কেন আমি আমার জীবনকে বিপন্ন করবো না? যখন আমি দেখছি আমার মাওলা, আমার ভাইয়েরা, চাচারা, চাচাত ভাইয়েরা এবং আমার পরিবার রক্ত আর ধুলায় মেখে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে আবরণহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায়, মরুভূমিতে তাঁদের কাফনও পরানো হয়নি। দাফনও করা হয়নি। কেউ তাদের পাশে নেই, না কোন, মানুষ তাদের চারপাশে ঘুরছে। যেন তাঁরা তুর্কী অথবা দায়লামি বংশ।" তিনি বললেন, তুমি যা দেখছো তার কারণে স্থিরতা হারিও না, আল্লাহর শপথ, তোমার বাবা ও তোমার দাদা, রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর কাছ থেকে উপদেশ লাভ করেছেন যেন এ মারাত্মক দুর্যোগের তাপ সহ্য করেন। আর আল্লাহ এ উম্মতের একদলের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছেন, যাদেরকে এ পৃথিবীর ফেরাউনের মতো ব্যক্তিরা চেনে না। কিন্তু তাঁরা আকাশের বাসিন্দাদের কাছে সুপরিচিত। যে তারা এ দেহগুলোর টুকরোগুলোকে জড়ো করবে এবং দাফন করবে। আর তারা তোমার বাবার কবরের মাথার দিকে একটি নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করবে কারবালার ভূমিতে। যা চিরদিন থাকবে এবং কখনোই মুছে ফেলা হবে না। আর যদি কুফরের

নেতারা এবং পথভ্রষ্টদের সমর্থকরা তা মুছে ফেলতে চায়। এর নিদর্শন না কমে বরং প্রচুর সংখ্যায় বাড়তেই থাকবে এর বিষয়টি দিনের পরদিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে।"

নবী পরিবারের সম্মানিত সদস্যদের কুফার উদ্দেশ্যে কারবালা ত্যাগঃ

উমর সা'দ কারবালায় অবস্থান করলো মুহররম মাসের দশ তারিখের যোহর পর্যন্ত। সে তার সঙ্গী ও সাথিদের মৃতদেহ জড়ো করলো এবং তাঁদের ওপর জানাজার নামাজ পড়লো এবং সেগুলো দাফন করলো। কিন্তু একই সময়ে সে ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথিদের লাশগুলো মরুভূমিতে ফেলে রাখলো। অতঃপর ওমর, হামীদ বিন বকর আহমরিকে আদেশ দিলো লোকজনের মাঝে কুফার উদ্দেশে রওয়ানা করার জন্য ঘোষণা দিতে। সে তার সঙ্গে নিল ইমাম হোসাইনের পরিবারকে এবং তাঁর পরিবারের নারীদের বোরখাহীন অবস্থায় হাওদার আসন ছাড়া উটের ওপরে বসাল। আর সে নবুয়তের আমানতকে এভাবে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিলো যেভাবে তুর্কী ও রোমীয় বন্দিদের নেয়া হতো এবং একই সময়ে তাঁদেরকে সবচেয়ে কঠিন শোক ও দুঃখে জর্জরিত করে। উমর বিন সা'দ কিছু সর্দার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দিল ইমাম জয়নুল আবেদীন এবং আলীর কন্যাদিগকে এবং অন্যান্য নারীদের পাহারা দেওয়ার জন্য। এইসব কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল একুশজন। অসুস্থ ইমাম ছিলেন ২২ বছরের এবং ইমাম বাকের তখন ছিলেন চার বছরের। তাঁরা দুজনেই কারবালাতে উপস্থিত ছিলেন এবং আল্লাহ তাঁদের দু'জনকেই রক্ষা করেন।

হযরত ইমাম হোসাইন ও হযরত আব্বাস বিন আলী এঁদের দাফন ও কবরঃ

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, যখন ওমর বিন সা'দ চলে গেলো। বনি আসাদ গোত্রের একটি দল এল। যারা গাযিরিয়াতে বসবাস করতো। তারা ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথিদের লাশের জানাজার নামাজ পড়লো এবং তাকে সেখানে দাফন করলো যেখানে তাঁর কবর বর্তমান অবস্থিত। বনি আসাদ গোত্রের নেতা কবরে প্রথম মোমবাতি জ্বালায় ও তাঁর কবরের মাথার দিকে একটি গাছ রোপন করে। তারা আলী আকবরকে দাফন করলো ইমাম হোসাইনের পায়ের কাছে, আর তাঁর পরিবার ও সাথিদের মধ্যে যারা শহীদ

হয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর চারপাশে মাটিতে পড়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে একটি কবরে তাঁর পায়ের পাশে দাফন করা হলো। তারা আব্বাস বিন আলীকে গাযিরিয়ার দিকে যে রাস্তা গেছে তার ওপরে দাফন করলো। যেখানে তিনি শহীদ হয়েছিলেন এবং বর্তমানে সেখানেই তাঁর কবর অবস্থিত। আল হুর বিন ইয়াজিদকে তাঁর আত্মীয়রা দাফন করেছিলো তাঁর শাহাদতের জায়গাটিতে।

হযরত যুহাইর বিন কাইন শহীদ হয়েছিলেন ইমাম ও তাঁর সাথিদের সাথে। তাঁর কবরও সেখানে আলাদাভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

ইমামগণের লাশ মোবারক দাফন করা সম্পর্কে জানা যায় যে, কোনো ইমাম ব্যতীত অন্য কেউ কোনো ইমামের লাশ মোবারক দাফন করার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত নয়। ইমাম মুহাম্মদ আল জাওয়াদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলাল্লাহ (দ.) ইন্তেকাল করলেন তখন জিবরাঈল (আ.) অন্য ফেরেশতাসহ এবং রুহুল কুদ্দুস, (যারা কদরের রাতে অবতরণ করে ছিলেন) অবতরণ করলেন, আলীর চোখের ওপর থেকে পর্দা উঠিয়ে ফেলা হয়েছিলো, তিনি দেখলেন, আকাশগুলো খুলে গেছে। তাঁরা তাঁকে গোসল দিতে সাহায্য করলেন এবং রাসূল (দ.)-এর জানাযার নামাজ পড়লেন এবং তাঁর কবর প্রস্তুত করলেন। আল্লাহর শপথ তাঁরা ছাড়া আর কেউ তাঁর কবর খুড়েনি এবং তাঁরা তাকে সাহায্য করেছিলেন দাফন করা পর্যন্ত। যখন তাঁরা তাকে দাফন করছিলেন এ সময় রাসূল্লাল্লাহ (দ.) তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ইমাম আলী তাঁদের কথাবার্তা শুনছিলেন যে, রাসূল্লাল্লাহ (দ.) ফেরেশতাদেরকে তাঁর বিষয়ে আদেশ করছিলেন। ইমাম আলী কাঁদছিলেন এবং ফেরেশতারা জবাব দিলো, আমরা তার বিষয়ে কৃপণের মতো আচরণ করবো না। নিশ্চয়ই তিনি আপনার পরে আমাদের ওপর কর্তৃপক্ষ এবং কেউ এরপরে আমাদের দেখবে না। ইমাম আলীর শাহাদতের পর ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন একই জিনিস প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর দাফনের সময়। তাঁরা দেখলেন রাসূলাল্লাহ (দ.) নিজে ফেরেশতাদের সাহায্য করছেন। আবার যখন ইমাম হাসানকে শহীদ করা হলো একই পরিস্থিতি ছিল এবং দেখা গিয়েছিলো যে, রাসূলাল্লাহ (দ.) এবং ইমাম আলী ফেরেশতাদের সাহায্য করছেন তাঁর দাফন প্রক্রিয়ায়। এরপর যখন ইমাম হোসাইনকে শহীদ করা হলো তখন ইমাম আলী বিন হোসাইন একই জিনিস প্রত্যক্ষ করলেন। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আল রিজা (আ.) তাঁর যুক্তিতর্ক পেশ করার সময় আলী বিন হামজা (তাঁর ইমামত অস্বীকারকারী) তাঁর কথার প্রতিবাদ করলো, এ বলে যে, আমরা আপনার

পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে হাদীস পেয়েছি যে, একজন ইমামের জানাযা ও দাফন করবেন আরেকজন ইমাম অন্য কেউ নয়। এর মাধ্যমে সে বুঝাতে চাচ্ছিল যে, যখন ইমাম মুসা কাযিম (আ.) শহীদ হলেন, তখন তিনি মদিনায় ছিলেন। আর তাঁর পিতার লাশ ছিল খলীফা হারুনের সর্দারদের কাছে যারা তাঁকে বাগদাদে দাফন করেছিলো। যদি তিনি সত্যিকারভাবেই ইমাম হতেন তাহলে তিনি দাফনের সময় উপস্থিত থাকতেন। যেহেতু তিনি অনুপস্থিত ছিলেন তাই এটি প্রমাণ করে যে, তিনি ইমাম ছিলেন না। (নাউজুবিল্লাহ্) ইমাম আল রিজা জবাব দিলেন, আমাকে বলো, যেন আমি জানতে পারি কে ইমাম হোসাইনকে দাফন করেছে? সে কি ইমাম ছিল নাকি অন্য কেউ? তিনি বললেন, দাফনকারীদের প্রধান ইমাম আলী বিন হোসাইন (জয়নুল আবেদীন) ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন আলী বিন হোসাইন তখন কোথায় ছিলেন? তিনি কি কুফায় উবায়দুল্লাহর অধীনে বন্দি ছিলেন না? তিনি বললেন, "তিনি তাদের অজান্তে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর পিতার দাফন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন" এবং তারপর ফিরে এসেছিলেন। তারপর ইমাম রিজা বললেন, যিনি আলী বিন হোসাইনকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন কারবালায় যেতে এবং তার পিতার দাফন প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে, তিনিই একই ক্ষমতা ইমামকে (তাঁর নিজেকে) বাগদাদে আসার জন্য (মদিনা থেকে) এবং তাঁর পিতার জানাযা সম্পাদন করতে, যদিও সে বন্দি ছিল না এবং না ছিলো কারাগারে।"

ইমাম জাফর সাদিক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন সকালে উম্মে সালমা কাঁদতে শুরু করলেন এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিলেন, "গতরাতে আমার সন্তান হোসাইনকে শহীদ করা হয়েছে। আমি রাসূল (দ.)-কে তাঁর ইন্তেকালের পর স্বপ্নে কখনো দেখিনি, গতরাত ছাড়া। আমি তাঁকে দেখলাম শোকাহত ও বিপর্যস্ত অবস্থায়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন তাঁকে এমন নিদারুণ শোকাহত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখছি। তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি সকাল থেকে হোসাইন ও শহীদের কবর খুঁড়েছেন।"

হযরত ইব্নে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "আমি দুপুরবেলা স্বপ্নে রাসূলাল্লাহ (দ.)-কে দেখলাম তিনি ছিলেন বিপর্যস্ত অবস্থায় ও ধুলোয় মাখা এবং তার হাতে একটি রক্ত ভর্তি বোতল। তিনি বললেন, "এ হলো আমার

হোসাইনের রক্ত, ওই দিনটির তারিখ লিখে রাখলেন এবং পরে তা ইমাম হোসাইনের শাহাদতের তারিখের সঙ্গে মিলে গেল।"

"মানক্বির" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ইব্নে আব্বাস স্বপ্নে রাসূলাল্লাহ (দ.)-কে দেখলেন, ইমাম হোসাইনের শাহাদতের পর তাঁর চেহারা ধুলোয় মাখা, খালি পা নিদারুণ শোকাহত চোখ এবং তাঁর জামার লম্বা অংশটি গুটিয়ে কোমরে বাঁধা। তিনি কোরআনের এ আয়াতটি তেলওয়াত করছিলেন: ভেবো না, জালেমরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন (অনবহিত), তিনি তাদেরকে শুধু ওই দিন পর্যন্ত সময় দেন যে দিন চোখগুলো পলকহীন খোলা থাকার আতঙ্কে।" (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৪২)

এরপর তিনি বললেন, আমি কারবালায় গিয়েছিলাম এবং আমার হোসাইনের রক্ত মাটি থেকে জমা করছিলাম যা এখন আমার জামার নিচের অংশে লেগে আছে। আমি এখন আমার রবের কাছে যাবো এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করবো ন্যায় বিচারের জন্য।

যখন সকাল হলো ইব্নে আব্বাস লোকজনের কাছে ইমাম হোসাইনের শাহাদতের কথা জানিয়ে দিলেন এবং তাঁর স্বপ্ন বর্ণনা করলেন। পরে তা প্রতিষ্ঠিত হলো যে, সে দিনটি ছিল যেদিন ইমাম হোসাইন শহীদ হয়েছিলেন।

কুফার জনসাধারণের কাছে মহান আহলে বাইতদের দেয়া বক্তব্য ও তাদের আহাযারি এবং ক্রন্দন

উমর ইবনে সা'দ আহলে বাইতের বন্দিদের নিয়ে কারবালা থেকে কুফা শহরের নিকটবর্তী হলে সেখানকার নাগরিকরা মজার দৃশ্য দেখার জন্য জমায়েত হলো। এই বন্দিদের মধ্যে/ছিলেন সাইয়েদা জয়নাব বিনতে আলী, ইমাম জয়নাল আবেদীন, হাসান আল মুসান্না, যিনি তার চাচা ও ইমাম সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং তরবারি ও বর্শার আঘাত সহ্য করেছিলেন এবং মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন। ইমাম হাসানের আরো দুই সন্তান যাইফ এবং আমর তাদের সঙ্গে ছিলেন। এই মহান আহলে বাইতের সদস্যের মধ্যে কয়েক জন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রসাদে প্রবেশের পূর্বে কুফার জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন, এই ভাষণগুলোর মাধ্যমে আমরা কারবালার ইতিহাসের অনেক বিরল ও দুর্লভ তত্ত্ব ও তথ্য জানতে পারি। তাছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আহলে বাইতের প্রকৃত মর্যাদা খেলাফতের না জানা ও সাধারণভাবে না বলা ইতিহাসও হযরত রাসূল (দ.) থেকে কারবালার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট কারণ ও ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে জানা যায়। তাই ঐতিহাসিক মহামূল্যবান দলিল হিসেবে তা সম্পাদনার মাধ্যমে পত্রস্থ করা হলো।

বর্ণনাকারী বলেন একজন কুফী মহিলা তার ঝুল বারান্দা থেকে উঁকি দিলো এবং জিজ্ঞেস করলো তোমরা কোন জায়গার বন্দী? তাঁরা উত্তর দিলেন 'আমরা মুহাম্মদ (দ.)-এর পরিবারের বন্দি সদস্য' এ কথা শুনে ঐ মহিলা নিচে নেমে এলো এবং চাদর, ঘাঘরা, মাথা ঢাকার ওড়না সংগ্রহ করতে লাগলো এবং তাদের কাছে হস্তান্তর করলো এবং তারা তা পরলেন। কুফার লোকেরা তাদের এ ধরনের বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখে কাঁদতে লাগলো এবং বিলাপ করতে লাগলো। তখন ইমাম আলী বিন হোসাইন বললেন, তোমরা আমাদের জন্য কাঁদছো ও বিলাপ করছো তাহলে আমাদের হত্যা করলো কারা অর্থাৎ তোমাদের লোকেরাই তো আমাদের প্রকৃত হত্যাকারী।

আহলে বাইতের এই দুরাবস্থায় দেখে হযরত যয়নব তাঁর পিতা ইমাম আলীর একটি হাদীস তার স্মরণে এলো, বর্ণিত আছে যে, যখন ইবনে মুলজিম হযরত আলীকে আহত করে দিলে তখন তিনি (ইমাম আলী) তাঁর কন্যাকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। "হে প্রিয় কন্যা, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তুমি ও তোমার পরিবারের নারীরা বন্দি অবস্থায় আছো এই শহরে (কুফায়) ও ভয়াবহ অবস্থায়। আর আমি ভয় পাচ্ছি না জানি লোকেরা তোমাদের আঘাত করে, সহ্য করো। সহ্য করো, তার শপথ যিনি বাজ ভেঙে দু ভাগ করেন এবং মানুষ সৃষ্টি করেন ঐদিন এ পৃথিবীর উপর আল্লাহর আর কোনো বন্ধু থাকবে না শুধু তোমরা সবাই এবং তোমাদের অনুরাগীরা ছাড়া।" স্মরণ রাখতে হবে এটি ছিল হযরত আলী বেলায়েতী ক্ষমতা যার মাধ্যমে তিনি গায়েবের খবর বলেছেন।

সাইয়্যেদা যয়নাব বিনতে আলী লোকদের ইশারা করলেন চুপ থাকার জন্য। এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং রাসূল (দ.)-এর সালাম পেশ করলেন এবং বললেন, আম্মা বা'দ। হে কুফাবাসী, হে অহঙ্কারী ব্যক্তিরা হে প্রতারক ব্যক্তিরা, হে পিছনে পলায়নকারীরা, শুনে রাখো তোমাদের কান্না যেন কখনো না থামে এবং তোমাদের বিলাপ যেন কখনো শেষ না হয়। নিশ্চয়ই তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই নারীর মতো যে নিজেই তার সুতার প্যাঁচ খুলে ফেলে তা প্যাঁচানোর পর। তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো প্রতারণার মাধ্যমে এবং তোমাদের লোক দেখানো আত্মগরিমা, সীমা অতিক্রম এবং অসততা ছাড়া কিছু বাকি নেই। তোমরা দাসীদের প্রতি প্রেমবাক্য এবং শত্রুদের মিষ্টি কথা তোমাদের ঐতিহ্য হিসেবে নিয়েছো। তোমাদের উদাহরণ হলো বিস্তীর্ণ বনের মতো অথবা কবরস্থানে মূল্যবান গহনার মত। জেনে রাখো, কি খারাপই না তোমরা নিজেদের জন্য এনেছো। যা আল্লাহর ক্রোধ ডেকে এনেছে তোমাদের উপর এবং তোমরা আখেরাতে ক্রুদ্ধ আগুনের ভেতরে জায়গা অর্জন করেছো। তোমরা আমার ভাইয়ের জন্য কাঁদছো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আল্লাহর শপথ, তোমাদের কাঁদা উচিত, তোমরা এর যোগ্য। প্রচুর কাঁদো, কম হাসো, এভাবেই তোমরা অপমানে আক্রান্ত হয়েছো এবং ঘৃণার ভেতরে বন্দি হয়েছো যা তোমরা কখনও ধুয়ে ফেলতে পারবে না। কীভাবে তোমরা শেষ নবী (দ.)-এর সন্তান এবং তোমাদের মাঝে 'রিসালাতের খনি' (ইমাম হোসাইন) রক্ত নিজেদের হাত থেকে ধুয়ে ফেলবে। যিনি ছিলেন, বেহেশতের যুবকদের সর্দার। যুদ্ধ ক্ষেত্রের সেনাপতি এবং

তোমাদের দলের আশ্রয়। তিনি ছিলেন তোমাদের বিশ্রামের এবং কল্যাণের বাসস্থান। তিনি ক্ষত নিরাময় করতেন এবং তোমাদের রক্ষা করতেন, যে সব খারাপ তোমাদের দিকে আসতো তোমরা তার কাছে যেতে যখন তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করতে। তিনি ছিলেন তোমাদের শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা, তোমরা তার উপর নির্ভর করতে এবং তিনি ছিলেন তোমাদের পথ চলার বাতি। জেনে রেখো, কি খারাপই না তোমরা নিজেদের জন্য এনেছো এবং কি বোঝাই না তোমরা তোমাদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছো কিয়ামতের জন্য আত্মার ধ্বংস, আত্মার ধ্বংস, আত্মার ধ্বংস। তোমাদের সন্ধান ব্যর্থ হোক এবং তোমাদের হাত অবশ হয়ে যাক কারণ তোমরা তোমাদের রিয্ক এর বিষয়টি প্রবাহমান বাতাসের কাছে হস্তান্তর করেছো। তোমরা আল্লাহর ক্রোধের ভেতরে জায়গা করে নিয়েছো এবং ঘৃণা ও দুর্ভাগ্যের মোহর তোমাদের কপালে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ভোগ হোক তোমাদের, তোমরা কি জানো তোমরা মুহাম্মদ (দ.)-এর প্রিয় সন্তানের মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন করেছো এবং কী অঙ্গীকার তোমরা তার সঙ্গে ভঙ্গ করেছো? এবং তার কত প্রিয় পরিবারকে তোমরা রাস্তায় বের করে এনেছো? এবং তাদের মর্যাদার কোন আবরণ (বোরখা) তোমরা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছো? এবং কোন রক্ত তোমরা তার কাছ থেকে ঝরিয়েছো? কি কুটিল জিনিসই না তোমরা জন্ম দিয়েছো যে, আকাশগুলো যেন ভেঙ্গে পড়বে এবং জমিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর পাহাড়গুলো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে পৃথিবী ও আকাশের মাঝের জায়গা পূর্ণ করে।

তোমাদের বিষয়গুলোর উদাহরণ বধূ হলো চুলবিহীন অপরিচিত। নোংরা অন্ধ, কুৎসিত এবং গম্ভীর। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছো কেন আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হয়েছে? আখেরাতের শাস্তি আরো অপমানকর এবং তখন কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তোমাদের অবসর যে তোমাদেরকে হালকা মনের না করে দেয়। কারণ সর্বশক্তিমান ও পবিত্র আল্লাহ সম্পর্কে কেউ পূর্ব ধারণা করতে পারে না এবং প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়ে তিনি ভুলে যান না, না কখনোই না। তোমাদের রব তোমাদের জন্য ওত পেতে আছেন।"

কি উত্তর দিবে যখন নবী জিজ্ঞেস করবেন। তোমরা ছিলে শেষ উম্মত। কেমন আচরণ করেছো তোমরা আমার বংশ ও আমার সন্তানদের সঙ্গে যারা ছিল সম্মানিত। যাদের কিছুকে বন্দি করেছিলে এবং তাদের কিছুকে তাদের রক্তে ভিজিয়েছো? এটি তো সেই প্রতিদান নয় যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে

উপদেশ দিয়েছিলাম যার মাধ্যমে তোমরা আমার কুরবা (রক্তজ)-এর প্রতি আচরণ করেছে (বল, আমি ইহার বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ (মোয়াদ্দত) ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না। (সূরা শুরা, আয়াত-২৩)।

আমি আশঙ্কা করি, যে গযব ইরাম (তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের যার সমতুল্য কোনো নির্মিত হয়নি (যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলে) এর লোকজনের। (সূরা ফজর, আয়াত-৭-৮) উপর পড়েছিলো সে রকম একটি গযব তোমোদের উপর অবতরণ করবে।"

ইমাম আলী বিন হোসাইন এ পর্যায়ে বলেন, হে প্রিয় ফুফু, দয়া করে চুপ থাকুন, যা ঘটে গেছে তা ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ আপনি কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিচক্ষন ব্যক্তি ও জ্ঞানী। যাকে আর বুঝানোর প্রয়োজন নেই। নিশ্চয়ই কান্না ও আহাজারি তাদেরকে ফেরত আসতে পারবে না যারা চলে গেছে।

কুফার জনগণের অঙ্গীকার ভঙ্গ ও প্রতারণার ব্যাপারে ইমাম আলী বিন হোসাইনের বক্তব্যঃ

ইমাম আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবিহ করলেন এবং রাসূল (দ.)-এর সালাম পেশ করলেন তারপরে বলেন, হে জনতা, তোমাদের মধ্যে যারা আমাকে চিনো, তারা তো আমাকে চিনোই, আর যারা আমাকে চিনো না, আমি আলী, হোসাইনের সন্তান, যার মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ফোরাতের তীরে কোন অপরাধ বা দোষ ছাড়াই। আমি তার সন্তান যার পবিত্রতা লংঘন করা হয়েছে এবং যার রহমত পূর্ণ জীবনকে কেড়ে নেয়া হয়েছে তার সম্পদ লুট করা হয়েছে এবং তাঁর নারীদের বন্দি করা হয়েছে। আমি তার সন্তান যাকে হত্যা করেছে একজন সংঘবদ্ধ মানুষ। এ শাহাদতের সম্মান আমাদের জন্য যথেষ্ট।

হে জনতা, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নামে বলছি, তোমরা কি জানো না যে, তোমরা আমার পিতাকে একটি চিঠি লিখেছিলে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমরা তাকে ধোঁকা দিয়েছো অঙ্গীকারের মাধ্যমে এবং তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং তার কাছে অনুগত্যের শপথ করে। এর পরিবর্তে তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো এবং তাকে পরিত্যাগ করেছো। তোমরা

যেন তার মাধ্যমে ধ্বংস হওয়ার জন্য তোমরা দিয়েছ এবং তোমাদের আদর্শ যেন কদর্য হয়ে যায়, তোমরা কিভাবে রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর সামনে দাড়াবে যখন তিনি বলবেন, তোমরা আমার সন্তানকে হত্যা করেছো এবং আমার পবিত্রতার মর্যাদা লংঘন করেছ, তোমরা আমার উম্মতের অর্ন্তভুক্ত নও।

তাঁর বক্তব্যের এ পর্যায়ে পুরুষদের মাঝে কান্নার রোল উঠলো এবং তারা পরস্পরকে বলতে লাগলো। তোমরা ধ্বংস হয়ে গেছো এবং তোমরা তা জানো না।

এরপর তিনি বললেন, "তাঁর উপর আল্লাহর রহমত হোক যে আমার উপদেশ গ্রহণ করে এবং আমার পরামর্শকে হেফাজত করে আল্লাহ এবং তার রাসূল (দ.) এবং তাঁর বংশের পথে যে আমরা রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক রেখে আরো উত্তম হেদায়েতের অধিকারী।

উপস্থিত জনতা থেকে বলা হলো, আমরা আজ আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে। এরপর আমরা তার উপর প্রতিশোধ নিবো যে আপনাদের উপরে জুলুম করেছে অথবা আমাদের উপর।

এ কথা শুনে ইমাম বললেন, "হায় আশ্চর্য! হায় আশ্চর্য! হে প্রতারণাপূর্ণ ধোঁকাবাজের দল, একটি বিরাট বাধা আছে তোমাদের এবং তোমাদের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার মাঝে। তোমরা কি আমার সঙ্গে একই আচরণ করতে চাও যেভাবে তোমরা আমার পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে আচরণ করেছো? না কখনোই না। হাজীদের আনন্দিত উটদের রবের শপথ, আমার পিতার ও আমার পরিবারের শাহাদতের গভীর ক্ষতসমূহ এখনো আরোগ্য লাভ করে নি, যে আঘাতগুলো রাসূলাল্লাহ (দ.) আমার পিতা ও তার সন্তানদের বুকে করা হয়েছে তা এখনো স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। আমার ঘাড়ের হাড়গুলো ভেঙ্গে গেছে দুঃখে এবং এর তিক্ততা আমার কষ্ট ও শ্বাসনালীর মাঝখানে উপস্থিত আছে। আমার হৃদয়ের হাড়গুলো আমার শ্বাসরুদ্ধ করে দিচ্ছে। আমি চাই যে তোমরা যেন আমাদের অনিষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। এরপর তিনি বলেন, এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে হোসাইনকে হত্যা করা হয়েছে, তার পিতার মতই, যিনি ছিলেন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হে কুফাবাসী, উল্লাসিত হয়ো না আমাদের দুর্দশায়। যা একটি বিরাট দুর্যোগে। যিনি শহীদ হয়ে পড়ে আছেন ফোরাতের তীরে আমার জীবন তার জন্য কুরবান হোক, আর তার হত্যার শাস্তি হবে জাহান্নাম।

ফাতেমা সুগরার বক্তব, যা তিনি কুফাবাসীদের নিকট উপস্থাপন করেছিলেনঃ

আল্লাহর প্রশংসা করছি সব বালুকনার সংখ্যায় এবং পৃথিবী পর্যন্ত আকাশগুলো ওজনের সমান। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁকে বিশ্বাস করি এবং শুধু তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমরা বলি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন খোদা নেই। তিনি অদ্বিতীয় ও তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ (দ.) তার বান্দা ও রাসূল। কোনো দোষ ছাড়াই তার সন্তানদের মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ফোরাত নদীর তীরে। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই যদি আমি আপনার বিষয়ে কোনো মিথ্যা বলি অথবা কোনো ভুল ধারণা পোষণ করি। আলী বিন আবি তালিবের খিলাফতের বিষয়ে, যার অধিকার অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছিলো (গাদীরে খুমের ঘোষণা 'মান কুনতু মাওলা ...) এবং তাকেও কোন অপরাধ ছাড়াই হত্যা করা হয়েছে আল্লাহর ঘরগুলোর একটিতে (উল্লেখ্য তাঁর জন্ম কাবা শরীফে ও মৃত্যু কুফার একটি মসজিদে) যেভাবে তার সন্তানদের হত্যা করা হয়েছে গতকাল। যেখানে ছিল একদল লোক যারা নিজেদের মুসলমান দাবি করেছিলো। তাদের মাথা যেন তাদের ঘাড়ের উপর না থাকে। তিনি পিপাসার্ত ছিলেন যতক্ষণ না তার সত্তাকে আপনার কাছে তুলে নেয়া হয়েছিলো। তার ছিলো প্রশংসনীয় চরিত্র। ধার্মিক বংশধর এবং সুবিখ্যাত গুণাবলি এবং প্রশংসনীয় ধর্ম এবং তিনি আপনার পথে কোন তিরস্কার ও ধমককে ভয় করতেন না। হে আল্লাহ আপনি তাঁকে আপনার ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন শৈশব থেকেই এবং আপনি তাঁর বালেগ বয়সের গুণাবলিকে প্রশংসা করেছেন। তিনি সার্বক্ষণিকভাবে আপনার রাসূলের প্রতি আন্তরিক ছিলেন এবং আপনার দরুদ তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে ঐ সময় পর্যন্ত যখন আপনি তাঁকে আপনার নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তিনি বিরত ছিলেন এ পৃথিবীর বিষয়ে এবং তিনি সম্পদ লোভী ছিলেন না এবং তিনি ছিলেন আখেরাতের বিষয়ে আশাবাদী। এরপর তিনি আপনার পথে সংগ্রাম করেছেন এবং আপনি তাঁকে ভালোবেসেছেন এবং তাঁকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাঁকে সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ দেখিয়েছেন।

আম্মা বাদ, হে কুফাবাসীরা, হে ধোঁকাবাজ, প্রতারক এবং অহঙ্কারী ব্যক্তিরা আমরা এক পরিবার যাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করেছেন তোমাদের বিষয়ে এবং তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেছেন আমাদের বিষয়ে। তিনি এ পরীক্ষাগুলোকে আমাদের জন্য ঐশী প্রশান্তি লাভের কারণ করেছেন এবং এ

বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন আমরা তাঁর জ্ঞানের হেফাজতকারী অভিভাবক এবং তাঁর বুদ্ধির ভাণ্ডার। আমরা তাঁর প্রজ্ঞাকে স্বীকৃতি দিই এবং তাঁর পৃথিবীতে তাঁর দাসদের উপর আমরা তার প্রমাণ (নিদর্শন)। তিনি আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন তার দয়ার মাধ্যমে এবং আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টিকুলের উপর মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর নবীর মাধ্যমে। তোমরা আমাদেরকে মিথ্যা বলেছো এবং কুফরী করেছ আমাদের উপর (অত্যাচারের মাধ্যমে)। তোমরা মনে করেছো আমাদের হত্যা করা বৈধ এবং আমাদের জিনিসপত্র লুট করেছো যেন আমরা তুরস্ক ও কাবুলের কাফের। এই গতকাল ছিল যখন তোমরা আমাদের দাদাকে হত্যা করেছ এবং তোমাদের তরবারিগুলো আমাদের আহলে বাইত (নবী পরিবার) এর রক্ত ছিটিয়েছ।

তোমরা তোমাদের চোখকে শীতল করেছো প্রাচীন শত্রুতার কারণে (হাশেমী ও উমাইয়াদের বিরোধিতার প্রতি ইঙ্গিত) এবং উল্লাস করেছো আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ে এবং যে ধোঁকার জন্ম দিয়েছ। এ কারণে আমাদের রক্ত ঝরানোতে ও আমাদের জিনিসপত্র লুট করে উল্লাসিত হয়ো না কারণ এ মহাদুর্যোগের এবং বিরাট জবাই (কুরবানীর) মাধ্যমে আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তা কুরআনের আয়াতের সঙ্গে একমত (সংগতিপূর্ণ)।

"প্রতিযোগিতা করো দ্রুত এ পাবার জন্য তোমাদের রবের ক্ষমা এবং এক জন্নাতের দিকে। যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির মত, প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে, এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে তাঁর ইচ্ছা এবং আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের প্রভু। কোনো দুর্যোগ ঘটে না পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের ভেতরে যা একটি কিতাবে নেই। আমরা ঘটতে দেই, তা আল্লাহর জন্য সহজ"। (সূরা হাদীদ, আয়াত-২২)

"তোমরা যেন বহিষ্কৃত হও। অপেক্ষা করো সে অভিশাপের জন্য যা শীঘ্রই তোমাদের উপর অবতরণ করবে। আকাশগুলোর প্রতিশোধ তোমাদের উপর অবতরণ করবে। একের পর এক এবং ক্ষয়ে যেতে থাকবে। অথবা তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে পরিণত করবেন এবং তোমাদের মধ্যে কিছুকে অন্যের যুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ করাবেন।" (সূরা আনআম, আয়াত-৩৫)

এরপর আমাদের উপর তোমরা যে জুলুম করেছ (সেজন্য) তোমরা কিয়ামতের দিনে থাকবে চিরস্থায়ী ভয়ানক আযাবের ভিতর। জেনে রাখো, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ তোমাদের দুর্ভোগ হোক, তোমরা কি

জানো এবং তোমরা কি বুঝ? তোমরা কেমন হাত দিয়ে আমাদের দিকে বর্শা তাক করেছিলে? কেমন সত্তা নিয়ে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে এসেছিলে? কেমন পা নিয়ে আমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছিলো? তোমাদের অন্তরগুলো শক্ত হয়ে গেছে। তোমাদের কলিজা লোহায় পরিণত হয়েছে এবং তোমাদের হৃদয় অন্ধ হয়ে গেছে এবং তোমাদের কান ও চোখের ওপর মোহর মেরে দেয়া হয়েছে (বাকারা)। শয়তান তোমাদরে উস্কানি দিয়েছে এবং তোমাদের আদেশ দিয়েছে এবং তোমাদের চোখগুলো অন্ধ করে দিয়েছে। আর তোমারা কখনোই হেদায়েত খুঁজে পাবে না। তোমরা যেন ধ্বংস হয়ে যাও হে কুফাবাসীরা। রাসূল (দ.)-এর কত রক্তের দায় তোমাদের উপর? এবং কি পরিমাণ প্রতিশোধ তোমাদের ঘাড়ের উপর? এরপর তোমরা তার ভাই আলী বিন আবি তালিবের সঙ্গে প্রতারনা করেছো এবং তার সন্তানদের সাথেও যারা নবীর বংশ এবং তারা ছিল পবিত্র ও ধার্মিকদের অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের মাঝে একজন দম্ভ করে বসেছিলো আমরাই তারা যারা আলী এবং তার সন্তানদেরকে হত্যা করেছি ভারতীয় তরবারি ও বর্শা দিয়ে এবং আমরা তাদের নারীদের বন্দি করেছি তুরস্কের বন্দিদের মতো এবং আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এবং তা একটি যুদ্ধই ছিলো। তার সুখের মধ্যে কাদা যে তা বলেছে। তোমরা গর্ব করেছো তাদের হত্যা করে যাদের আল্লাহ প্রশংসা করেছেন এবং পবিত্র করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে অপবিত্রতা দূরে সরিয়ে রেখেছেন? নিশ্বাস বন্ধ করো, এরপর বলো যেভাবে একটি কুকুর তার লেজের জায়গায় বসে, যে ভাবে তোমাদের পিতা বসতো। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই লাভ করবে যা সে আগে পাঠিয়েছে। দুর্ভোগ হোক তোমাদের, তোমরা আমাদের হিংসা করতে আল্লাহ যে অনুগ্রহ আমাদের উপর করেছেন তার কারনে। আমাদের এতে কি দোষ যদি আমাদের নদী প্রচুর পানিতে পূর্ণ থাকে, আর তোমাদের নদী শুকিয়ে যায়, যা একটি কেঁচোকে লুকাতে পারে না?

> **"আর এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে তাঁর ইচ্ছা এবং আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের প্রভু।"** (সূরা হাদীদ, আয়াত-২১)।
>
> **"যাকে আল্লাহ নূর দেন না তার জন্য নূর থেকে কিছু নেই।"** (সূরা নূর, আয়াত-৪০)।

বলা হয়েছে যে তাঁর কথা শুনে কান্নার কণ্ঠগুলো উচ্চকিত হলো এবং জনতা বললো, যথেষ্ট হয়েছে হে পবিত্রদের কন্যা। আপনি আমাদের হৃদয় পুড়িয়ে

ফেলেছেন এবং আমাদের ঘাড় নীচু করে দিয়েছেন। এরপর তিনি চুপ করে গেলেন।

সাইয়েদ ইবনে তার "মালফুয" এ খুতবাগুলো উদ্ধৃত করেছেন এরপর বলেছেন যে, সেদিন ইমাম আলীর কন্যা উম্মে কুলসুম পর্দার পেছন থেকে কেঁদে উঠলেন এবং বললেন: হে কুফাবাসীরা, তোমরা যেন খারাপের সম্মুখীন হও। কেন তোমরা ইমাম হোসইনকে সহায্য করা থেকে বিরত রইলে? কেন তাঁকে হত্যা করলে? কেন তোমরা তাঁর জিনিসপত্র লুট করলে এবং এগুলোর মালিক বনে গেলে? কেন তাঁর নারী স্বজনদের বন্দি করেছো এবং তাঁকে নিশ্চুপ করে দিয়েছ? তোমরা যেন ধ্বংস হয়ে যাও এবং শিকড় শুদ্ধ উৎপাটিত হয়ে যাও। দুর্ভোগ হোক তোমাদের তোমরা কি জানো তোমরা কিসের জন্ম দিয়েছো? তোমরা কি জানো কি গুনাহের বোঝা তোমরা তোমাদের পিঠের উপর তুলে নিয়েছো? এবং কী রক্ত ঝরিয়েছো? এবং কোন নারীদের তোমরা বন্দি করেছো? এবং কোন শিশুদের লুট করতে চাও? এবং কোন জিনিসপত্র তোমরা লুটতরাজ করেছ? তোমরা রাসূল (দ.)-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে হত্যা করেছো। আর তোমাদের হৃদয় থেকে দয়া বিদায় নিয়েছে।

"জেনে রাখো একমাত্র হিযবুল্লাহই (আল্লাহর দল) সফলতা লাভ করবে।"
(সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-২২)

"এবং অবশ্যই শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-১৯)

এরপর তিনি বললেন, তোমরা আমার ভাইকে হত্যা করেছো। অভিশাপ তোমাদের উপর। তোমরা অবশ্যই এর পুরস্কার হিসেবে পাবে আগুন যাতে চিরকাল পুড়বে। তোমরা তার রক্ত ঝরিয়েছো যার রক্ত ঝরানোকে হারাম ঘোষণা করেছেন আল্লাহ কুরআন ও মুহাম্মদ (দ.)-এর মাধ্যমে; তোমরা যেন আগুনের সংবাদ পাও যেখানে তোমরা আগামীকাল প্রবেশ করবে এবং চিরস্থায়ীভাবে সেখানে যাবে। আমি আমার ভাইয়ের জন্য সারা জীবন কাদবো। যিনি জন্ম নিয়েছিলেন রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর পরে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে। আমার অশ্রু বইছে আমার গালে বন্যার মতো এবং বৃষ্টির মতো, যা কখনো শুকাবে না।

বলা হয়েছে, জনতা কাঁদতে লাগলো এবং উচ্চ কণ্ঠে আহাজারি করতে লাগলো। নারীরা তাদের নিজেদের চুল ছিঁড়লো এবং মাথায় বালি মাখলো। তারা তাদের খামচি দিলে এবং তাতে আঘাত করতে লাগলো এবং বললো।

হায়! হায়! পুরুষরা কাঁদতে শুরু করলো এবং নিজেদের দাড়ি ধরে টানলো কোনোদিন পুরুষ ও নারীর এমন বিলাপ দেখা যায়নি।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন যে, আমি কুফার খোলা ময়দানে পৌঁছলাম। আমি সেখানে দাড়িয়ে রইলাম যেখানে পুরষেরা অপেক্ষা করছিলো বন্দিদের ও কাটা মাথাগুলোর আগমণের অপেক্ষায়। হঠাৎ প্রায় চল্লিশটি উট পিঠে প্রায় চল্লিশটি ছাতা নিয়ে এগিয়ে এলো সেখানে ছিল ফাতেমার নারী স্বজন, পরিবার ও শিশু সন্তানরা। আর ইমাম আলী (জয়নুল আবেদীন) কোনো আসন ছাড়াই একটি উটের উপর বসেছিলেন তার পা দিয়ে রক্ত বেয়ে পড়ছিলো এবং তিনি এ অবস্থায় কাঁদছিলেন।

ইমাম জয়নাল আবেদীন বললেন, "হে খারাপ জাতি, তোমাদের যেন কখনো পিপাসা না কেটে, হে সেই জাতি যারা আমাদের প্রপিতামহ রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর কথা চিন্তা করেও আমাদের সম্মান করোনি। তোমরা আমাদের আসন ছাড়া উটের উপর বসিয়েছো যেন আমরা তারা নই যারা ধর্মের ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে। হে বনি উমাইয়া, কতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদের উপর অত্যাচার করবে অথবা আমাদের আহ্বান কারীর ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করবে? হে তারা, যারা আমাদের দুর্দশায় হাত তালি দাও এবং জমিনের উপর আমাদের অপবাদ দাও। আমার প্রপিতামহ কি আল্লাহর রাসূল ছিলেন না? দুর্ভোগ হোক তোমাদের, কে উদারভাবে পথ দেখায় পথভ্রষ্টের পথের চেয়ে? হে তাফ (কারবালা)-এর ঘটনা, তুমি আমাকে শোক ও দুঃখের উত্তরাধিকারী করেছো। আল্লাহর শপথ তাদের চেহারার আবরন টেনে খুলে ফেলা হবে যারা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে।

কুফার লোকেরা উটের উপর বসা বন্দি শিশুদের মাঝে খেজুর রুটি এবং বাদাম বিতরণ করতে শুরু করলো। তা দেখে উম্মে কুলসুম উচ্চ কণ্ঠে বললেন, হে কুফাবাসীরা আমাদের জন্য দান (সদকা) গ্রহণ করা হারাম। তিনি শিশুদের হাত ও মুখ থেকে সেসব বের করে নিলেন এবং মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

উম্মে কুলসুম বললেন, চুপ কর হে কুফাবাসীরা, তোমাদের পুরুষরা আমাদের হত্যা করবে আর তোমাদের নারীরা আমাদের জন্য কাঁদবে? আল্লাহ বিচার দিনে বিচার করবেন তোমাদের ও আমাদের মাঝে"। যখন তিনি এ কথা বললেন, কান্নার আওয়াজ বৃদ্ধি পেলো এবং কাটা মাথাগুলো আনা হলো।

ইমাম পাকের মাথা ছিল সামনে, তা দেখতে বৃহস্পতি গ্রহ বা চাঁদের মতো দেখাতে লাগলো এবং রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর চেহারার সঙ্গে সবচেয়ে মিল দেখালো। অন্য সবার চেয়ে তার দাড়িতে সবচেয়ে মিল দেখালো। অন্য সবার চেয়ে তাঁর দাড়িতে কলপের চিহ্ন ছিলো। আর চেহারা পূর্ণ চন্দ্রের মতো জ্বল জ্বল করছিলো এবং বাতাস দাড়িকে বাম ও ডান দিকে নাড়াচ্ছিল। সাইয়েদা জয়নাব মাথা উঠালেন এবং তাঁর ভাইয়ের চেহারা দেখতে পেলেন এবং হাওদার কাঠের খুঁটিতে মাথা দিয়ে আঘাত করলেন। আমরা নিজেদের চোখেই দেখলাম যে, তার মাথার চাদরের নিচ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং তিনি ভগ্ন হৃদয়ে বলতে লাগলেন: হে চাঁদ। যে তখনও উঠেনি যখন তা ঢেকে গেলো এবং অস্ত গেল। হে আমার অন্তরের টুকরো, আমি ভাবতেও পারিনি ভাগ্যের কলম এরকম লিখবে। হে ভাই, কচি মেয়ে ফাতিমার সঙ্গে একটু কথা বলুন যেন তার হৃদয় সান্ত্বনা পায়। হে ভাই, সে হৃদয়ের কী হলো যা ছিলো আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, তা কি কঠিন হয়ে গেলো? হে ভাই, আমি চেয়েছিলাম যে আপনি আলীর (জয়নাল আবেদীনের) দিকে তাকান যখন তাঁকে বন্দি করা হয়েছে এবং একই সময়ে এতিম হয়ে গেছে। তাঁর কোন শক্তি ছিলোনা প্রত্যাঘাত করার। যখন তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হচ্ছিল সে তখন আপনাকে অসহায়ভাবে ডাকছিলো। আর তাঁর চোখের পানি বইছিলো। হে ভাই তাকে আপনার বুকে জড়িয়ে ধরুন এবং আপনার কাছে টেনে নিন এবং তার ভীত অন্তরকে সান্ত্বনা দিন, হায় একজন ইয়াতীমের জন্য কী অপমানকর যে, যখন সে তার পিতাকে উচ্চস্বরে ডাক দেয়, কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো জবাব পায় না।"

ইমাম হোসাইনের মস্তক মোবারক ও তাঁর পরিবার উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের দরবারে

কারবালার ময়দান থেকে উমর বিন সা'দ নবুয়তের আমানত অর্থাৎ আহলুল বাইতকে বোরখাহীন অবস্থায় আসনবিহীন উটের হাওদায় চড়িয়ে পাঠানো এবং তাঁদের সঙ্গে এমন আচরণ করল যে তাঁরা যেন অপরাধী বন্দি ছিল। তাঁরা যখন কুফার নিকটবর্তী হলেন, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ আদেশ দিল যে, ইমাম হোসাইনের মাথা মোবারক তাদের সামনে আনতে। তারা শহীদদের মাথাগুলোকে বর্শার আগায় রেখে সারিবদ্ধ করলো এবং তাদের পিছনে বন্দিদের টেনে হিঁচড়ে আনা হলো কুফায় প্রবেশ পর্যন্ত। এরপর তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে প্রদর্শন করা হলো রাস্তা ও বাজারগুলোতে।

ইমাম হোসাইনের মাথা ছিলো ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যা বর্শার আগায় তোলা হয়েছিলো। আর এতো বিপুলসংখ্যক পুরুষ ও নারীকে এর আগে কখনো একত্রে কাঁদতে দেখা যায়নি। যখন কাটা মাথাগুলো কুফার ভেতরে প্রবেশ করছিলো, একজন ঘোড় সওয়ার যে, অন্যদের চেয়ে সুন্দর ও সুঠাম ছিল। আব্বাস বিন আলীর মাথাটি তার ঘোড়ার ঘাড় থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিলো। পরে তার চেহারা আলকাতরার মতো কালো হয়ে গিয়েছিলো। এবং সে বলেছিলো "প্রত্যেক রাতে দুজন দূত আমাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে" এরপর সে এ ঘৃন্য অবস্থাতেই মারা যায়।

শেখ মুফীদ বর্ণনা করেন যে, ইমাম হোসাইনের মাথা কুফাতে আগে আনা হলো এবং বন্দিদের আনা হলো পরের দিন। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তার প্রাসাদে আসীন ছিল এবং একটি সাধারণ সমাবেশ করার আদেশ দিলো। পবিত্র মাথাটি ভিতরে আনা হলো এবং সামনে রাখা হলো। যখন তার দৃষ্টি ঐ মাথা মোবারকের উপর পড়লো সে মুচকি হাসলো এবং তার হাতে থাকা বেত দিয়ে ইমামের সামনের দাঁতগুলোতে খোঁচাল।

ইবনে হাজরের 'সাওয়ায়েকে মুহরিকা' এ বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম হোসাইনের মাথা ইবনে যিয়াদের বাড়ীতে আনা হলো দেয়ালগুলো থেকে রক্ত বেয়ে পড়তে লাগলো।

শরহে হামাযিয়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, সে (উবাদুল্লাহ) আদেশ দিলো যেন মাথাটি একটি বর্মের উপর রাখা হয়, যা তার ডান পাশে রাখা ছিলো। আর তার কাছেই দুই সারিতে লোকজন দাঁড়িয়েছিল।

মালিক বিন আনাস এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে মুসীরুল আহযান গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, আনাস বলেন, "আমি দেখেছি উবায়দুল্লাহ তার বেত দিয়ে হোসাইনের দাঁতগুলোতে আঘাত করছে এবং বলছে, "কত ভালো দাঁতগুলো তোমার হে হোসাইন"। আমি বললাম আল্লাহর শপথ আমি মনে করি এর পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। আমি রাসূলাল্লাহ (দ.)-কে দেখেছি ঐ জায়গায় চুমো দিতে যে যায়গায় তুমি তোমার বেত দিয়ে আঘাত করেছ। সাঈদ বিন মা'আয এবং উমর বিন সাহলও উপস্থিত ছিলো যখন উবায়দুল্লাহ আঘাত করছিলো। হোসাইনের চোখগুলোতে ও নাকে এবং বেতটি তার পবিত্র মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল।

হামীদ বিন মুসলিম (উমর বিন সা'আদের একজন অনুসারী) বর্ণনা করেন যে, উমর বিন সা'আদ আমাকে ডাকল এবং আমাকে তার পরিবারের কাছে পাঠালো তার বিজয় ও নিরাপদ থাকার সুসংবাদ দিয়ে। আমি তার পরিবারের কাছে গেলাম এবং তার সংবাদ পৌঁছে দিলাম। এরপর আমি বেরিয়ে এলাম এবং প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলাম উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ একটি সমাবেশ ডেকেছে। বিভিন্ন দল তার সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলো এবং সে তাদের কথা শুনল। সে অনুমতি দিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করার এবং আমিও অন্যদের সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমি দেখলাম ইমাম হোসাইনের মাথা তার কাছেই রাখা আছে। আর সে তার (ইমামের) দাঁতগুলোতে আঘাত করছে তার হাতের বেত দিয়ে। এক ঘণ্টা ধরে। যখন সাহাবী যাইদ বিন আকরাম দেখলেন যে, সে তার হাতকে নিবৃত করছে না, তিনি উচ্চ কণ্ঠে বললেন, তোমার বেত সরিয়ে নাও এ দাঁতগুলো থেকে, কারণ আল্লাহর শপথ তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি রাসূলাল্লাহ (দ.) দুটো ঠোঁটকেই দেখেছি সেগুলোর উপর চুমু দিতে"। এ কথা বলার পর যুদ্ধের দুঃখ বিস্ফোরিত হলো এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন। ইবনে যিয়াদ বললো, তোমার রব তোমাকে কাঁদাক। আল্লাহর শপথ যদি তুমি বৃদ্ধ না থেকে অথবা নির্বোধে পরিণত না থেকে এবং তোমার বুদ্ধি চলে না যেত, আমি তোমার মাথা উড়িয়ে দিতাম। এরপর সে উঠে দাঁড়ালো ও চলে গেল। আমি যখন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলাম দেখলাম লোকজন পরস্পরকে বলছে যাইদ বিন

আকরাম এমন কথা উচ্চারণ করেছে যে যদি যিয়াদের সন্তান তা শুনত, সে তাকে হত্যা করে ফেলত।

আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কী বলেছে, তারা বলল সে বলেছে একজন দাস একজন দাস লাভ করেছে এবং সে মনে করছে সব মানুষ তার দাসের সন্তান (আরবী প্রবাদ) 'হে আরবরা আজ থেকে তোমরা দাসে পরিণত হয়েছো। তোমরা ফাতেমার সন্তানকে হত্যা করেছ এবং মারজানার সন্তানকে তোমাদের অধিনায়ক বানিয়েছো। সে তোমাদের ধার্মিকদের হত্যা করে এবং জেনে রেখো সে তোমাদেরকে তার দাস বানিয়েছে। তোমরা নিজেদেরকে অপমানের ভিতরে প্রবেশ করিয়েছে এবং মৃত্যু হোক তাদের যারা নিজেদের অপমানের ভেতর প্রবেশ করিয়েছে।

সিবতে ইবনে জাওযির তার কিতাবুল খাওয়াস-এ এবং সাওয়ায়েকে মুহরিকাতে, তাবারুল মাজার এও বর্ণিত হয়েছে যে, যাইদ বিন আকরাম উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে জনতা আজ থেকে তোমরা দাসে পরিণত হয়েছো। তোমরা ফাতেমার সন্তানকে হত্যা করেছো এবং মারজানের সন্তানকে তোমাদের অধিনায়ক বানিয়েছো। আল্লাহর শপথ, সে তোমাদের মাঝে ধার্মিকদের হত্যা করে এবং জেনে রেখো যে সে তোমাদের দাস বানিয়েছে। মৃত্যু হোক সে ব্যক্তির যে নিজেকে অপমান ও লাঞ্ছনার ভিতর প্রবেশ করিয়েছে।" এরপর তিনি ইবনে যিয়াদকে বললেন, "আমি তোমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করবো যা তোমার জন্য অপ্রীতিকর হবে। আমি নিজে দেখেছি রাসূলাল্লাহ (দ.) ইমাম হাসানকে তাঁর ডান উরুর উপর এবং ইমাম হোসাইনকে তাঁর বাম উরুর উপর বসিয়ে তার হাত তাদের মাথার উপর রেখেছেন এবং বলছেন, "হে আল্লাহ আমি দুজনকেই এবং তাদের সঙ্গে যোগ্য বিশ্বাসীদের তোমার নিরাপত্তায় তুলে দিচ্ছি।"

হে যিয়াদের সন্তান, রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর আমানতকে নিয়ে তুমি কি করেছো?

হিশাম বিন মুহাম্মদ (কালাব) বলে যে, যখন ইমাম হোসাইনের মাথাটি ইবনে যিয়াদের কাছে রাখা হলো তার জ্যোতিষী তাকে বললো, "উঠুন এবং আপনার শত্রুর মুখে আপনার পা রাখুন (নাউজু বিল্লাহ) হাবিবুস সিয়ার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে যখন ইমাম হোসাইনের মাথা ইবনে যিয়াদের কাছে আনা হলো সে এগিয়ে এলো তার চেহারা ও চুল দেখতে। হঠাৎ তার অপবিত্র হাত কেঁপে উঠলো। এরপর সে পবিত্র মাথাটি তার উরুর উপরে রাখলো। তা

থেকে এক ফোঁটা রক্ত পড়লো এবং তার কাপড় ভেদ করলো এবং তা ছিদ্র করে উরুর অনেক গভীরে প্রবেশ করলো এবং তা একটি ক্ষতে পরিণত হলো এবং তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগলো। চিকিৎসকরা যতই তা সুস্থ করতে চাইল ব্যর্থ হলো। তাই ইবনে যিয়াদ সব সময় তার কাছে মেশকের সুগন্ধ রাখতো যেন দুর্গন্ধ প্রকাশ না পায়।

ইবনে সা'আদের তাবাকাত থেকে তাযকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইবনে যিয়াদের মা মারজানাহ তাকে বলেছিল হে বদমাশ, তুই রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর বেহেশতের মুখ দেখবি না। কুফাতে ইবনে যিয়াদ সব মাথাগুলোকে যা ছিল সেটি সত্তরটি কাঠের বর্শার উপরে উঠিয়েছিলো। আর মুসলিম বিন আকিলের মাথার পর বিশ্বে এ মাথাগুলো ছিল প্রথম যা কাঠের বর্শার আগায় তোলা হয়েছিল।

শেখ মুফীদ বলেন যে, হযরত জয়নাব বিনতে আলী প্রাসাদের এক কোনায় বসে পড়লেন, আর তাঁর দাসীরা তার চারদিকে থাকলো। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞাসা করল, "এ নারীটি কে যে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে কোনায় বসে আছে।" হযরত জয়নাব কোনো জবাব দিলেন না। যিয়াদ একই প্রশ্ন তিনবার করলো। তখন দাসীদের একজন বললো তিনি 'যয়নাব'। যিনি রাসূল (দ.)-এর কন্যা ফাতেমার কন্যা। ইবনে যিয়াদ তার দিকে ফিরলো এবং বললো সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাদেরকে অপমানিত করেছেন, হত্যা করেছেন এবং তোমাদের চেহারার মিথ্যাকে প্রকাশ করেছেন। হযরত যয়নাব বললেন, "প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য যিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে ভালবেসেছেন এবং আমাদের কাছ থেকে সব অপবিত্রতা দুর করেছেন। (কুরআনের আয়াতে তাতহীরের প্রতি ইঙ্গিত)। নিশ্চয়ই উদ্ধত ব্যক্তি অপমানিত হয় এবং বিকৃত মিথ্যা বলেছে। আর এগুলো আমাদের কাছ থেকে বহু দূরে সব প্রশংসা আল্লাহর"। ইবনে যিয়াদ বললো, আল্লাহ তোমাদের পরিবারকে কি করেছে? তিনি বললেন, "তিনি (আল্লাহ) তাদের জন্য শাহাদাত পছন্দ করেছেন এবং তারা দ্রুত তাদের বিশ্রামের জায়গার দিকে এগিয়ে গেছে, এরপর আল্লাহ তোমাকে মুখোমুখি একত্র করবেন এবং তারা তোমার বিচার করবে এবং তাঁর সামনে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

সাইয়েদ ইবনে তাউস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যয়নাব বলেছেন- আমি এতে সদয় আচরণ ছাড়া কিছু দেখি না। তারা ছিলেন আল্লাহর পক্ষ (হিযবুল্লাহ) থেকে পুরুষ এবং শাহাদাতকে বেছে নিয়েছিলেন এবং প্রস্তুতি

নিয়েছিলেন তাদের বিশ্রামের জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য আল্লাহর তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং তোমাদের বিচার করা হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তখন দেখো সেদিন কে সফলতা লাভ করে। হে মারজানার সন্তান, তোমার মা তোমার জন্য শোক পালন করুক।"

ইবনে যিয়াদ বললো– আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের পরিবারের বিদ্রোহের বিষয়ে এখন আমার হৃদয়কে আরোগ্য দিয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত যয়নাব আবেগাপ্লুত হলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। এরপর তিনি বললেন, "আমার জীবনের শপথ, তুমি আমার বড়কে এবং আমার ছোটকে হত্যা করেছো এবং আমার পরিবারকে ধ্বংস করেছো এবং আমার শাখাকে কেটে ফেলেছো এবং আমার আদি উৎসকে উপড়ে ফেলেছো। এতে যদি তোমার হৃদয় আরোগ্য লাভ করে।" তা শুনে ইবনে যিয়াদ বললো, এ নারী ছন্দে কথা বলে, তার বাবাও একইভাবে কথা বলতো (হযরত আলীর কাব্য প্রতিভা ও বগ্নিতা অসাধারণ বক্তৃতা দানের ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত) এবং একজন কবি ছিল। তিনি জবাব দিলেন, একজন নারীর ছন্দের কি প্রয়োজন? আমি আমার চেহারাকে ছন্দ থেকে ফিরিয়ে নেই। কিন্তু এ কথা বেরিয়ে এসেছে একটি ক্ষত বিক্ষত হৃদয় থেকে।"

আলী বিন হোসাইন (ইমাম জয়নাল আবেদীনকে উবায়দুল্লাহর নিকট হাজির করা হলো। সে জিজ্ঞেস করলো তুমি কে? তিনি বললেন আমি আলী বিন হোসাইন। উবায়দুল্লাহ বললো, আল্লাহ কি আলী বিন হোসাইনকে হত্যা করে নি (উবায়দুল্লাহ গং তাদের সকল কুকর্ম আল্লাহর কাজ বল প্রচার করতো) ইমাম বললেন, আমার একটি ভাই ছিল আলী নামে যাকে লোকেরা হত্যা করেছে। ইবনে যিয়াদ বললো বরং আল্লাহ তাকে হত্যা করেছে। ইমাম বললেন–

> **"আল্লাহ আত্মাগুলোকে নেন মৃত্যুর সময় এবং তাদেরও যারা মৃত্যুবরণ করেনা ঘুমের ভিতরে।"** (সূরা জুমার, আয়াত-৪২)

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ ক্ষেপে উঠলো এবং বললো তোমার এতো সাহস যে তুমি আমাকে উত্তর দাও এবং সাহস রাখো আমার কথার বিরুদ্ধে যুক্তি দেয়ার? (ইসলামি খেলাফতের গভর্নরের সত্য বচনে প্রতিক্রিয়া দেখে তারা কি ধরনের মুসলমান ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়)। তাই একে নিয়ে যাও এবং তার মাথা কেটে ফেলো। এ কথা শুনে হযরত যয়নাব তাকে

আকড়ে ধরলেন এবং বললেন, হে যিয়াদের সন্তান, তুমি আমাদের যথেষ্ট রক্ত ঝরিয়েছো। এরপর তিনি তাকে তার দুহাতের ভিতর নিলেন এবং বললেন আল্লাহর শপথ, আমি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। যদি তুমি তাকে হত্যা করতে চাও, তাহলে তার সঙ্গে আমাকেও হত্যা করো।' ইবনে যিয়াদ তাদের দুজনের দিকে কিছুক্ষনের জন্য তাকিয়ে থাকলো। এরপর বললো দয়ার কি আশ্চর্য রহস্যই না আছে৷ আল্লাহর শপথ আমি অনুভব করছি যে সে চাচ্ছে আমি তাকে তার সঙ্গে হত্যা করি। তখন সে বলল তাদের ছেড়ে দাও কারণ আমি দেখছি তারা তাদের নিজেদের শোকের ফাঁদে আটকে পড়েছে।

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন যে, যখন সৈয়দা জয়নাব উবায়দুল্লাহকে বললেন, "তুমি আমাদের কাউকে বাদ দাওনি এরপরে যদি একেও হত্যা করতে চাও আমাকে তার সঙ্গে হত্যা করো। ইমাম বলেন, প্রিয় ফুফু, দয়া করে অপেক্ষা করুন, আমাকে তার সঙ্গে কথা বলতে দিন।" এরপর তিনি ইবনে যিয়াদের দিকে ফিরে বললেন, তুমি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? তুমি কি জানো না যে, শাহাদাত হলো আমাদের ঐতিহ্য এবং এতে নিহিত আছে আমাদের মর্যাদা।" এরপর ইবনে যিয়াদ ইমাম জয়নুল আবেদীন ও তাঁর পরিবারকে বন্দি করে রাখলো কুফার বড় মসজিদের দক্ষিণ দিকের বাড়ীগুলোর একটিতে। তখন সৈয়দা যয়নাব ঘোষণা দিলেন আরব নারীদের কোনো অধিকার নাই আমাদের সাক্ষাতে আসার। শুধু নারী গৃহকর্মী এবং দাসীরা আমাদের সাক্ষাতে আসতে পারবে যারা আমাদের মতো বন্দীত্বের স্বাদ পেয়েছে।"

উবায়দুল্লাহ আদেশ দিল ইমাম হুসাইনের মাথাটি কুফার রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শন করতে। এরপর উবায়দুল্লাহ তাঁদেরকে কারাগারে ফেরত পাঠানোর আদেশ করলো এবং সব জায়গায় ইমাম হোসাইনের মৃত্যুর সংবাদ পাঠালো এবং ইমাম পাকের মাথাসহ বন্দিদেরকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে পাঠালো।

কুফার পথে হযরত ইমাম হোসাইন

উবাদুল্লাহ বিন যিয়াদের নির্দেশে ইমাম পাকের ছিন্ন মস্তক বর্শার লাঠির আগায় বিঁধিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো থেকে লাগল। বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি সূরা কাহাফ-এর এই আয়াত তেলওয়াত করছিল, তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনের মধ্যে বিস্ময়কর।

যাইদ বিন আকরম বর্ণনা করেন যে, আমি আমার বারান্দায় ছিলাম যখন ইমাম হোসাইনের মাথাটি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যা ছিল একটি বর্শার মাথায়। যখন তা সেটি (মস্তকটি) আমার কাছে এসে গেল, আমি একে তেলওয়াত করতে শুনলাম অথবা তুমি কি মনে কর গুহাবাসীরা এবং লোকগুলো আমাদের নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে অবাক করা বিষয়। ইমাম পাকের কাটা মাথা থেকে এই তেলওয়াত শুনে আমার চামড়ার লোম দাঁড়িয়ে গেল এবং আমি বললাম হে রাসূলাল্লাহর সন্তান আপনার রহস্য এবং আপনার কাজও সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং হাঁ সবচেয়ে বিস্ময়কর। মাথাটি কুফা শহরে প্রদর্শন করার পর প্রাসাদে ফেরত আনা হলো এর পর ইবনে যিয়াদ এটি যাহির বিন কায়েসের নিকট হস্তান্তর করে তার সাথিদের ঐগুলোসহ এবং পাঠিয়ে দিল ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার কাছে। সে আরো নির্দেশ দিল যে হোসাইনের মৃত্য সংবাদ যেন মদিনার গভর্নরের নিকট পাঠানো হয়।

ইবনে আসীরের কামিল গ্রন্থে আছে যে, ইমাম হোসাইনের শাহাদতের পর যখন উমর বিন সা'দ কুফায় ফিরে এলো ইবনে যিয়াদ তাকে বললো হে উমর আমাকে ঐ চিঠিটি ফেরত দাও যেখানে আমি আদেশ করেছি হোসইনকে হত্যা করতে। সে বলল আমি আপনার আদেশ বাস্তবায়ন করেছি। আর চিঠিটি হারিয়ে গেছে। ইবনে যিয়াদ বললো তোমার উচিত তা খুঁজে বের করা। উমর বললো আমি তা আমার কাছে রেখেছি যেন আল্লাহর শপথ আমি তা পড়তে পারি মদিনার কোরাইশ বংশের বৃদ্ধাদের সামনে আমার জন্য তা কৈফিয়ত হিসেবে। সাবধান, আমি হোসাইনের বিষয়ে আপনাকে উপদেশ দিয়েছিলাম যে, যদি আমার বাবা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের প্রতি একই কাজ করতাম, তাহলে বাবার যে অধিকার তা পূরণ করে দিতাম। তা শুনে উবায়দুল্লাহর ভাই উসমান বিন যিয়াদ বললো সে সত্য কথা বলেছে, আল্লাহর শপথ, আমি কতইনা পছন্দ করি যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যিয়াদের সব সন্তানের নাকে লাগাম পরানো থাকবে এবং হোসাইনকে হত্যা করা হবে না। উবায়দুল্লাহ চুপচাপ তা শুনল।

সিবতে ইবনে জাওযীর তাজকিরাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এরপর উমর বিন সা'দ ইবনে যিয়াদের সমাবেশ থেকে উঠে এলো তার বাসায় যেতে। পথিমধ্যে সে বলল কেউ আমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় যুদ্ধ থেকে ফেরত আসেনি আমি যিয়াদের সন্তানের আদেশ মেনেছি, যে জুলুমকারী এবং যে

চরিত্রহীন মহিলার সন্তান এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহর অবাধ্য। রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর পরিবারের সঙ্গে আমার যে আত্মীয়তার মর্যাদা রাখতাম তা ছিন্ন করেছি। লোকজন তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো এবং যখনই কারো মুখোমুখি হতো তারা তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। যখন সে মসজিদে প্রবেশ করতো সেখানকার লোকজন বেরিয়ে চলে যেত। যে তাকে দেখত তাকে গালি দিত।

কুফায় মহান বন্দিদের নিকট সংবাদ প্রেরণঃ

ইমাম পাকের পরিবারকে উবায়দুল্লাহর নির্দেশে কারাগারে রাখা হলো। কারাগারে একটি পাথর ছুড়ে মারা হলো, যাতে একটি চিরকুট বাঁধা ছিল। যার বিষয়বস্তু ছিল, অমুক দিন তোমাদের বিষয়ে সংবাদ পাঠানো হয়েছে ইয়াজিদের কাছে। তারপর তা এতদিন লাগবে যেতে ও আসতে। অমুক দিন তা ফেরত আসবে এবং যদি আল্লাহু আকবর আওয়াজ তোমাদের কানে পৌঁছায়, তাহলে জেনে রেখো যে, সবাইকে হত্যা করা হবে। কিন্তু যদি তা না শোন, তাহলে তোমরা শান্তিতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। সংবাদ ফেরত আসার দু'তিন দিন আগে আরেকটি চিরকুট ও একটি ব্লেড পাথরের সঙ্গে ছুড়ে দেয়া হলো, যাতে লেখা ছিলো, তোমাদের ওসিয়ত তৈরী করো এবং নিজেদের মধ্যে অঙ্গীকার করো সংবাদ অমুক দিন পৌঁছাবে। শেষ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছলো এবং আল্লাহু আকবর শোনা গেল না। যে সংবাদটি এলো তা হলো: বন্দিদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

ইয়াজিদের এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ইমাম পাকের ছিন্ন মস্তক মোবারকও তাঁর সাথিদের মাথাগুলোসহ যাহির বিন কায়েসকে হস্তান্তর করে এবং আবু বুরদাহ বিন আউন আযদি, তারিক বিন যাবিয়ান এবং কুফার কিছু লোকের সঙ্গে তাকে ইয়াজিদের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং তারা অভিশপ্ত ইয়াজিদের কাছে পৌঁছায়।

হযরত ইমাম আলীর পাক কালাম এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে: "কোথায় তারা যারা একত্রে অঙ্গীকার করেছিলো জীবন দেয়ার জন্য। আর তাদের মাথাগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে শয়তান প্রকৃতির মানুষদের কাছে।"

মক্কা ও মদিনায় হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদতের খবর ও তার প্রতিক্রিয়াঃ

আব্দুল মালিক বলে যে, আমি পৌঁছলাম এবং কুরাইশদের এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলো কী সংবাদ এনেছ? আমি বললাম "খবরটি গভর্নরের জন্য"। সে বলল ইন্না লিল্লাহে রাজিউন। হোসাইনকে শহীদ করা হয়েছে। আমি আমর বিন সাঈদ (গভর্নর)-এর কাছে গেলাম। সে জিজ্ঞেস করলো কী ঘটেছে? আমি জবাব দিলাম তাই ঘটেছে যা অধিনায়ককে খুশি করবে। হোসাইনকে হত্যা করা হয়েছে। সে বললো জনগণের কাছে তা ঘোষণা করে দাও। আমি এ খবর ঘোষণা করে দিলাম। আর বনী হাশিমদের নারীদের মধ্যে বিলাপ উঠল যে তা আর কখনো শোনা যায়নি। তা শুনে আমর বিন সাঈদ অট্টহাসি দিলো এবং বললো বনি যিয়াদের নারীরা বিলাপ করেও কাঁদে। যেভাবে আমাদের নারীরা বিলাপ করেছে ও কেঁদেছে। এরপর আমর বলল, এ বিলাপ উসমান বিন আফফানের জন্য বিলাপের প্রতিশোধ এবং সে মিম্বরে উঠলো এবং হত্যার খবর ঘোষণা করলো। উমাইয়াদের আহলে বাইত সম্পর্কে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচারের কারণে রাসূল (দ.) এবং তাঁর আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, মান্যতা ও সর্বোপরি ভালোবাসা (মোয়াদ্দত) যে ঈমানের অঙ্গ সে কথা মুসলিম সমাজ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল যার ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত আছে। এ কারণেই বর্তমানে কিছু লোক কুরআন ও হাদীসের সাহায্যে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালায় রাসূল লেখাপড়া জানতেন না, তিনি গায়েব জানতেন না, যিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন, ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও দুনিয়াবী ব্যাপারে এমন কোনো বিশেষজ্ঞ ছিলেন না যাকে মান্য করা উচিত ইত্যাদি।

ইমাম হোসাইনের শাহাদতের সংবাদ মদিনায় পৌঁছালো আকীল বিন আবি তালিবের কন্যা আসমা একদল নারীর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন, তিনি রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর কবরের দিকে গেলেন ও চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি মুহাজির ও আনসারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর কাছে কী উত্তর দেবেন, যখন রাসূলাল্লাহ (দ.) আপনাদের জিজ্ঞেস করবেন কিয়ামত ও হিসাব দেয়ার দিনে যে দিন সত্য টিকে থাকবে; যে তোমরা আমার বংশধরকে পরিত্যাগ করেছিলে ও অনুপস্থিত ছিলে এবং তাদেরকে জুলুমকারীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলে। এখন কেউ নেই যে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফায়াত করবে, যখন কারবালার মরুভূমিতে

মৃত্যু তার দিকে এসেছিলো তার কোনো সাহায্যকারী ছিল না। না ছিল কোনো সাথি যারা বলবে আমরা তার প্রতিরক্ষা করবো অন্যের হাতে নিহত হওয়া থেকে। তাঁর এই হৃদয়স্পর্শী বক্তব্যে নারী-পুরুষরা এভাবে কাঁদতে থাকে যে রকম কান্না এর আগে কখনও দেখা যায়নি।

ইমাম হোসাইনের শাহাদতের দিন সকালে মদিনায় আমাদের একজন দাস বলেছিল যে, আমি গতরাতে একটি কণ্ঠকে উচ্চকণ্ঠে বলতে শুনেছি, হে হোসাইনের হত্যাকারীরা যারা মূর্খতাবশে হত্যা করেছে, তোমরা ক্রোধ ও শাস্তির সংবাদ গ্রহণ করো আর তোমরা নবীদের, ফেরেশতাদের এবং গোত্রগুলোর অভিশাপে ধ্বংস হয়েছ এবং তোমরা অভিশপ্ত হয়েছ ইবনে দাউদ (সুলায়মান), মুসা ও ইনজীল বহনকারীর (ঈসা নবীর) জিহ্বার মাধ্যমে।"

ইবনে আসিরের 'কামিল' গ্রন্থে এবং অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দুই অথবা তিন মাস সূর্যাস্তের সময় লোকেরা দেয়ালগুলোকে রক্তে ভেজা দেখতে পেতো।

সিবতে ইবনে জাওযী বলেন যে, যখন ইমাম হোসাইনের শাহাদতের খবর মক্কায় আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের কাছে পৌঁছল, সে বলল- ইরাকীদের বিষয়ে সাবধান হও। হে ধোঁকাবাজ ও সীমালংঘনকারীর দল। সাবধান হে কুফাবাসীরা যারা সবার মাঝে নিকৃষ্ট তারা হোসাইনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদেরকে সাহায্য করার জন্য, তাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সহায়তা করার জন্য এবং ইসলামের প্রকৃত নিয়মনীতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। আর যখন তিনি তাদের কাছে এলেন, তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো এবং তাকে হত্যা করলো। তারা তাকে বলেছিল বায়াত করতে যিয়াদের ব্যভিচারী এবং অভিশপ্ত পুত্রের কাছে এবং তার আদর্শের কাছে আত্মসমর্পন করতে। কিন্তু তিনি অপমানের জীবনের ওপর সম্মানের মৃত্যুকে উচ্চতা দিয়েছেন। আল্লাহ হোসাইনকে রহমত করুন এবং তার হত্যাকারীদেরকে বেইজ্জযত করুন এবং তাদের অভিশাপ দিন যারা তার (ইয়াজিদ) আদেশকে পালন করেছে এবং তাদেরও যারা এতে সন্তুষ্ট ছিল। তারা আবু আবদুল্লাহর প্রতি যা করেছে তারপরও কি তোমরা তাদের উপর সামান্যতম নির্ভর করবে এবং ধোঁকাবাজ-ব্যাভিচারীর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করবে? সাবধান আল্লাহর শপথ, তিনি (ইমাম হোসাইন আ.) ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি দিনগুলোতে রোজা রাখতেন এবং রাতে (ইবাদতে) জেগে থাকতেন এবং রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর নিকটবর্তী ছিলেন ব্যভিচারীদের

সন্তানদের চেয়ে। আল্লাহর শপথ, তারা কুরআন শুনতে অস্বীকার করে এবং এর বদলে গান শুনে, আল্লাহর ভয়ে কান্নার বদলে গান গায়। রোযা রাখার বদলে মদ খায়, রাতে ইবাদতের জন্য জেগে না থেকে বাঁশি বাজায়। শিকারের (পশু পাখীর) পেছনে দৌড়ায় আল্লাহর স্মরণে জমায়েত হওয়া ফেলে এবং বানর নিয়ে খেলা করে। খুব শীঘ্রই তারা জাহান্নামের ভেতরে ধ্বংসের উপত্যকায় পড়বে। সাবধান। নিশ্চয়ই আল্লাহর অভিশাপ জালিমদের উপরে।

ইবনে সা'দ-এর তাবাকাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে যখন ইমাম হোসাইনের শাহাদতের সংবাদ উম্মুল মুমিনীন সালমার কাছে পৌঁছলো তিনি বললেন, তারা কি সত্যিই তা করেছে? আল্লাহ যেন তাদের ঘরগুলো এবং কবরগুলো আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দেন।" এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে পেলেন।

ইবনে আবিদ হাদীদ বলেন যে, রাবি বিন খাসীম বিশ বছরে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি ইমাম হোসাইনের শাহাদাত পর্যন্ত। তিনি শুধ একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তারা এটি করেছে? এরপর বললেন–

> **"বলো (হে রাসূল!) হে আল্লাহ, আকাশ ও পৃথিবী আরম্ভকারী, অদৃশ ও প্রকাশের জ্ঞানী, আপনি আপনাদের দাসদের মধ্যে (একমাত্র) ফয়সালাকারী, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল।"** (সূরা যুমার, আয়াত-৪৬)।

এরপর তিনি চুপ থাকলেন এবং সে অবস্থতেই থাকলেন তার ইন্তিকাল পর্যন্ত।

সালাবির তাফসীর থেকে মানাকির এ উল্লেখ করেছেন যে রাবি বিন খাসীম ইমাম হোসাইনের শাহাদতের সময় উপস্থিত ছিলো এমন একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলো যে, তোমরা মাথাটি এনেছ এবং বর্শার উপরে উঠিয়েছে? এরপর তিনি বললেন আল্লাহর শপথ, তোমরা আল্লাহর বাছাইকৃতকে হত্যা করেছ, যাদের সামনে রাসূলাল্লাহ (দ.) পেলে তাদের ঠোঁটে চুমু দিতেন এবং তাঁর কোলে বসাতেন, এরপর তিনি এ আয়াতটি তেলওয়াত করলেন–

> **"বলো (হে রাসূল): হে আল্লাহ আকাশগুলো ও পৃথিবীর আরম্ভকারী, অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী আপনি আপনাদের দাসদের মাঝে একমাত্র ফয়সালাকারী যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল।"** (সূরা যুমার, আয়াত-৪৬)

পবিত্র মাথাগুলো এবং পবিত্র পরিবার সিরিয়ার পথেঃ

'ইরশাদ' গ্রন্থে আছে যে, হোসাইনের পবিত্র মাথাটি কুফার রাস্তায় প্রদর্শন করার পর তারা তা প্রাসাদে নিয়ে আসে। ইবনে যিয়াদ তা সাথিদের মাথাগুলোসহ যাহর বিন কায়েসকে হস্তান্তর করে এবং আবু বুরদাহ বিন আউন আযদি। তারিক বিন যারিয়ান এবং কুফার কিছু লোকের সঙ্গে সিরিয়ায় ইয়াজিদের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং তারা অভিশপ্ত ইয়াজিদের কাছে পৌঁছায়।

এ ব্যাপারে মনে রাখা দরকার যে আহলে বাইতের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও ইমাম পাকের পবিত্র মস্তক নিয়ে ইয়াজিদের সেনানায়করা কোথায় থেমেছেন এবং আবার রওয়ানা হয়েছেন সে জায়গাগুলোর নাম ধারাবাহিকভাবে জানা যায় না। যা হোক, মানাকিব গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ইমাম হোসাইনের উচ্চ মর্যাদার একটি হলো যে, সব অলৌকিক ঘটনাগুলো ঘটেছে যে জায়গায় তার মাথা মোবারক রাখা হয়েছিলো, কারবালা থেকে আসকালান পর্যন্ত এবং এ দুয়ের মাঝে মশুল, নাসীবাইন, হামাহ, হুজস, দামেস্ক ও অন্যা জায়গাগুলোতে।

হযরত হুসাইনের পবিত্র মস্তক সম্পর্কিত অলৌকিক ঘটনাবলি

মসুলে যে মাথা রাখার জায়গাটি রওযাতু শোহাদা গ্রন্থে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, যে যখন মাথা বহনকারীরা মসুলে পৌঁছলো, তারা সে জায়গার গভর্নরকে সংবাদ পাঠালো যেন তারা উপহার ও খাবার জমা করে তাদের জন্য এবং শহরকে সাজায়। মসুলের জনগণ জমায়েত হলো এবং একমত হলো যে, তারা যা চায় তা তাদের দিয়ে দেয়া উচিত কিন্তু তাদেরকে অনুরোধ করতে হবে যেন তা শহরে প্রবেশ না করে; বরং তারা শহরের বাইরে অবস্থান করুক। এরপর তারা যেন সেখান থেকেই চলে যায় ভেতর না এসে। তারা শহর থেকে এক ফারসাখ (সাড়ে তিন মাইল) দূরে থামলো এবং মাথাটি একটি পাথরের উপর রাখলো। মাথা থেকে এক ফোঁটা রক্ত পাথরের উপর পড়লো এবং তা থেকে রক্তের একটি স্রোত লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো। সব দিক থেকে জনগণ সেখানে জমায়েত হলো এবং শোকানুষ্ঠান শুরু করলো এবং কাঁদতে লাগলো। এ ঘটনা ঘটে চলল আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনকাল পর্যন্ত যে আদেশ করেছিলো পাথরটিকে ঐ জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিতে। এরপরে আর তার চিহ্ন দেখা যায়নি, কিন্তু একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এর নাম রাখা হয়েছিল মাশহাদুন নুকতা (ফোঁটার স্থান)।

নাসীবাইনে যে ঘটনা ঘটেছিল যা কামিলে বাহাই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, তা হলো যখন তারা নাসীবাইনে পৌঁছলো মনসুর বিন ইলইয়াস শহরকে রাজকীয়ভাবে সাজানোর আদেশ দিলো। যখন মনসুর যে ইমাম পাকের মাথা হাতে নিয়েছিল সেখানে প্রবেশ করতে চাইলো তার ঘোড়া তার আদেশ মানতে অস্বীকার করল। তা দেখে সে ঘোড়া পরিবর্তন করলো। কিন্তু এটিও আদেশ মানতে অস্বীকার করলো। সে ঘোড়া বদলাতে থাকলো এবং এক সময় পবিত্র মাথাটি বর্শা থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। সে মাথাটি তুলল এবং চিনতে পারলো যে তা ইমাম হোসাইনের মস্তক। তাই সে তাদের তিরস্কার ও গালাগালাজ করল পবিত্র মস্তক বহনকারী সৈন্যরা তাকে হত্যা করল। কিন্তু

পবিত্র মাথাটি শহরের বাইরেই রাখলো এবং শহরে তারা আর প্রবেশ করল না।

হামাহতে যিয়ারতের স্থান সম্পর্কে কিছু বইতে উল্লেখ আছে, শাহাদতের সংবাদদাতাদের একজন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি হামাহতে পৌঁছলাম হজ থেকে ফেরার পথে। বাগানগুলোর মধ্যে আমি একটি মসজিদে পৌঁছলাম যার নাম ছিলো "মসজিদে আল হোসাইন' আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং এর দেয়ালে একটি পর্দা দেখতে পেলাম। আমি পর্দাটি তুললাম এবং দেখলাম সেখানে একটি কোণাকৃতির পাথর গাঁথা।

পাথরটিতে একটি ঘাড়ের ছাপ ছিল এবং শুকনো রক্ত এর উপরে স্পষ্ট দৃশ্যমান ছিল। আমি খাদেমদের জিজ্ঞাসা করলাম। "এ পাথরটি কিসের? আর এতে কিসের রক্তের দাগ?" সে বললো, "এটি হলো সেই পাথর যার উপরে ইমাম হোসাইনের মস্তক মোবারক রাখা হয়েছিলো।" তাই তার চিহ্ন আবির্ভূত হয়েছে এর উপর।

সকল ইতিহাসের বইগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন ইমাম হোসাইনের পবিত্র মাথা বহনকারী দলটি তাদের প্রথম বিশ্রামস্থলে থামলো। তারা মদ্য পান করতে শুরু করলো ও পবিত্র মাথাটি নিয়ে বেয়াদবী শুরু করে। তখন হঠাৎ একটি হাত দেয়াল থেকে বেরিয়ে এলো একটি লোহার কলম ধরা অবস্থায় এবং রক্ত দিয়ে লিখল এ কথাগুলো, "যে উম্মত হোসাইনকে হত্যা করেছে, তারা এরপরও আশা করে যে, কিয়ামতের দিনে তার নানা তাদের জন্য সুপারিশ করবে?" এ দেখে তারা আতংকিত হয়ে পড়লো এবং ঐ স্থান ত্যাগ করলো।

সুলাইমান বিন ইয়াসার বলেছেন যে, একটি পাথর পাওয়া গিয়াছিলো যার উপর লেখা ছিলো এ থেকে পালানোর কোন উপায় নেই যে, কেয়ামতের দিনে ফাতেমা আসবেন তার জামা হোসাইনের রক্ত মাখা অবস্থায়। অভিশাপ তাদের উপর যারা তাদের নিজেদের সুপারিশকারীদের ক্রোধ অর্জন করেছে সেদিন। যখন ইসরাফিল শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন।"

"তারীখুল খামীস" গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা (পবিত্র মস্তক বহনকারীরা) এগিয়ে যেতে থাকলো একটি গির্জাতে পৌছানো পর্যন্ত এবং সেখানে তারা দুপুর পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়ার জন্য প্রবেশ করলো। সেখানে তারা দেখলো দেয়ালে লেখা আছে, "যে উম্মত হোসাইনকে হত্যা করেছে,

এরপরও তারা আশা করে যে, কিয়ামতের দিন তার নানা তাদের জন্য সুপারিশ করবে? তাদের একজন পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলো, কে এ বাক্যগুলো লিখেছে? পাদ্রী বললো, এগুলো নবুয়ত ঘোষণার একশত পঞ্চাশ বছর আগে এখানে লেখা হয়েছিল।

সিবতে ইবনে জাওযীর "তাযকিরাহ" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে ইবনে সিরীন বলেছেন নবুয়ত ঘোষণার একশত পঞ্চাশ বছর আগে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল যার উপর সিরিয়ার ভাষায় লেখা ছিল এবং তা আরবি ভাষায় অনুবাদ করার অর্থ দাড়িয়েছিলো, যে উম্মত হোসাইনকে হত্যা করেছে তারা এরপরও আশা করে কিয়ামতের দিন তার নানা তাদের জন্য সুপারিশ করবে?

সিবতে ইবনে জাওজী তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক বিন হিশাম নাহউই নিসার থেকে একটি হাদীসের মধ্যে আছে যে, ইমাম হোসাইনের পবিত্র মস্তক বহনকারীরা যখনই তাদের জিনিসপত্র নামাতো প্রতিবারই তারা ট্রাংক থেকে পবিত্র মাথাটি বের করে বর্শার ওপরে উঠাতো। তারা সারারাত পাহারা দিত সকাল পর্যন্ত এবং যাত্রা শুরুর আগে তা আবার ট্রাংকে রাখতো এবং সামনে অগ্রসর হতো। তাদের কোন এক যাত্রা বিরতির সময় তারা এক গীর্জার কাছে এলো। বরাবরের মতো তারা মাথাটি বর্শার উপরে উঠালো এবং একে পাহারা দিল। আর বর্শাটিকে গীর্জার দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখলো। মধ্যরাতে গীর্জার পাদ্রী দেখলো একটি আলোর রশ্মি মাথা থেকে বেরিয়ে আসছে এবং আকাশে পৌছে গেছে। সে গীর্জার উপর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা ইবনে যিয়াদের বাহিনীর লোক। পাদ্রী বললো এটি কার মাথা? তারা বললো এটি হোসাইনের, আলী বিন আবু তালিবের ও নবীর কন্যা ফাতেমার সন্তান। সে বলল, তোমরা বলতে চাও তোমাদের নবী? তারা হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলো। এ কথা শুনে সে বলল, তোমরা মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট। যদি মসীহর (ঈসা আ.) কোনো পুত্র সন্তান থাকতো তাকে আমরা আমাদের নয়নের পুতলীর মতো রাখতাম। সে আরো বললো তোমরা কি কিছু চাও। আমাকে কি একটি উপকার করতে পারো? তারা জিজ্ঞেস করলো তা কি? সে বলল আমার দশ হাজার আশরফী আছে, তোমরা তা নিতে পারো যদি মাথাটি আমাকে দাও। সকাল পর্যন্ত তা আমার কাছে রাখতে দেবে এবং যখন তোমরা আবার যাত্রা করবে তখন তা আমার কাছ থেকে ফেরত নিও।" তারা বললো এতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। এ কথা বলে তারা পবিত্র

মাথাটি পাদ্রীর কাছে হস্তান্তর করলো এবং সে বিনিময়ে তাদের আশরাফীগুলো দিলো। পাদ্রী পবিত্র মাথাটি পানি দিয়ে ধুলো। এতে সুগন্ধি মাখলো এবং তা তার উরুর উপর রেখে সকাল পর্যন্ত অনেক কাঁদল। যখন সকাল হলো পাদ্রী বললো, হে পবিত্র মস্তক আমার নিজের ওপর ছাড়া আমার আর কোন ক্ষমতা নাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আপনার নানা আল্লাহর রাসূল। আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমি আপনার বন্ধু ও গোলাম। এরপর সে গীর্জা ও এর ভিতরে যা ছিলো সব পরিত্যাগ করল এবং আহলুল বাইতের সারিতে প্রবেশ করল।

ইবনে হিশাম তার সীরাহতে বলেছেন যে, তারা পবিত্র মাথাটি নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং যখন দামেস্কের কাছে পৌঁছলো তারা পরস্পরকে বলতে শুরু করলো যে আসো আমরা আশরাফীগুলো আমাদের মাঝে ভাগ করে নেই। হয়তো ইয়াজিদ দেখলে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে। থলেটি আনা হলো এবং খোলা হলো। তারা দেখলো তা মাটিতে পরিণত হয়েছে এবং এর এক পাশে লেখা যার অর্থ:

> **"এবং ভেবোনা যালেমরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল। তিনি তাদের শুধু ঐ দিন পর্যন্ত রেহাই দেন যেদিন চোখগুলো পলকহীন তাকিয়ে থাকবে (আতংকে)।"** (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৪২)

এবং অন্য পাশে লেখা যার অর্থ:

> **"এবং শীঘ্রই যালেমরা জানতে পারবে কেমন মন্দ আবাসের দিকে তারা ফিরে আসবে।"** (সূরা আশ শুয়ারা, আয়াত-২২৭)

এ দেখে তারা সেগুলো বুরদা নদীতে নিক্ষেপ করলো।

পবিত্র মস্তক বহনকারীর তার পরকাল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা:

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন যে, ইবনে লাহীআহ এবং অন্যদের বরাতে একজন প্রত্যেক্ষদর্শীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, আমি কাবা তাওয়াফ করছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো কিন্তু আমি মানি তুমি তা কখনো করবে না।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে ভয় কর এবং এ কথা উচ্চারণ করো না।" তখন সে বলল, "আসো, যেন তোমাকে আমি আমার সম্পর্কে বলতে পারি।" সে বলল, "আমরা ছিলাম পঞ্চাশ জন যারা হোসাইনের পবিত্র মাথা নিয়ে সিরিয়া

যাচ্ছিলাম। প্রতি রাতে আমরা হোসাইনের মাথাকে একটি ট্রাংকে ঢুকিয়ে রাখতাম এবং একে ঘিরে থেকে মদ্য পান করতাম। এক রাতে আমার বন্ধুরা মদপান করলো এবং মাতাল হলো এবং বেহুঁশ হলো। কিন্তু আমি মদ পান করিনি। যখন রাত্রির এক অংশ পার হয়ে গেল, আমি একটি বজ্রপাতের শব্দ পেলাম এবং বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলাম। হঠাৎ আকাশের দরজাগুলো খুলে গেলো এবং নবী আদম (আ.), নূহ (আ.), ইব্রাহীম (আ.), ইসমাঈল (আ.), ইসহাক (আ.) এবং আমাদের রাসূল মুহাম্মদ (দ.), সঙ্গে জিবরাঈল (আ.) এবং অন্যান্য ফিরেশতারা নেমে এলেন। জিবরাঈল ট্রাংকের কাছে এলেন এবং পবিত্র মাথাটি তা থেকে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু দিতে লাগলেন। এরপর প্রত্যেক নবী তাকে অনুসরণ করে একই কাজ করলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শেষ নবীর (দ.)-এর কাছে পৌঁছলো। রাসূলাল্লাহ (দ.) কাঁদতে শুরু করলেন এবং অন্য নবীরা তাঁকে সমবেদনা জানাতে লাগলেন। তখন জিবরাঈল বললেন, 'হে মুহাম্মদ (দ.) আমি আপনার উম্মত সম্পর্কে আপনার অনুগত। আপনি যদি আমাকে আদেশ করেন আমি তাদের উপর জমিন উল্টিয়ে দেব যেভাবে দিয়েছি নবী লুতের (আ.) জাতিকে।" রাসূলাল্লাহ (দ.) বললেন, 'হে জিবরাঈল নিশ্চয় আল্লাহর সামনে তাদের বিরুদ্ধে হিসাব চাইব।' এরপর ফিরিশতারা আমাদের হত্যা করতে অগ্রসর হলো। আমি বললাম আশ্রয় দিন আশ্রয় দিন হে আল্লাহর রাসূল, আর তিনি (দ.) বললেন, 'দূর হও, আল্লাহ যেন কখনো তোমাদের ক্ষমা না করেন'।"

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের ফটকে ইমাম পাকের মস্তক ও তাঁর পবিত্র পরিবার

দড়িতে বাধা, রুগ্ন ও দুর্বল উটের পিঠে করে অমানবিকতার সর্বোচ্চ অবস্থায় রাসূল (দ.)-এর আহলে বাইতের নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করে সিরিয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সফরে সারা পথে তারা কাফেলার চালকের সঙ্গে না কোনো কথা বললেন, আর না কিছুর সময়ের জন্য থামিয়ে দেওয়া হলো। যাতে তোরণ নির্মাণ করে শহরকে সাজানো যায় এবং মিথ্যা বিজয়ের সাক্ষী করার জন্য লোকের সমাগম করতে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। কাফেলা সিরিয়া থেকে চার ফারসাখ (৩ থেকে ৩.৫ মাইল) দূরে থাকতেই লোকেরা ঢোল ও বাজনা নিয়ে সুন্দর পোশাক পরে আনন্দের সঙ্গে তাদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত করা হলো। আর এর সবকিছুই ছিল এজন্য যে, তারা রাসূল (দ.)-এর আহলে বাইতের ধ্বংসযজ্ঞে আনন্দিত ছিল। বিষয়টি সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা: সাহল ইবনে সাদ আল সাঈদী বর্ণনা করেন, জেরুজালেম যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি দামেস্ক অতিক্রম করছিলাম। কিন্তু শহরটি ছিল ভিন্ন রকমের স্বর্ণের মতো উজ্বল রঙ্গের আবরণে সাজানো, লোকেরা ছিল দারুণভাবে উল্লাসিত আর নারীরা খঞ্জনি ও ঢোলের দ্বারা খেলছিল। আমি মনে করেছিলাম দামেস্কে হয়তো এমন কোন উৎসব থাকবে যা আমাদের নেই। কিছু লোক নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিল, আমি তাদের নিকটবর্তী হলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা সিরিয়ার লোক এমন কোন উৎসব পালন কর যা, আমাদের জানা নেই। তারা জানতে চাইলো, মনে হচ্ছে তুমি আগন্তুক, তাই না? আমি বললাম হ্যাঁ তাই। আমি সাহল ইবনে সা'দ। আমি তাদের মধ্যে একজন যারা রাসূল (দ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তারা বলল, সাহল তুমি কি মনে করো না যে, এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হচ্ছে না আর দুনিয়া তার অধিবাসীসহ ডুবে যাচ্ছে না? আমি প্রশ্ন করলাম এটা কীসের জন্য? তারা বলল, এ সব কিছুই কুফা থেকে হুসাইনের মাথা আসবে বলে, আমি বললাম কী আশ্চর্য! হুসাইনের মাথা পাঠানো হচ্ছে আর লোকেরা আনন্দের সঙ্গে

একত্র হচ্ছে। শহরের কোন প্রবেশদ্বার দিয়ে মাথা প্রবেশ করবে? তারা আসসাতের প্রবেশ দ্বার দেখালে আমি দ্রুত সেখানে গেলাম। অসংখ্য পতাকা প্রবেশ করতে আরম্ভ করল, কিন্তু আমার চোখ একজন ঘোড়সওয়ারীর দিকে দৃষ্টি দিল। যার হাতের বর্শার অবিকল রাসূল (দ.)-এর মাথার মতো একটি মাথা ছিল। সেটাই ছিলো হুসাইনের মাথা, রুগ্ন ও ক্ষীণকায় উঠের পিঠে বন্দিরা দৃশ্যমান হচ্ছিল। আমি একজন নারী বন্দির নিকটবর্তী হয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আমি সকিনা, হুসাইনের কন্যা। আমি বললাম, আমি সাহল আপনার পিতামহ রাসূল (দ.)-এর সাহাবী। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে বলুন, আমি আপনার জন্য তা করব। তিনি নিদারুণ কষ্টের সঙ্গে অনুরোধ করলেন, হুসাইনের মাথা বহনকারীকে বলুন যাতে আমাদের থেকে বেশ দূরে থাকে। যেন লোকেরা তা দেখতে পায় এবং আমাদের আহলে বাইতকে দেখা থেকে বিরত থাকে। তাই আমি দৌড়ে ঘোড় সাওয়ারীর কাছে গেলাম। তাকে চার শ দিরহাম ঘুষ দিয়ে বন্দি নারীদের থেকে দূরে যেতে বললে সে তাই করল।

এই অবস্থার মধ্যে একজন সিরিয়ান বৃদ্ধ তার লাঠির উপর ভর করে বন্দিদের অমানবিক কষ্টের উপর সংকীর্ণ আত্মতৃপ্তি প্রকাশের জন্য ইমাম জয়নুল আবেদীনের নিকটবর্তী হয়ে বলল, আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি তোমাদের পরাভূত করেছেন এবং তোমাদের উপর বিজয়ের দ্বারা আমিরকে শক্তিশালী করেছেন। স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির কারণে ইমাম বুঝতে পারলেন যে বৃদ্ধ লোকটি শাসকগোষ্ঠির মিথ্যা প্রচারণার শিকার হয়েছে। যা তারা মহান আহলে বাইতের বিরুদ্ধে তাদের শাহী তখত মজবুত করার জন্য প্রচারণা চালিয়েছিল। তাই তিনি বৃদ্ধ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও বৃদ্ধ তুমি কি কুরআন অধ্যয়ন করনি?" সে বললো, 'হ্যাঁ'। তখন ইমাম বললেন–

> **"আর তোমরা জেনে রেখো, তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চামাংশ ও রাসূলের জন্য। নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং হক ও বাতিলের ফয়সালার দিন আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি তার প্রতি। যেদিন দুটি দল মুখোমুখি হয়েছে, আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"** (সূরা আনফাল-৪১)

এ আয়াত পড়নি? অবাক হয়ে বৃদ্ধ লোকটি হ্যাঁসুচক জবাব দিল। তখন ইমাম ঘোষণা করলেন। আয়াতে নিকটাত্মীয় বলতে যাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন আমরা হলাম তারা।

সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন,

"হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের নিকট থেকে অপবিত্রতাকে দূরে রাখতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"

অবাক না হয়ে বৃদ্ধ লোকটি জানাল যে, সে এই আয়াতও পড়েছে। তখন ইমাম বললেন, "একমাত্র আহলে বাইতই হলো তারা। যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রেখেছেন।"

এই সত্যই বৃদ্ধ লোকটির মানসিকতাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিলো এবং উমাইয়া শাসকদের আসল রূপ বুঝতে না পারার জন্য সে দিন দুঃখিত হলো। এমনকি তার জিহ্বার নতুন এ সত্যতায় আটকে গেল। তাই সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে ইমামকে প্রশ্ন করল- "দয়া করে বলুন আল্লাহর কসম করে বলুন। সত্যি কি আপনি তাদের একজন?" আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইমাম জবাব দিলেন, "আমি আমার পিতামহ রাসূলাল্লাহর (দ.) নামে কসম করে বলছি আমি তাদের একজন।" ক্ষণিক পূর্বে ইমামের সঙ্গে কৃত ব্যবহারের জন্য লোকটি দুঃখিত হলো। অনুশোচনায় সিক্ত হয়ে বৃদ্ধ লোকিট ইমামের হাতে অনবরত চুমু খেতে লাগল এবং ঘোষণা করলো, "যারা আপনাদের স্বজনকে হত্যা করেছে, আমি তাদের প্রত্যাখ্যান করছি।"

ইয়াজিদের দরবারে ইমাম হোসাইনের ছিন্ন মস্তক ও আহলে বাইত

'কামিলে বাহাই'-এর লেখক সাহল বিন সা'আদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী পরিবারকে সিরিয়ার প্রবেশ দ্বারে অপেক্ষায় রাখা হয় ৩ দিন। আর এ সময় শহরকে এভাবে সাজানো হচ্ছিল যে তা আগে আর কখনও দেখা যায়নি। পাঁচ লক্ষ সিরীয় পুরুষ ও মহিলা নতুন পোশাক পরেছিল, সঙ্গে ছিল তাম্বুরীন, করতাল এবং ঢাক, তারা নিজেদের প্রস্তুত করলো এবং তাদের দিকে এ গিয়ে এলো সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার এবং রবিউল আউয়াল মাসের ষোলতম দিন। শহরের ভিতর ছিল পুনরত্থান দিবসের মতো ভীড় এবং সেখানে জনগণ আনন্দ উল্লাস করছিল। অনেক মানুষের ভীড়ের কারণে অনেক কষ্টে দিনের শেষে তারা ইয়াজিদ বিন মাবিয়ার প্রাসাদের দরজায় পৌছাতে পারলো। মূল্যবান পাথরে সজ্জিত একটি সিংহাসনে ইয়াজিদের জন্য রাখা হয়েছিল এবং তার বাড়ি সাজানো হয়েছিল এবং সোনালি ও রুপালি চেয়ারগুলো তার সিংহাসনকে ঘিরে রাখা হয়েছিল। (স্মরণ রাখতে হবে রাজপ্রাসাদ, সিংহাসন এ ধরনের শান-শওকত ইসলামের শাসকদের জন্য কুরআন ও রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর সুন্নাহ মোতাবেক হারাম যা ইয়াজিদ ও তার পিতা বহু পূর্বেই ত্যাগ করেছিলো।)

ইয়াজিদ বাহিনীর লোকদের পবিত্র মস্তক ও আহলে বাইতদের প্রবেশ করতে বলা হলো। আর তারা তা পালন করলো। এরপর শিমার তার বক্তব্য শুরু করল ও বলল, "হে আমীরুল মুমিনীন, এ ব্যক্তি (ইমাম হোসাইন), সঙ্গে তার পরিবারের ১৮জন এবং তার অনুসারীদের ৬০জন আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাই আমরা তাদরে মুখোমুখি হলাম এবং তাদেরকে প্রস্তাব দিলাম সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অথবা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তারা আত্ম সমর্পণের উপরে যুদ্ধকে বেছে নিলো।"

এরপর বন্দিদের ইয়াজিদের কাছে আনা হল এবং তাঁর পরিবার তাঁর কন্যারা এবং আত্মীয়রা তখন কাদছিল ও আহাজারি করছিলো। ইমাম হোসাইনের

পবিত্র মস্তকটি ইয়াজিদের কাছে রাখা হলো। সাইয়েদা সকিনা বলেন, "আমি ইয়াজিদের চেয়ে কর্কশ কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি, না কোনো কাফের এবং মুশরিকের চেয়ে নিকৃষ্ট এবং তার চেয়ে বেশি অত্যাচারী।"

ইবনে আবুদ দুনিয়া বর্ণনা করেছে যে, যখন সে (ইয়াজিদ) তার লাঠিটি ইমাম হোসাইনের দাঁতগুলোর ভিতর ঢুকিয়ে দিলো তখন আবু বারযাহ আসলাম ইয়াজিদের পাশে বসা ছিল। সে বলল, "হে ইয়াজিদ, তোমার লাঠিটি এ মাথা থেকে সরিয়ে নাও। আল্লাহর শপথ রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর দিনগুলোতে আমি তাঁকে দেখেছি তার (ইমাম পাকের) দাঁতগুলোতে চুমু দিতে। যাহোক শেষ বিচারের দিনে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ হবে তোমার মধ্যস্থতাকারী। যেখানে হুসাইনের মধ্যস্থতাকারী হবেন মুহাম্মদ (দ.)।"

সিবতে ইবনে জাওযী, তার রা'দ বার মুতাসসিব আনীদ গ্রন্থে বলেছেন, লোকে অবাক হয় ইয়াজিদের নিকৃষ্টতা দেখে যে সে তার লাঠি দিয়ে ইমামের ঠোঁটগুলো ও দাঁতগুলোতে আঘাত করেছ এবং বলুট করেছে পবিত্র কাবা শরীফে কামান দাগে তাহলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে এভাবে আচরণ করার অনুমতি আছে? এটি কি ইসলামি আইনে বর্ণিত নেই যে ইসলামে বিদ্রোহীদের দাফন করতে হবে? এর পর তার এ উক্তি যে, আমার অধিকার আছে তাদেরকে কারাগারে বন্দি রাখার। লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত (যা সঠিক বলে সবাই গণ্য করেন) যখন ইমাম হোসাইনের মাথা মোবারক তার কাছে আনা হয় তখন তার উচিত ছিল একে সম্মান করা এবং এর জানাযার নামাজ পড়া এবং তা কোন ট্রেতে না রাখা এবং এতে তার লাঠি দিয়ে আঘাত না করা। যখন সে যা চেয়েছিল তা ইতোমধ্যেই অর্জন করেছে তার (ইমামের) মৃত্যুর মাধ্যমে।

ইয়াজিদের অপবিত্র সৈন্যরা ইমাম জয়নুল আবেদীন থেকে শুরু করে হযরত যয়নাব পর্যন্ত সকল বন্দিকে এমনকি শিশুদেরকে পর্যন্ত একই দড়িতে বেঁধেছিল। তারা তাদের এক লাইনে হাঁটতে বাধ্য করল এবং কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে তাঁকে চাবুক দিয়ে সজোরে আঘাত করত। এই লজ্জাজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বন্দিদের জালিম ইয়াজিদের সামনে হাজির করা হয়েছিল। ইমাম যয়নুল আবেদীন ইয়াজিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "রাসূল (দ.) আমাদের এমনাবস্থায় দেখতে পারবেন কি? তার অনুভুতি কেমন হবে?" ইমামের এই কথা জালিম ইয়াজিদসহ সবাইকে অবাক করে দিল। বন্দি আহলে বাইতের দিকে তাকিয়ে ইয়াজিদ প্রতারণা করে বলল, "ইবনে

মারজানার প্রতি শোক। যদি তোমাদের সঙ্গে তার কোন বাধন থাকত তবে সে কখনো এমন করতে পারতো না।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উবায়দুল্লাহর পিতা ছিল আবু সুফিয়ানের অবৈধ পুত্র। মাবিয়া তার তথাকথিত ফতোয়ার মাধ্যমে যিয়াদকে তার বৈধ ভাই হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করে এবং উবায়দুল্লাহর মা মারজানা ছিলো একজন কুখ্যাত পতিতা। সেই সুবাদে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ প্রকৃতপক্ষে একজন জারজ সন্তান ও ইয়াজিদের চাচাত ভাই ছিল। তাই ইয়াজিদের এ কথাগুলো ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, ইয়াজিদের নির্দেশেই প্রকৃতপক্ষে কারবালার এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

এরপর ইয়াজিদ, ইমাম জয়নুল আবেদীনের দিকে ফিরে বলল, "তো আলী ইবনে হুসাইন যেহেতু তোমার পিতা আমার বংশের সঙ্গে তার সৌহার্দ্যের ব্যাপারে মনোযোগী ছিল না। আমার অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং আমার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা করেছিল, তাই আল্লাহর তোমার পিতার সঙ্গে এমনটি করেছেন।" (অর্থাৎ তার সমস্ত জঘন্যতম কুকর্মের দায়দায়িত্ব আল্লাহর, নাউজুবিল্লাহ।)

ইমাম যয়নুল আবেদীন ইয়যিদের এই মিথ্যা বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আল কুরআনের মাধ্যমে জবাব দেন।

> **"জমিনে বরং তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোনো মুসিবত আপতিত হয় না,যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না করো তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোনো উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।** (সূরা হাদীদ, আয়াত-২২-২৩)

এই জবাব ইয়াজিদকে রাগান্বিত করে দিলে সে কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রতি উত্তরের চেষ্টা করে–

> **"মানুষের উপর যত বালা মুসিবত আপতিত হয় তা সে তার দুই হাতে অর্জন করে।"**

কুরআনের সুগভীর জ্ঞানের উৎস ইমাম বলেন, "এই আয়াতটি তাদের সম্পর্কিত যারা অন্যের উপর জুলুম করে, যারা মজলুম তাদের সম্পর্কিত নয়।"

ইয়াজিদের পূর্ব পুরুষরা ইমাম হুসাইনের পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে নাস্তানাবুদ হওয়ার তিক্ত স্মৃতি তার দৃশ্যপটে ছিল। তাই যখন সে রাসূল (দ.)-এর আহলে বাইতকে দৃশ্যত পরাজিত করল এবং ইমাম হুসাইনের পবিত্র মাথা তার সামনে পেশ করা হলো, তখন সে দারুণ উচ্ছ্বসিত ছিল সে তখন একটি কবিতা আবৃত্তি করল–

আজ যদি আমার বদরের[২০] পূর্ব পুরুষরা দেখতন
যাদের খাজরাজরা[২১] কণ্টক যন্ত্রণা দিয়েছিল।
তবে তারা উচ্ছ্বসিত হতেন।
আর বলতেন, তোমার হাত কখনো অবশ না হোক,
আমরা যেন তাদের নেতাদের হত্যা করেছি সত্যি এটা বদরের বদলা।
যদিও আসমান থেকে না এসেছে কোনো সংবাদ
আর না নাজিল হয়েছে ওহি।
আমি খন্দক অস্বীকার করতাম,
যদি আহমদের সন্তানদের থেকে এর প্রতিশোধ না নিতাম।

এই কবিতায় বর্ণিত ইয়াজিদের ধর্ম বিশ্বাস প্রমাণ করে যে সে প্রকৃত পক্ষে ধর্মদ্রোহী বা কাফির ছিল।

[২০] এই যুদ্ধে ইয়াজিদের পূর্বপুরুষা ইমাম হুসাইনের পিতা ও স্বজনদের হাতে নিহত হয়েছিল।
[২১] রাসূল (দ.)-এর আশ্রয় দাতা মদিনাবাসী।

ইয়াজিদের কবিতার প্রেক্ষিতে হযরত যয়নব বিনতে আলীর জবাব

সৈয়দা যয়নাব বলেন, সব প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালকের জন্য এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল এবং তাঁর বংশধরদের উপর। কত সত্যইনা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন–

> **"তারপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিনাম মন্দ হয়েছিল। কারণ তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিল এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।"** (সূরা রুম, আয়াত-১০)।

হে ইয়াজিদ! এখন তুমি পৃথিবীর পথ ও আকাশের দিগন্তকে আমাদের উপর বন্ধ করে দিয়েছ এবং কয়েদিদের মতো আমাদের তাড়িয়ে এনেছ। এতে তুমি কি মনে করো যে, তুমি আমাদের আল্লাহর কাছে বেইজ্জতি করেছ এবং তোমাকে প্রিয় করেছ? আর এর কারণে আল্লাহর কাছে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছ? আর তাই তুমি আমাদের নীচু মনে করে তাকাচ্ছ এবং অহঙ্কারী, আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত হচ্ছে এই ভেবে যে, পৃথিবী তোমার দিকে ফিরে এসেছে? তুমি মনে করেছ যে, তোমার কাজ গোছানো আর সার্বভৌমত্ব ও রাজ্য তোমার জন্য প্রীতিকর? মনে হচ্ছে তুমি ধীরে ধীরে সর্বশক্তিমান ও পবিত্র আল্লাহ তায়ালার কথাগুলো ভুলে গেছ। যারা অবিশ্বাসী তারা যেন মনে না করে যে তাদের আমরা যা দিচ্ছি তা তাদের জন্য কল্যাণকর, আমরা তাদের শুধু সময় দিই এজন্য যে তারা যেন গুনাহ থেকে বৃদ্ধি পায় আর তাদের জন্য আছে অপমানকর শাস্তি।

এটিই কি ন্যায় বিচারের সংস্কৃতি যে, তুমি তোমার পরিবারের নারীদের এবং নারী গৃহকর্মীদের পর্দার আড়ালে বসাবে আর রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর কন্যাদের বন্দি করবে। তাদের প্রদর্শনী বানাবে? তুমি তাদের হেযাব ছিনিয়ে নিবে আর বে-আব্রু করে রাখবে, আর শত্রুরা অন্যদের সামনে তাদের প্রদর্শন করে বেড়াবে এক শহর থেকে আরেক শহরে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরের অধিবাসীরা তাদের একনজর দেখবে এবং তাদের দিকে তাকাবে প্রত্যেক ঘনিষ্ট ও অঘনিষ্ট মানুষ, নিচু ও সম্মানিত লোকেরাও যখন থাকবে না পুরুষ অথবা নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তি।

কী তাকওয়া আমরা তাদের কাছ থেকে আশা করতে পারি যারা পরহেযগারদের (মুত্তাকী) কলিজা খেয়েছে (ইয়াজিদের দাদি হিন্দা হযরত হামাজার কলিজা খাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত) এবং যাদের গায়ে গজিয়েছে শহিদদের রক্ত (পান) থেকে। কীভাবে সে আমাদের প্রতি তার ঈর্ষা কমাবে, যে আমাদের আহলুল বাইতের দিকে তাকায় দাম্ভিকতা, শত্রুতা এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে এবং সে বীরত্বের সঙ্গে ঘোষণা করে যে, তারা আমাকে উচ্চ কণ্ঠে অভিনন্দন জানাত এবং বলত হে ইয়াজিদ, তোমার হাত দুটো যেন অবশ না হয়ে যায়, এরপর তুমি জান্নাতের সর্দার আবু আব্দুল্লাহর (ইমাম হোসাইন) দাঁতের দিকে মনোযোগ দিয়েছ এবং তাতে আঘাত করেছ তোমার হাতের কঞ্চি দিয়ে? এ রকম কেনইবা তুমি বলবেনা? তুমি আঘাতকে এর গভীরতম তলায় পৌঁছে দিয়েছ এবং আদি উৎসকে উপড়ে ফেলেছো রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর সন্তান ও আব্দুল মোত্তালিবের বংশ থেকে পৃথিবীর নক্ষত্রদের একজনের রক্ত ঝরানোর মাধ্যমে। এরপর তুমি উচ্চ কণ্ঠে তোমার পূর্বপুরুষদের সম্বোধন করেছ এবং কল্পনায় তাদের ডেকে এনেছ? খুব শীঘ্রই তুমিও তাদের শেষ পরিণতির সম্মুখীন হবে। আর তখন তুমি বলবে হায় যদি তুমি অবশ থেকে এবং বোবা থেকে তা হলে তো এ কথাগুলো বলতে হতো না এবং এমন পরিণতি হতো না।

হে আল্লাহ! আমাদের অধিকার তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিন এবং আমাদের উপর যারা অত্যাচার করেছে তাদের উপর প্রতিশোধ নিন এবং আপনার আযাব নাজিল করুন তাদের উপর যারা আমাদের রক্ত ঝরিয়েছে এবং আমাদের সাহায্য কারীদের হত্যা করেছে। আল্লাহর শপথ। তুমি তোমার নিজের চামড়া ছিড়েছ এবং নিজের মাংস টেনে ছিড়েছ এবং তুমি রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর সন্তানের রক্ত ঝরানোর এবং তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের পবিত্রতা লংঘনের বিরাট বোঝা নিয়ে তার সামনে যাবে এমন জায়গায় যেখানে আল্লাহ জড়ো করবেন তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়াদের এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করবেন তাদের মধ্যে যারা বিস্তৃত হয়েছিল আর তাদের কাছে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবেন।

> **"যারা তাদের ভাইদেরকে বলেছিল এবং বসেছিল, যদি তারা আমাদের অনুকরণ করত। তারা নিহত হত না। বল তাহলে তোমরা তোমাদের নিজ থেকে মৃত্যুকে দুরে সরাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"** (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৬৯)।

আল্লাহ তোমার উপর বিচারক হিসেবে যথেষ্ট এবং রাসূলাল্লাহ হবেন তোমার শত্রু এবং তিনি জিবরাঈলের সমর্থন পাবেন। খুব শীঘ্রই তোমার বাবা যে তোমাকে রাজ্য প্রস্তুত করে দিয়ে গেছে এবং তোমাদের মুসলমানদের ঘাড়ে বসিয়ে গেছে বুঝতে পারবে অত্যাচারীদের জন্য কত খারাপ জায়গা অপেক্ষা করছে।

কি খারাপ স্থানই না তুমি অর্জন করেছ এবং কী দুর্বল সামরিক বাহিনীই না তোমার। যা হোক, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে যখন আমি মনে করি তোমার স্থান অত্যন্ত নীচে এবং তোমার তিরস্কার খুবই বড় এবং এও চাই যে, তোমাকে অনেক তাচ্ছিল্য করি। কিন্তু চোখগুলো ফুলে উঠেছে এবং হৃদয়গুলো ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায়। সাবধান এটি আশ্চর্য যে, আল্লাহর কাছে মর্যাদবান ব্যক্তিদের দলটিকে হত্যা করবে মুক্তদের সেনাবাহিনী। যারা শয়তান। এ হাতগুলোই আমাদের রক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে এবং এ চোয়ালগুলোই আমাদের মাংস গোগ্রাসে গিলেছে। আর এগুলো হলো পবিত্র ও জ্যোতির্ময় লাশসমূহ যেগুলো এখন পাহারা দিচ্ছে নেকড়েরা এবং হায়েনাগুলো বার বার বালি ছিটিয়ে দিচ্ছে তাদের দেহের ওপর। আর এখন তুমি মনে করছ আমরা তোমার গনিমত।

> **"(সেদিন তাকে বলা হবে) এটি তোমার দুহাত যা পূর্বে প্রেরণ করেছে তার কারণে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।"** (সূরা হজ, আয়াত-১০)

আমি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করি শুধু তাঁর উপরেই নির্ভর করি। এরপর তুমি তোমার যে কোন ফাঁদ পাঁততে পারো এবং তোমার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন পদক্ষেপ নিতে পারো এবং চেষ্টা করে যাও যত চাও। আল্লাহর শপথ। তুমি কখনই আমাদের কথা মুছে ফেলতে পারবে না এবং ওহিকে আমাদের মাঝখান থেকে উৎখাত করতে পারবে না। আর না তুমি এ ঘটনার লজ্জাকে মুছে ফেলতে পারবে। তোমার অভিমত ভ্রান্তিপূর্ণ এবং তোমার দিনগুলো কম।

> **"আর তোমার দল ছত্রভঙ্গ থাকবে যে দিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে, জেনে রাখো যারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করে তাদের চেয়ে অধিক জালিম কে? তাদেরকে তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীগন বলবে তারাই তাদের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করেছিলো। সাবধান জালিমদের উপর আল্লাহর লানত।"** (সূরা হূদ, আয়াত-১৮)

সৈয়দা যয়নবের ইয়াজিদের ক্ষমতার প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জঃ

শেখ মুফীদ বর্ণনা করেছেন, সাইয়েদা ফাতেমা বিনতে হোসাইন থেকে যে, যখন আমরা ইয়াজিদের সামনে বসেছিলাম সিরিয়াবাসীদের মধ্যে লাল চেহারার একজন উঠে দাড়িয়ে বললো হে আমাদের আমীর আমাকে এ মেয়েটি উপহার দিন এবং এ বলার মাধ্যমে সে আমাকে বুঝাচ্ছিল, আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম এবং অনুমান করলাম যে একাজ তাদের জন্য সহজ। আমি আমার ফুফু যয়নবের কোলে সেঁটে রইলাম। তিনি অবশ্য জানতেন তা কখনো ঘটবে না। আমার ফুফু সিরিয় ব্যক্তিকে বললেন আল্লাহর শপথ তুমি মিথ্যা বলছো, আর তুমি তোমার নীচ প্রকৃতির প্রকাশ ঘটিয়েছ। তোমার এবং তার (ইয়াজিদের) কোনো ক্ষমতা নেই তা করার। ইয়াজিদ ক্রুদ্ধ হয়ে বললো তুমি মিথ্যা বলেছো, আল্লাহর শপথ আমার এ কাজ করার অধিকার আছে। সাইয়েদা যয়নব উত্তর দিলেন আল্লাহর শপথ আল্লাহ তোমাকে এ ক্ষমতা দেননি, যদি না তুমি আমাদের উম্মত পরিত্যাগ করো এবং অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করো। এ কথা শুনে ইয়াজিদের রাগ দ্বিগুণ হলো এবং সে চীৎকার করে বললো, 'তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলো? অবশ্যই তোমার বাবা ও তোমার ভাই-ই ধর্ম ত্যাগ করেছিল (নাউজুবিল্লাহ)।

সাইয়েদা যয়নব বললেন, তুমি যদি মুসলমান হয়ে থাকো এবং তোমার দাদা ও বাবা, তাহলে আল্লাহর ধর্মের সঠিক পথ পেয়েছো যা আমার বাবা ও আমার ভাইয়ের ধর্ম। এ কথা শুনে ইয়াজিদ বললো, হে আল্লাহর শত্রু (নাউযুবিল্লাহ) তুমি মিথ্যা বলেছো। সাইয়েদা যয়নব বললেন সার্বভৌমত্ব এখন তোমার আর তুমি জুলুমের মাধ্যমে গালি দিচ্ছে এবং যে কোনো ব্যক্তিকে তিরস্কার করছ তোমার শাসন ক্ষমতার শক্তি দিয়ে'। ইয়াজিদ এ কথা শুনে লজ্জা পেলো এবং চুপ করে রইলো। এই কথোপকথনে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজিদ ও তার পিতা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে হযরত আলী ও আহলে বাইতর ধর্মের কোন বিশেষ মর্যাদা তো নাইই বরং তারা সঠিকভাবে ঈমানদার নন। (নাউযুবিল্লাহ) আর উমাইয়ারা তা দীর্ঘকাল ব্যাপী মুসলিম সমাজে এটা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। যে কারণে এখন পর্যন্ত মুসলিম জন সমাজে আহলে বাইতগণ যে আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ধর্মের সংরক্ষক ও আদর্শ এবং তাদের ছাড়া ধর্মীয় জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জন হওয়া অসম্ভব এই ধারণা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ এটা জানে না এবং তাদেরকে জানতে দেওয়াও হচ্ছে না।

ইয়াজিদের দরবারে
ইমাম জয়নুল আবেদীনের ঐতিহাসিক ভাষন

বিহার আল আনওয়ার গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইয়াজিদ আদেশ দিল ইমাম হোসাইনের পরিবারকে এবং ইমাম যয়নুল আবেদীনকে একটি কক্ষে আটকে রাখতে যেখানে তারা নিজেদেরকে গরম ও ঠাণ্ডা করনে সে সময় পর্যন্ত যখন তাদের চেহারার মাংস ফেটে গিয়েছিলো। মালহুক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে ইয়াজিদ একজন দরবারী বক্তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে মিম্বরে উঠে ইমাম হোসাইন ও তাঁর পিতাকে গালিগালাজ করতে বলল।[২২] সেই বক্তা মিম্বরে উঠল এবং ইমাম আলী ও ইমাম হোসাইনকে গালিগালাজ করতে শুরু করলো এবং মাবিয়া ও ইয়াজিদের প্রশংসা করতে লাগল। ইমাম আলী বিন হোসাইন উচ্চ কণ্ঠে তাকে বললেন, "হে তুমি যে ওয়াজ করছ তুমি সৃষ্টিকর্তার ক্রোধ ডেকে আনছ। আর তোমার স্থান হলো জাহান্নামে।"

ইবনে সিনান খাফাদি বলেন, তোমরা মিম্বরে উঠে তাকে গালিগালাজ করছ। যার তরবারির মাধ্যমে মিম্বর পেয়েছ। তিনি আরো বলেন, হে উম্মত যারা অবিশ্বাসীতে (কাফির) পরিণত হয়েছ, যদিও তারা কুরআন তেলওয়াত করে যার ভেতরে রয়েছে তাদের জন্য তিরস্কার ও হেদায়েত। তোমরা মিম্বরে উঠে তাকে গালিগালাজ করছ, যার তরবারির মাধ্যমে মিম্বর পেয়েছ। তোমরা তোমাদের হৃদয় পূর্ণ করে নিয়েছ বদরের (যুদ্ধের) দিনগুলো থেকে। আর হোসাইনের শাহাদাত হলো লুকানো অনেক ধরনের বিদ্বেষের ফল।

এরপর তিনি ইয়াজিদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, তুমি কি আমাকে অনুমতি দিচ্ছ কিছু বলার জন্য, যা আল্লাহর জন্য সন্তুষ্টির এবং যারা উপস্থিত আছে তাদের জন্য হবে পুরস্কার। ইয়াজিদ তা প্রত্যাখ্যান করলো। কিন্তু জনতা বলল তাকে অনুমতি দিন মিম্বরে উঠার জন্য হয়তোবা আমরা তার কাছ থেকে মূল্যবান কিছু শুনতে পাব। ইয়াজিদ বলল, "যদি আমি তাকে অনুমতি দিই মিম্বরে উঠার জন্য সে তা থেকে নামবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না

[২২] যা মাবিয়ার আমল থেকে সরকারিভাবে একটি ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হিসেবে চালু করা হয়েছিল।

সে আমাকে ও আবু সুফিয়ানের বংশকে অপমাণিত করে।" জনতা বলল, "কিভাবে এ অসুস্থ যুবক তা করবে?" ইয়াজিদ বলল, "সে এমন এক পরিবার থেকে এসেছে যারা দুধের সঙ্গে প্রজ্ঞা পান করেছে।" জনতা তাকে চাপ দিতে থাকল যতক্ষণ না সে (ইয়াজিদ) তাতে রাজি হলো। ইমাম মিম্বরে উঠলেন, তিনি আল্লাহর হামদ ও তাসবিহ করলেন এবং বক্তৃতা দিলেন যা চোখগুলোকে কাঁদালো এবং হৃদয়গুলোকে কাঁপিয়ে দিল। এরপর তিনি বললেন, "হে জনতা আমাদেরকে (আহলে বাইতেদেরকে) ছয়টি গুণাবলি ও সাতটি মর্যাদা দেয়া হয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ১. জ্ঞান, ২. সহনশীলতা, ৩. উদারতা, ৪. বাগ্মিতা, ৫. সাহস, ৬. ঈমানদারদের অন্তরে আমাদের জন্য ভালোবাসা, যা আমাদের মাঝে উপস্থিত। আর আমাদের মর্যাদাগুলো হলো যে– ১. যে রাসূল দায়িত্বে আছেন তিনি আমাদের মাঝ থেকে, ২. সত্যবাদী (ইমাম আলী) আমাদের মাঝ থেকে, ৩. যিনি উড়েন (হযরত জাফর তাইয়ার) তিনি আমাদের মাঝ থেকে, ৪. আল্লাহর সিংহ এবং তাঁর রাসূলও আমাদের মাঝ থেকে, আর উম্মতের দুই সিবত আমাদের মাঝ থেকে। যারা আমাকে জানে তারা আমাকে জানেই, যারা আমাকে চেনেনা, আমি তাদের জন্য আমার বংশধারা ও পূর্বপুরুষদের পরিচয় প্রকাশ করছি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমাকে চিনতে পারে। হে জনতা, আমি মক্কা ও মিনার সন্তান, আমি যমযম ও সাফার সন্তান, আমি তার সন্তান যিনি কালো পাথর (হজরে আসওয়াদ) তুলেছিলেন তার কম্বলের প্রান্ত ধরে। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি সুন্দর করে পাজামা ও আলখাল্লা পরতেন, আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি কাবা তাওয়াফ করেছেন, সাঈ করেছেন, আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি হজ করছেন এবং তালবিয়া উচ্চারণ করেছেন, আমি তার সন্তান যাকে রাতের বেলা মসজিদুল আকসাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (মেরাজের সময়) আমি তার সন্তান, যাকে সিদরাতুল মুনতাহাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমি তার সন্তান যে–

"এরপর নিকটবর্তী হলো এবং স্থির ঝুলে রইল (সৃষ্টি ও সৃষ্টির মাঝে)"। (সূরা নজম, আয়াত-৮)

আমি তার সন্তান যে ছিল–

"দুই ধনুক পরিমাণ (পরস্পর মুখোমুখি) অথবা তার চায়েও কাছে।" (সূরা নজম, আয়াত-৯)

আমি তার সন্তান যাকে সর্বশক্তিমান ওহী দান করেছিলেন, যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আমি হোসাইনের সন্তান, যাকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছে, আমি আলীর সন্তান যিনি মুর্তাযা (অনুমোদন প্রাপ্ত) আমি মুহাম্মদ (দ.)-এর সন্তান যাকে বাছাই করা হয়েছিল, আমি ফাতেমাতুয যাহরার সন্তান, আমি সিদরাতুল মুনতাহার সন্তান, আমি শাজারতুন মুবারাকহ (বরকতময় গাছ)-এর সন্তান, আমি তার সন্তান, যার শোকে রাতের অন্ধকারে জ্বিনরা বিলাপ করেছিল, আমি তার সন্তান, যার জন্য পাখিরা বিলাপ করেছিল।

কামিলে বাহাঈ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, ইমাম যয়নুল আবেদীন ইয়াজিদকে বলেছিলেন যে, সে যেন তাকে জুম'আর দিন খোতবা দিতে দেয়। এতে সে রাজী হয়েছিল। জুমআর দিন ইয়াজিদ এক অভিশপ্তকে আদেশ করল মিম্বরে উঠতে এবং ইমাম আলী ও ইমাম হোসইনকে যত পারে গালি দিতে এবং খলিফা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের প্রশংসা করতে।[২৩]

অভিশপ্ত ব্যক্তিটি মিম্বরে উঠে তার যা ইচ্ছা বললো। তখন ইমাম যয়নুল আবেদীন বললেন আমাকে অনুমতি দাও খোতবা দেওয়ার জন্য। ইয়াজিদ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অস্বীকার করলো এবং তাকে অনুমতি দিলো না। জনতা চাপ প্রয়োগ করলো। কিন্তু সে অনুমতি দিল না, যতক্ষণ না তার নাবালক সন্তান মুয়াবিয়া বললো হে বাবা তার খোতবা দেয়ার জন্য অনুমতি দিন। ইয়াজিদ বললো, তুমি তাদের কাজ সম্পর্কে জানো না, তারা প্রজ্ঞা ও বাগ্মীতা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। আর আমি আশঙ্কা করি তার খোতবা হয়তো বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে পারে এবং আমাদের মাথার উপরে ঘুরতে পারে। এই মহান শিশুর চাপাচাপিতে ইয়াজিদ ইমামকে বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি দিল।[২৪]

ইমাম মিম্বরে উঠলেন এবং বলতে শুরু করলেন, "প্রশংসা আল্লাহর যার কোনো শুরু নেই এবং যিনি চিরস্থায়ী যার কোনো শেষ নাই। তিনি সবার প্রথমে যার কোনো শুরু নাই এবং তিনি সবার শেষে যার শেষের কোনো শেষ নেই। সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে শুধু তার সত্তা ছাড়া। তিনি দিন ও রাতের পরিমাণ নির্ধারন করেন। পরিণতি প্রস্তুত করেন এবং বরকতময় আল্লাহ

[২৩] স্মরণ রাখতে হবে মাবিয়া হযরত আলীর গালিগালিজ ও প্রথম দুই খলিফার মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য বহু মিথ্যা হাদিস রচনা করার ব্যবস্থা করে যা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়।

[২৪] উল্লেখ্য ইয়াজিদের অভিশপ্ত মৃত্যুর পর তার পুত্র উমাইয়াদের অভিশপ্ত সিংহাসনে বসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

তিনিই একমাত্র বাদশাহ, সর্বজ্ঞানী। এরপর সহনশীলতা, উদারতা, বাগ্মিতা, সাহস এবং বিশ্বাসীদের অন্তরে ভালোবাসা। আর আমাদের মর্যাদা হলো যে রাসূল দায়িত্বে আছেন তিনি আমাদের মাঝ থেকে। এছাড়া শহীদদের সর্দার (হামজা) এবং জাফর যিনি বেহেশতে উড়েন এবং উম্মতের দুই সিবত (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন আমাদের মাঝ থেকে এবং মাহ্দীও যিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন।"

এরপর তিনি আহলে বাইতের জন্মগত অসাধারণ বৈশিষ্ট ও মর্যাদার বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করে বলেন, "আমি সন্তান তার যাকে রক্তে ও বালিতে মাখা হয়েছে, আমি সন্তান তার যার জন্য জ্বিনরা বিলাপ করেছে রাতের অন্ধকারে। আমি তার সন্তান তার যার জন্য পাখিরা শোক পালন করেছে।

বক্তৃতার এ পর্যায়ে পৌঁছল জনতা কাঁদতে ও বিলাপ করতে শুরু করল এবং ইয়াজিদ আশঙ্কা করল এতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যেতে পারে। সে মুয়াযযিনকে ডেকে বলল, "নামাজের ঘোষণা দাও।" মুয়াযিযন উঠল এবং বলল, "আল্লাহু আকবর।" ইমাম বললেন, "আল্লাহ শ্রেষ্ঠতর এবং সর্বোত্তম সবচেয়ে সম্মানিত এবং সবচেয়ে দয়ালু তার চেয়ে যা আমি ভয় করি এবং যা আমি এড়িয়ে যাই।" এরপর সে বলল, "আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" ইমাম বললেন, "নিশ্চয়ই আমিও সাক্ষী দিচ্ছি অন্যদের সঙ্গে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এবং তিনি ছাড়া কোন মালিক নেই। আর আমি প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে প্রত্যাখ্যান করি।" যখন সে বলল, "আমি সাক্ষী দিচ্ছি মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর রাসূল"। ইমাম নিজের মাথা থেকে পাগড়ী নামিয়ে নিলেন এবং মুয়াযযিনের দিকে ফিরে বললেন, "আমি এ মুহাম্মদ (দ.)-এর নামে অনুরোধ করছি এক মুহূর্ত নীরব থাকার জন্য।" এরপর তিনি ইয়াজিদের দিকে ফিরে বললেন, "হে ইয়াজিদ, এ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ রাসূল কি আমার প্রপিতামহ নাকি তোমার? যদি তুমি বল যে, তোমার প্রপিতামহ তাহলে গোটা পৃথিবী জানে তুমি মিথ্যা বলছ। আর যদি বল যে, তিনি আমার প্রপিতামহ, তাহলে কেন তুমি আমার পিতাকে জুলুমের মাধ্যমে হত্যা করেছ এবং তাঁর মালপত্র লুট করেছো এবং তাঁর নারী-স্বজনদের বন্দি করেছে?" এ কথা বলে ইমাম নিজের জামার কলার ছিড়ে ফেললেন ও কাঁদলেন। এরপর বললেন, "আল্লাহর শপথ এ পৃথিবীর উপরে আমি ছাড়া কেউ নেই যার প্রপিতামহ হলেন রাসূলাল্লাহ (দ.), কেন এ লোকগুলো আমার পিতাকে জুলুমের মাধ্যমে হত্যা করেছে এবং আমাদেরকে রোমানদের মতো

বন্দি করেছে?" এরপর বললেন, "হে ইয়াজিদ, তুমি এটা করে আবার বলছ যে, মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর রাসূল এবং তুমি কিবলার দিকে মুখ ফিরাও, অভিশাপ তোমার উপর ঐ দিন যে দিন আমার প্রপিতামহ এবং পিতা তোমার উপর ক্রোধান্বিত হবেন।" এ কথা শুনে ইয়াজিদ মুয়াযযিনকে নামাজের ইকামত দিতে বলল। লোকজনের ভেতর গুঞ্জন উঠল এবং তাদের ভেতর একটি তোলপাড় শুরু হলো। এরপর একটি দল তার সঙ্গে নামাজ পড়ল এবং অন্যরা পড়ল না এবং ছত্র ভঙ্গ হয়ে চলে গেল।

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনকে হত্যার ষড়যন্ত্রঃ

মাসউদীর ইসবাত আল ওয়াসিয়াহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যখন ইমাম হোসাইনকে শহীদ করা হলো। ইমাম যয়নুল আবেদীনকে তাঁর পরিবারসহ ইয়াজিদের সামনে আনা হলো তখন ইয়াজিদ ইমাম পাকের দিকে তাকাল ও বলল, "হে আলী, তুমি কি দেখছো?" ইমাম জবাব দিলেন, "তাই যা সর্বশক্তিমান ও সর্ব পবিত্র আল্লাহ নির্ধারণ করেছিলেন আকাশগুলো ও পৃথিবী সৃষ্টির আগে।" এরপর ইয়াজিদ উপস্থিত সভাসদের কাছে আহলে বাইতদের সম্মানিত সদসদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ব্যাপারে তাদের মতামত জানতে চাইলে একজন এমন জঘন্য কথা বললেন যা বলা ও লিখা উচিত নয়। তবে ইয়াজিদ গং রাতেই মহান সদস্যদের হত্যা করার ব্যাপারে একমত পোষণ করল। এ প্রসঙ্গে ইমাম বাকের আল্লাহর হামদ ও তাসবিহ করার পর বললেন, "তারা তোমাকে মতামত দিয়েছে ফেরাউনের পরিষদবর্গের মতামতের উল্টোটা। যখন ফেরাউন নবী মুসা (আ.) ও নবী হারুন (আ.) সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়েছিল, তারা বলেছিল, তাকে ও তার ভাইকে ছেড়ে দিন। অথচ এ লোকগুলো মতামত দিয়েছে যে তোমার উচিত আমাদেরকে হত্যা করা। আর এর একটি কারণ আছে।" ইয়াজিদ জিজ্ঞেস করলো, "কী কারণ?" ইমাম উত্তর দিলেন, "তারা ছিল ভদ্র নারীর সন্তান, আর এরা হলো অনৈতিক চরিত্রের নারীদের সন্তান। কারণ একমাত্র জারজ সন্তানরা ছাড়া কেউ নবীদের ও তাদের বংশধরদের হত্যা কওে না।" এ কথা শুনে ইয়াজিদ মাথা নীচু করল।

মাদায়েনির মানাক্বিব-এ বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম যয়নুল আবেদীন তার পরিচয় জনতার কাছে তুলে ধরলেন তখন তারা বুঝতে পারলো যে, এরা হলেন রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর বংশধর। ইয়াজিদ তার একজন জল্লাদকে আদেশ

দিল ইমামকে ছোট একটি বাগানের নিয়ে হত্যা করতে এবং সেখাইে দাফন করতে। জল্লাদ ইমামকে বাগানে নিয়ে গেল এবং একটি কবর খুড়তে শুরু করল। ইমাম যয়নুল আবেদীন দোয়া পড়তে শুরু করলেন এবং যখন জল্লাদ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো গায়েব থেকে একটি হাত আবির্ভূত হলো এবং জল্লাদকে পাকড়াও করলো এবং তাকে মুখ নিচু করে মাটিতে ফেলে দিল। সে চিৎকার করতে শুরু করলো এবং চেতনা হারাল। ইয়াজিদের সন্তান খালিদ জল্লাদের কণ্ঠ শুনতে পেল এবং তাকে উদ্ধার করতে গেলো। কিন্তু দেখতে পেল তার মৃত্যু হয়েছে। সে তার বাব ইয়াজিদকে সংবাদ দিল। সে আদেশ দিল জল্লাদকে ঐ কবরেই কবর দিতে বলল।

যে কারাগারে ইমাম যয়নুল আবেদীনকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেটি আজ মসজিদে পরিণত হয়েছে। 'বাসায়ের' গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন, যখন ইমামকে অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে ইয়াজিদের কাছে আনা হলো সে তাদেরকে একটি জরাজীর্ন বাড়িতে থাকতে দিলো। বন্দিদের একজন বলেন যে, আমাদেরকে ঐ বাড়িতে রাখা হয়েছিল যেন তা আমাদের মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে এবং আমরা মারা যাই। প্রহরীরা রোমান ভাষায় পরস্পরকে বলল, দেখো তাদেরকে তারা ভয় পাচ্ছে বাড়িটা তাদের উপর ভেঙ্গে পড়বে অথচ আগামীকাল তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। ইমাম যয়নুল আবেদীন বলেছেন যে, "তাদের মধ্যে আমি ছাড়া কেউ তাদের রোমীয় ভাষা বুঝতে পারেনি।" বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম যয়নুল আবেদীনকে ইয়াজিদের কাছে আনা হলো সে চাইল তাকেও হত্যা করতে। ইয়াজিদ ইমাম পাককে তার সামনে দাঁড় করাল এবং তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলো তার কাছ থেকে একটি উত্তর পাওয়ার জন্য যেন এর বাহানায় তাকে হত্যা করতে পারে। ইমাম তার সঙ্গে সাবধানতার সঙ্গে কথা বললেন এবং যাতে তাসবিহ রেখেছিলেন এবং এতে তিনি আঙ্গুল নাড়ছিলেন তার সঙ্গে কথা বলার সময় ইয়াজিদ বলল, "আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি আর তুমি তসবিহ পড়ে? একাজ কিভাবে অনুমোদনযোগ্য।" ইমাম উত্তর দিলেন, "আমার পিতা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলাল্লাহ (দ.) ফজরের নামাজ শেষ করতেন তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। তাসবিহ হাতে না নিয়ে। এরপর বলতেন, হে আল্লাহ আমি সকালে পৌঁছেছি এবং আপনার তাসবিহ করছি, আপনার প্রশংসা করছি এবং তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবর) আবৃত্তি করছি এবং আপনার মর্যাদা ঘোষণা করছি

তাসবিহর গোটা ঘোরানোর সমপরিমানে। এরপর তিনি হাতে তাসবিহর গোটা সরাতেন এবং যার সঙ্গে ইচ্ছ কথা বলতেন এবং আল্লাহর প্রশংসাও করতে থাকতেন। এরপর তিনি বলতেন, তাসবিহর পুরস্কার ব্যক্তির প্রাপ্য পর্যন্ত এবং তিনি যখন বিছানায় যেতেন তখনও তিনি তা আবৃত্তি করতেন এবং তাসবিহকে মাথার নীচে রাখতেন এবং পুরস্কার তার জন্য গননা হবে সকাল পর্যন্ত। আর আমি আমার পিতামহের অনুসরণ করছি।" ইয়াজিদ বার বার বলল, "তোমাদের মধ্যে আমি যাকেই যা বলি তোমরা উত্তরে বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হও।"

মানাকিব ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে যে, ইয়যীদ সাইয়েদা যয়নাবের দিকে তাকালেন যেন তিনি কথা বলেন, কিন্তু তিনি ইমাম আলী বিন হোসাইনের দিকে ইশারা করলেন এ বলে যে, "সে আমাদের অভিভাবক এবং আমাদের কওমের বক্তা (প্রতিনিধি)।

ইমাম সাজ্জাদ বললেন, "আমাদের জন্য সম্পদের লোভ এবং লালসা তোমার হৃদয়ে রেখো না। যেন তুমি আমাদের পুরস্কৃত করো এবং যেন আমরা তোমাকে সম্মান করি এবং যেন তুমি আমাদের উপর অত্যচার করো আমরা তোমার প্রতি অত্যাচারকে দূরে সরিয়ে দিই। আল্লাহ সাক্ষী যে, আমরা তোমাকে পছন্দ করি না, না আমরা ঘৃণা করি যে তুমি আমাদের পছন্দ করো না।" ইয়াজিদ বললো হে বৎস, "তুমি সত্যি বলেছ; বরং তোমার বাবাও দাদা সার্বভৌমত্ব (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) চেয়েছিল। সব প্রশংসা আল্লাহর যে তিনি তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তাদের রক্ত ঝরিয়েছেন।" ইমাম উত্তর দিলেন, "নবুয়ত (বেলায়েত) ও ইমামত (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তথা খিলাফত) সব সময়ই আমার পিতাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তোমার জন্মেরও বহু আগে থেকে। এই বিষয়টিই গাদীরে খুমে রাসূল (দ.) আল্লাহর নির্দেশে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তা প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই মুসলিম জাতি আজ পর্যন্ত এর কুফল ভোগ করছে।"

সকিনা বিনতে ইমাম হোসাইনের স্বপ্নঃ

শাইখ ইবনে নিমা বর্ণনা করেছেন যে, সাইয়েদা সকিনাহ দামেস্কে স্বপ্নে দেখেছেন যে, "পাঁচটি আলোকিত ঘোড়া সামনে এগিয়ে এলো এবং প্রত্যেকটির উপর একজন সম্মানিত ব্যক্তি বসে আছেন এবং ফেরেশতারা

তাদেরকে সব দিক থেকে ঘেরাও করে আছে এবং বেহেশতের একজন নারী কর্মীও তাদের সঙ্গে আছে। যারা ঘোড়ায় বসে আছেন তারা আরও এগিয়ে এলেন, আর নারী কর্মীটি আমার দিকে এলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তোমার প্রপিতামহ তোমাকে সালাম পাঠিয়েছেন।" আমি উত্তর দিলাম, "রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর উপর সালাম। আপনি কে?" তিনি বললেন, বেহেশতের নারী কর্মীদের একজন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারা কারা যারা সম্মানিত ঘোড়াগুলোর পিঠে বসে এখানে এসেছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "তারা হলেন আদম সিফওয়াতুল্লাহ (বাছাইকৃত) দ্বিতীয়জন হলেন ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) তৃতীয়জন হলেন মুসা কলিমুল্লাহ (যিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন) এবং চতুর্থজন হলেন ঈসা রুহুল্লাহ (যার রুহ আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত)।" আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে, "যিনি নিজের দাড়ি ধরে আছেন এবং পড়ে যাচ্ছেন (শোকে) এবং আবার উঠছেন।" তিনি বললেন, "তিনি তোমার দাদা রাসূলাল্লাহ (দ.)।" আমি বললাম, "তাঁরা যাচ্ছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "তারা তোমার পিতা হোসাইনের দিকে যাচ্ছেন।" আমি তার দিকে দৌড়ে গেলাম। এটি জানানোর জন্য যে অত্যাচারীরা আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছে তার মৃত্যুর পর। ঐ মুহূর্তে পাঁচটি উঠের হাওদা এলো এবং এদের প্রত্যেকটিতে একজন নারী বসেছিলেন। "আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ নারীরা কারা যারা এই মাত্র এলেন?" তিনি বললেন, "প্রথম জন হাওয়া (আ.), যিনি মানব জাতির মা, দ্বিতীয়জন আসিয়াহ (আ.) যিনি মাযাহিমের কন্যা (ফেরাউনের স্ত্রী), তৃতীয় জন মারইয়াম (আ.) যিনি ইমরানের কন্য (নবী ঈসার মা), চতুর্থ জন উম্মুল মুমেননি খাদিজা আত-তাহিরা যিনি খুয়াইলিদের কন্যা, (রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর প্রথম ও প্রধান স্ত্রী ও ফাতেমার মা) এবং পঞ্চম জন যার হাত মাথায় রাখা এবং যিনি পড়ে যাচ্ছেন এবং আবার উঠছেন। তিনি আপনার দাদী ফাতেমা। যিনি রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর কন্যা। আপনার পিতার মা।" আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ আমার উচিত তার কাছে বর্ণনা করা তারা আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছে। এ কথা বলে আমি তার সামনে বসলাম এবং বললাম, "হে প্রিয় মা, তারা আমাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে, হে প্রিয় মা আল্লাহর শপথ তারা আমার পিতা হোসাইনকে হত্যা করেছে।" তিনি জবাব দিলেন, "হে সকিনা, চুপ করো। তুমি আমার কলিজা পুড়ে ফেলেছ এবং আমার হৃৎপিণ্ডের সংযোগ কেটে ফেলেছ। এ হলো তোমার বাবা হোসাইনের মাথা, যা আমি সংরক্ষণ

করছি যতক্ষণ না আমি এটি নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।" এরপর আমি ঘুম থেকে উঠলাম এবং তা গোপন রাখতে চাইলাম কিন্তু তা আমার ঘনিষ্ট আত্মীয়দের কাছে বলে ফেললাম এবং তা জনগণের মাঝে প্রচার হয়ে গেল।

ইয়াজিদের স্ত্রীর স্বপ্নঃ

বিহার আল আনওয়ার গ্রন্থে ইয়াজিদের স্ত্রী হিন্দা থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি বিছানায় শুয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে বেহেশতের দরজাগুলো খুলে গেলো এবং ফেরেশতারা একজনের পর একজন অবতরন করলো ইমাম হোসাইনের মাথার কাছে এবং তাদের অভিবাদন জানালো। সে মুহূর্তে একটি মেঘ হাজির হলো যার উপরে কিছু মানুষ বসে ছিলেন এবং এদের মাঝে একজনের চেহারা ছিল আলোকিত। তিনি ইমাম হোসাইনের মাথার দিকে দৌড়ে গেলেন এবং তার দাঁতগুলোকে চুমু দিয়ে বললেন, "হে আমার সন্তান তারা তোমাকে হত্যা করেছে, আর তুমি কি মনে করো তারা তা করেছে তোমাকে না চিনেই? এছাড়া তারা পানির কাছে যাওয়ার পথকে তোমার জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলো। হে প্রিয় সন্তান, আমি তোমার নানা, রাসূলাল্লাহ (দ.), এ হলো তোমার পিতা আলী মুরতাযা, এ হলো তোমার ভাই হাসান, এরা হলো তোমার দুই চাচা জাফর ও আকীল। আর ওরা হলো হামযা ও আব্বাস (নবীর চাচা)।" এ কথা বলে তিনি তার পরিবারের প্রত্যেকের নাম বললেন, হিন্দা বলেছেন যে, "আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম ভয় নিয়ে এবং দেখলাম ইমাম হোসাইনের মাথার চারপাশে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এরপর আমি ইয়াজিদকে সবকথা বললাম। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনার কারণে ইয়াজিদ পরবর্তীতে আহলে বাইতদের উপর কিছুটা নমনীয় আচরণ করে। যখন সকাল হলো ইয়াজিদ ইমাম হোসাইন পরিবারকে ডেকে পাঠাল এবং বললো, "তোমরা কী চাও?" তারা বললেন, "প্রথমে আমরা চাই ইমাম হোসাইনের উপর শোক পালন করতে ও কাঁদতে।" সে উত্তর দিলো, "তোমরা চাইলে তা করতে পারো।" তখন কিছু বাড়িঘর তাদের জন্য খালি করা হলো এবং বনি হাশিম ও কুরাইশের নারীরা কালো পোশাক পড়লেন এবং ইমাম পাকের জন্য সাত দিন শোক পালন করলেন।

ইয়াজিদের দরবারে ইহুদী রাব্বীর ঘটনাঃ

আল্লামা মাজলিসি তার বিহার আল আনওয়ার গ্রন্থে সিরিয়ার মিম্বর থেকে ইমাম আলী যয়নুল আবেদীনের খোতবা উল্লেখ করার পর বলেন যে, সে সময় এক ইহুদী রাব্বি (ধর্মীয় নেতা) ইয়াজিদের সামনে বসেছিল, সে বললো, "হে ইয়াজিদ এ যুবকটি কে?" ইয়াজিদ বললো, "আলী বিন আবি তালিবের সন্তান।" রাব্বি জিজ্ঞেস করলো, "কে তার মা?" ইয়াজিদ বললো, "ফাতেমা, মুহাম্মদের কন্যা।" এ কথা শুনে সে রাব্বি বললো, "সুবহানাল্লাহ, সে তোমার রাসূলের নাতি আর তুমি তাকে এতো শীঘ্র হত্যা করলে? কত খারাপই না আচরণ করেছো তার সন্তানের সঙ্গে তার মৃত্যুর পর। আল্লাহর শপথ। যদি মুসা বিন ইমরানের ঔরস থেকে কোনো নাতি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকতো আমরা বিশ্বাস করি আমরা আমাদের রবের সমান তার ইবাদত করতাম। (স্মরণ রাখতে হবে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধিদের প্রতি এ ধরনের সম্মান করা সকল ধর্মেরই শিক্ষা)। তোমাদের নবী গতকাল তোমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। আর আজ তোমরা তার সন্তানের উপর আঘাত করছ এবং তাকে হত্যা করেছ। কত খারাপ জাতিই না তোমরা।" এ কথা শুনে ইয়যীদ আদেশ দিল তার কণ্ঠনালী তিনবার চেপে ধরতে। রাব্বি উঠে দাড়িয়ে বললো, "তুমি যদি চাও আমাকে হত্যা করতে তাহলে করো। যদি চাও মুক্ত করে দাও এবং যদি চাও আমাকে আঘাত করো। আমি তওরাতে পড়েছি যে নবীর সন্তানকে হত্যা করে সে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন অভিশপ্ত থাকবে এবং যখন মরবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন যে, ইবনে লাহীয়াহ বর্ণনা করেছে আবুল আস ওযাদ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান থেকে যে বলেছে যে, বা'স আল জালুত আমার কাছে এলো এবং বললো, "নবী দাউদ ও আমার সঙ্গে ৭০জন পিতামহের দূরত্ব আছে আর এ কারণে ইহুদীরা আমাকে সম্মান করে। অথচ তোমরা তোমাদের নবীর সন্তানকে হত্যা করলে যখন তাদের মাঝে যুক্তকারী (পিতা বা মাতা) শুধুমাত্র একজন।"

ইয়াজিদের দরবারে রোমের বাদশাহর প্রতিনিধির হত্যাকাণ্ডঃ

ইমাম যয়নুল আবেদীন বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইমাম হোসাইনের মস্তক মোবারক ইয়াজিদের কাছে নিয়ে আসা হলো, সে মদ পানের একটি আসর করার আদেশ দিল। পবিত্র মাথাটি এনে তার সামনে রাখা হলো এবং সে এর কাছেই মদ পান শুরু করলো। একদিন রোমের বাদশাহর একজন প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, "হে আরব বাদশাহ, এটি কার মাথা।" ইয়াজিদ জবাব দিল, "তোমার দরকার কি?" সে বললো, "যখনই আমি বাদশাহর কাছে ফেরত যাই তিনি আমার কাছে সবকছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যা আমি এখানে দেখতে পেয়েছি। তাই এর সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাটি তার কাছে বর্ণনা করা হবে আমার জন্য আনন্দের। যেন তিনিও আপনার আনন্দ ও উল্লাসে আপনার সাথি থেকে পারেন।" ইয়াজিদ বললো, "এ মাথাটি হলো হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালিবের।" রোমীয় ব্যক্তিটি বললো, "তার মা কে?" ইয়াজিদ উত্তর দিল, "ফাতেমা আল্লাহর রাসূলের কন্যা।" খৃস্টান ব্যক্তিটি বললো, "আক্ষেপ আপনাদের ও আপনাদের ধার্মিকতার বিষয়ে। আমার ধর্ম আপনার ধর্মের চেয়ে উত্তম। আমার পিতা দাউদ (আ.)-এর বংশধর এবং অনেক পূর্বপুরুষ আমাদের মাঝে অবস্থান করছে। তারপরও খৃস্টানরা এর জন্য আমাকে সম্মান করে এবং আমার পায়ের ধুলা সংগ্রহ করে সৌভাগ্যের জন্য এ কথা বলে যে, আমি দাউদ (আ.) বংশধর। অথচ আপনারা আপনাদের নবীর নাতিকে হত্যা করেছেন যখন এদের মাঝে দূরত্ব শুধু একজন মাতা? আপনাদের মাঝে এটি কোন ধরনের ধার্মিকতা?" এরপর সে আরো বলল, "হে ইয়াজিদ, আপনি কি 'কানীসায়ে হাফির' এর ঘটনা শুনেছেন?" ইয়াজিদ বলল বলো, "যেন তা আমি শুনি।" সে তখন ঐ খৃস্টানদের ঘটনা বর্ণনা করল, যারা গাধার খুরগুলোকে সম্মান করতো, যেগুলোতে ঈসা (আ.)-এর সাথিরা আরোহন করেছিলো খৃস্টানদের অভিমত সেই গাধার খুরের বিষয়ে যা ঈসা (আ.)-এর সাথিরা পরিচালনা করতেন। অথচ আপনি আপনার নবীর নাতিকে হত্যা করেছেন? সর্বশক্তিমান আল্লাহ যেন আপনাকে কোনো প্রাচুর্য না দেন এবং তিনি যেন আপনার ধার্মিকতা গ্রহণ না করেন।" এ কথা শুনে ইয়াজিদ বললো, "এ খৃস্টান লোকটিকে হত্যা করো, যেন সে আমার রাজ্যে আমাকে অপমান না করে।" রোমান প্রতিনিধি বললো, "আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চান?" ইয়াজিদ 'হ্যা' বললো। রাষ্ট্রদূত বললো, "জেনে রাখো, আজ

রাতে আমি তোমার নবীকে স্বপ্নে দেখেছি যিনি আমাকে বলেছেন, হে খৃস্টান, তুমি বেহেশতের বাসিন্দাদের একজন'। আমি তার কথায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম কিন্তু আমি এখন বলছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর রাসূল।" এ কথা বলে সে উঠে দাঁড়ালো এবং ইমাম হোসাইনের মাথাটি তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো এবং তাতে চুমু দিলো যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে হত্যা করা হলো। (ইন্না লিল্লাহি ... রাজেউন)।

আহলে বাইতের অবস্থা সম্পর্কে ইমাম যয়নুল আবেদীনের মূল্যায়নঃ

একদিন ইমাম যয়নুল আবেদীন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং দামেস্কের বাজারে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন, মিনহাল বিন আমর তার দিকে এগিয়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "রাতটি আপনি কিভাবে কাটিয়েছেন হে রাসূলাল্লাহর (দ.) সন্তান।" ইমাম জবাব দিলেন, "আমাদের রাত ছিলো বনি ইসরাইলের মত। যারা ফেরাউনের জনগণের মধ্যে ছিল যাদের পুত্র সন্তানদের মাথা কেটে ফেলা হয়েছিল এবং নারীদের বন্দি করা হয়েছিলো। হে মিনহাল, অন্যদের মধ্যে আরবদের বিশেষ মর্যাদা ছিলো এ কারণে যে, মুহাম্মদ (দ.) ছিলেন একজন আরব এবং আমরা মুহাম্মদ (দ.)-এর পরিবার নিহত হয়েছি এবং এ রাতে ছত্রভঙ্গ হয়েছি, আমাদেরকে ঘৃণা করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে এবং বিতাড়িত হয়েছে, তাই এ রাতের উপর হে মিনহাল। ইন্না লিল্লাহি ... রাজেউন"

কারবালার ঘটনার দায়-দায়িত্ব নিরুপনঃ

ইয়াজিদের প্রতারণামূলক আচরণ ও মিথ্যাচার ও বিভিন্ন উমাইয়াপন্থীদের ইতিহাসের মাধ্যমে এ রকম ধারণা দেওয়া হয় যে, এই মহা দুঃখজনক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এ ব্যাপারে ইয়াজিদ দায়ী নয় বরং ইবনে যিয়াদের একক সিদ্ধান্তে এই ঘটনা ঘটে। ইবনে আসীর তার 'কামিল' গ্রন্থে ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছে যে, সিরিয়াতে সে মুসাফির বিন শুরেইহ ইয়াশকারীকে বলেছে যে, "আমি হোসাইনকে শুধু এ কারণে হত্যা করেছি যে ইয়াজিদ আমার কাছে চেয়েছিল যে, হয় আমি তাকে হত্যা করবো অথবা নিজেকে হত্যা করবো। আর আমি তাকে হত্যা করা বেছে নিলাম (অর্থাৎ হুসাইনকে হত্যা করে আমি আত্মরক্ষা করলাম)।"

পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ করার সম্পর্কে হযরত ইমাম জাফর সাদেকের ফতোয়াঃ

খালিদ বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সে বলেছে আমি ইমাম জাফর সাদিককে জিজ্ঞেস করলাম, "কোনো ব্যক্তি কি তার পিতা, ভাই অথবা আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যুর কারণে নিজের জামার কলার ছিঁড়তে পরে?" ইমাম বলেন, "এতে কোনো সমস্যা নেই। নবী মুসা (আ.) নিজের জামার কলার ছিড়ে ছিলেন তার ভাই হারুন (আ.)-এর মৃত্যুতে। একজন পিতা তার সন্তানের মৃত্যুতে একজন স্বামী তার স্ত্রীর মৃত্যুতে জামার কলার নাও ছিঁড়তে পারেন। কিন্তু একজন স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে পারেন।" এরপর আরও বললেন, "ফাতেমার পরিবার হোসাইনের জন্য জামার কলার ছিঁড়ে দিলেন এবং চেহারায় হাত দিয়ে চাপড় মেরেছিলেন এবং তিনি এতই মূল্যবান ছিলেন যে, তার মৃত্যুতে কলার ছেঁড়া এবং চেহারায় হাত দিয়ে চাপড় মারা উচিত ছিল"। ইমাম জাফর সাদিক আরো বলেন, "যে হাশেমী বংশের কোনো নারী চোখে কাজল বা চুলে কলপ ব্যবহার করতেন না। না তাদের ঘর থেকে রান্নার ধোঁয়া বেরিয়েছে পাঁচ বছর যাবত যতদিন না উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে হত্যা করা হলো।"

আহলে বাইতদের মদিনায় প্রত্যাবর্তন ও রাসূল (দ.)-এর নিকট অভিযোগ উপস্থাপন

ইমাম যয়নুল আবেদীন ইয়াজিদের নিকট তিনটি দাবি পেশ করলেন, প্রথমটি হলো যে, "তুমি আমাকে আমার অভিভাবক ও আমার পিতা ইমাম হোসাইনের চেহারা দেখাবে যেন আমি এর দিকে দৃষ্টিপাত করে পুরস্কার অর্জন করতে পারি। দ্বিতীয়টি হলো তুমি আমাদেরকে সে সব জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিতে পার, যা আমাদের কাছ থেকে লুট করা হয়েছে। তৃতীয়টি হলো যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে একজন ব্যক্তিকে পাঠান যেন সে আহলে বাইতদের নারীদেরকে তাদের প্রপিতামহের বাড়িতে পৌছে দিতে পারে।" ইয়াজিদ বলল, "তুমি তোমার বাবার চেহারা আর কখনো দেখতে পাবে না। তোমাকে হত্যার চিন্তাটি ইতোমধ্যে আমি পরিত্যাগ করেছি। তাই তুমি ছাড়া অন্য কেউ নারীদের সঙ্গে যাবে না। সে সব জিনিস তোমাদের কাছ থেকে লুট করা হয়েছে তা থেকে আমি বেশি দেব।" ইমাম যয়নুল আবেদীন বললেন, "তোমার কাছ থেকে কোনো সম্পদ চাই না তা তোমার প্রচুর থাকুক। আমি তোমার কাছ থেকে শুধু সে জিনিসগুলো চাই যা আমাদের কাছ থেকে লুট করা হয়েছে। যেমন রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর কন্যা মা ফাতেমা হাতে বোনা চাদরটি এবং তার বোরখা, গলার হার ও জামা।"

ইয়াজিদ সাইয়েদা উম্মে কুলসুমকে বলল, "এ সম্পদগুলো নাও ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে মুসিবত হয়েছে তোমাদের তার জন্য।" উম্মে কুলসুম উত্তর দিলেন, "কি লজ্জাহীন এবং কর্কশ মানুষ তুমি, তুমি আমার ভাই ও পরিবারের সদস্য হত্যা করেছ, এরপর এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে সম্পদ সাধছ? আল্লাহর শপথ তা কখনোই ঘটবে না।"

হাবীবুস সিয়ারের এ ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইয়াজিদ সবগুলো মাথা ইমাম জয়নুল আবেদীনের কাছে হস্তান্তর করেছিল এবং তিনি তা দেহগুলোর সঙ্গে একত্র করেছিলেন। সিবতে ইবনে জাওযী তার তাযকিরাহ গ্রন্থে বলেছেন যে, "মাথার কাফনের স্থান হিসেবে পাঁচটি সংবাদ এসেছে, ১. কারবালায়, ২. মদিনায় মায়ের কবরের কাছে, ৩. দামেস্কে, ৪. সিরিয়ায়

রিক্কাহর মসজিদে এবং ৫. কায়রো (মিশর)। এখানে হযরত ইমামের একটি সুদৃশ্য মাজার রয়েছে।"

জা-আল হক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যখন ইমাম পরিবার সিরিয়া ত্যাগ করলেন এবং ইরাকে পৌঁছলেন তাঁরা তাদের পথপ্রদর্শকদের বললেন, "আমাদেরকে কারবালার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাও।" এরপর তারা শাহাদাতের স্থানটিতে পৌছলেন, তারা দেখলেন হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারি ও সঙ্গে বণি হাশিমের একটি দল এবং রাসূলাল্লাহ (দ.) আত্মীয়রা ইমাম হোসাইনের মাজার জিয়ারতে এসেছেন। তারা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাত করল প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট নিয়ে এবং বিলাপ করে এবং নিজেদের চেহারায় আঘাত করতে। এরপর এক হৃদয়বিদারক শোকানুষ্ঠান শুরু হলো এবং আশে পাশের শহরগুলো থেকে নারীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তারা সবাই সেখানে কয়েক দিনের জন্য শোক পালন করলেন।

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন, বর্ণনাকারী বলেছে যে, "এরপর তারা কারবালা থেকে মদিনার দিকে রওয়ানা হলেন। বশীর বিন হাযলাম বলেন যে, যখন আমরা মদিনার কাছে পৌঁছলাম ইমাম যয়নুল আবেদীন যেখানে নেমে পড়লেন এবং তাঁবু গাড়লেন এবং নারীদেরকে বললেন নেমে আসতে। এরপর বললেন, "হে বশীর আল্লাহ যেন তোমার পিতার উপর রহম করেন, তিনি ছিলেন একজন কবি। তাহলে তুমিও কি শোকগাঁথা আবৃত্তি করো?" আমি বললাম, "জী, হে রাসূলাল্লাহ সন্তান, আমিও একজন কবি।" ইমাম বললেন, "তাহলে মদিনায় যাও এবং ঘোষণা করো আবু আব্দুল্লাহর শাহাদতের খবর"। আমি ঘোড়ায় চড়লাম এবং দ্রুত ঘোড়া ছোটলাম যতক্ষণ না মদিনায় পৌছলাম। যখন আমি রাসূলাল্লাহ (সা.)-এর মসজিদে পৌঁছলাম আমি কাঁদতে শুরু করলাম এবং উচ্চ কণ্ঠে বললাম, "হে ইয়াসরিবের (মদিনার) জনগণ, এখানে তোমাদের থাকার কোন জায়গা নেই, হোসাইনকে হত্যা করা হয়েছে তার কারণে আমার অশ্রু বইছে, তার দেহ পড়ে আছে কারবালার ধুলো ও রক্তে মাখামাখি হয়ে তার মাথা বর্শার আগায় রেখে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শন করা হয়েছে।"

এরপর বললাম ইনি হলেন আলী বিন হোসাইন। যিনি তোমাদের শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছেছেন তার সঙ্গে আছে তার ফুফুরা এবং বোনেরা। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি তার অবতরণের স্থানটির ঘোষণা দেই। এ কথা শুনে বোরখার ঢাকা সব নারীরা দৌড়ে বেরিয়ে এলেন কাঁদতে কাঁদতে।

আর আমি জীবনে কখনো এ রকম কান্না দেখিনি, না আমি এমন কিছু জানি যা ছিল মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে কষ্টকর। আমি একটি বালিকাকে কাঁদতে শুনলাম এ কথা বলে। তুমি আমার অভিভাবকের শাহাদতের সংবাদ এনেছ এবং শোকাহত করেছ এবং আমার অবস্থা খারাপ করে দিয়েছ, আর এ সংবাদ আমার হৃদয়কে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে তাই হে আমার চোখ দুটি প্রচুর অশ্রু ঝরাও অনবরত তার উপরে যার দুঃখের কারণে আল্লাহর আসমান ভেঙ্গে পড়েছে তার শাহাদাত উচ্চ মর্যাদাকে ধর্ম ও উষ্ণ আবেগকে ফুটো করে দিয়েছে, তাই রাসূলাল্লাহ (দ.) ও আলীর সন্তানদের জন্য কাঁদো, যদিও তার কবর অনেক অনেক দূরে।

এরপর বালিকাটি আমার দিকে ফিরে বলল, "হে মৃত্যুর সংবাদবাহক। আবু আব্দুল্লাহর জন্য তুমি আমাদের দুঃখকে নতুন করে আরম্ভ করেছ এবং তুমি আমাদের ক্ষতকে ঘষে দিয়েছ যা এখনো শুকায়নি। তোমার রব তোমার উপর রহমত করুন তুমি কে?" আমি বললাম, "আমি বশীর এবং আমার অভিভাবক ইমাম আলী বিন হুসাইন আমাকে পাঠিয়েছেন। আর তিনি নিজে এবং সঙ্গে আবু আব্দুল্লাহ আল হোসাইনের পরিবার অমুক স্থানে তাঁবু ফেলেছেন। তখন লোকজন আমাকে ছেড়ে ঐ জায়গার দিকে দৌড়াতে শুরু করল। এরপর আমি আমার ঘোড়ায় চড়লাম এবং ফেরত এলাম এবং দেখলাম জনগণ সব বড় রাস্তা ও গলি দখল করে ফেলেছে। আমি আমার ঘোড়া থেকে নামলাম এবং মানুষের ঘাড়ের উপর পা ফেলে ফেলে তাঁর পর্যন্ত পৌঁছলাম। ইমাম আলী বিন হোসাইন ভেতরে ছিলেন এবং তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন একটি রুমাল দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে একজন খাদেম তার পিছন পিছন এল একটি চেয়ার নিয়ে এবং তা মাটিতে রাখল এবং ইমাম এতে বসলেন। তার অশ্রু অনবরত ঝরতেছিল এবং পুরুষদের কান্নার কণ্ঠ উচু হলো এবং নারীরা বিলাপ করতে লাগল। এরপর জনগণ চর্তুদিক থেকে তাকে সমবেদনা জানাতে লাগল এবং ঐ জায়গায় এক ভয়ানক শোরগোল শুরু হলো।

মদিনায় ইমাম আলী যয়নুল আবেদীনের বক্তৃতাঃ

ইমাম তাদেরকে ইশারা করলেন চুপ করার জন্য এবং কান্নার আওয়াজ বন্ধ হলো। তিনি বললেন, "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, বিচার দিনের বাদশাহ সব সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা। সেই রবের শপথ যিনি অনুভবের আয়ত্তের

বাইরে এবং তিনি এতো কাছে যে তিনি তার বান্দাদের গোপন কথাগুলো শোনেন। আমি তার প্রশংসা করি এ মারাত্মক ঘটনা এবং যুগের বিপর্যয়গুলোর বিষয়ে এবং দুঃখের কঠিন মাত্রা এবং গভীর দুঃখজনক ঘটনাগুলোর তিক্ত স্বাদের সময়ে এবং বিরাট দুঃখ ও মহাশোকে হৃদয়বিদারক এবং বিপর্যস্তকারী দুঃখ কষ্টের ভেতরে।

হে জনগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ, যিনি প্রশংসার যোগ্য, আমাদেরকে পরীক্ষা করেছেন বিরাট দুঃখসমূহের মাধ্যমে যখন ইসলামের ভিতরে এক গভীর ফাটল প্রকাশিত হয়েছে। আবু আব্দুল্লাহ এবং তাঁর পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে, আর তার নারী স্বজনদের এবং অপরিণত সন্তানদের বন্দি অবস্থায় তাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। তার মাথাকে বর্শার আগায় রেখে শহরগুলোর রাস্তাগুলোতে প্রদর্শন করা হয়েছে, আর এ মহা বিপর্যয়ের কোনো তুলনা নেই।

হে জনতা, তোমাদের মধ্যে কারা তার মৃত্যুর পর আনন্দিত হবে এবং তোমাদের মধ্যে কাদের হৃদয় তার জন্য ছারখার হবে না? তোমাদের মধ্যে কার চোখ এর জন্য অশ্রু ফেলবে না এবং তোমাদের মধ্যে কে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে নিজের চেহারায় চাপড় না দিয়ে? সাতটি উচ্চ আকাশ তার শাহাদতে কেঁদেছে এবং নদীগুলো তাদের ঢেউসহ, আকাশগুলো তাদের স্তম্ভগুলোসহ পৃথিবী তার চারধারসহ এবং গাছপালাগুলো তাদের শাখাগুলোসহ, সমুদ্র ও এর গভীরের মাছেরা (আল্লাহর) নিকটবর্তী ফেরেশতারা এবং আকাশের বাসিন্দারাও তাঁর জন্য কান্নায় তাদের কণ্ঠ মিলিয়েছে।

হে জনতা! কোনো হৃদয় কি আছে যা তার শাহাদতের কারণে ছিঁড়ে যাবে না এবং কোনো বিবেক কি আছে যা এর কারণে পুড়ে যাবে না? এবং কোনো কান কি আছে যা বধির হয়ে যাবে না যখন তারা দেখে ইসলামের ভেতর এ ফাটল দেখা দিয়েছে।

হে জনতা, আমাদেরকে তাড়িয়ে নেয়া হয়েছে এবং রাস্তায় প্রদর্শন করা হয়েছে শহরগুলোর দূরবর্তী ও নিকটবর্তী জায়গাগুলোতে যেন আমরা ছিলাম তুর্কী অথবা কাবুলি লোকদের সন্তান, কোনো অপরাধ ছাড়াই অথবা কোনো খারাপ কাজ করা ছাড়াই। আর না আমরা তারা যারা ইসলামে ফাটল সৃষ্টি করেছি। কখনোই আমরা তা আমাদের প্রাচীন পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে

শুনিনি। এটি নতুন জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলাল্লাহ (দ.) আমাদের বিষয়ে সদুপদেশ না দিয়ে তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিতেন তাহলেও তারা আমাদের এর চেয়ে বেশি ক্ষতি করত না। যা তারা ইতোমধ্যেই করেছে।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন, কি কঠিন বেদনাদায়ক, মারাত্মক, দুঃখপূর্ণ হৃদয় বিদারক এবং তিক্ত দুর্যোগ ছিল, যা আমরা দেখেছি এবং সহ্য করেছি। আমরা আল্লাহর কাছে এর বিচারের ভার দিলাম, তিনি মহা ক্ষমতাবান, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

রাসূল (দ.)-এর মাজার শরীফে উম্মে কুলসুম ও অন্যান্যদের অভিযোগঃ

শাহাদতের ব্যাপারে কিছু বর্ণিত হয়েছে যে, সাইয়েদা কুলসুম মদিনায় পৌঁছলেন, তিনি রাসূল (দ.)-এর মাজারে গিয়ে বললেন, "হে আমাদের নানার শহর (মদিনা) আমাদেরকে গ্রহণ করো না, আমরা ফিরেছি দুঃখ-হতাশা সঙ্গে নিয়ে। সাবধান হও এবং রাসূলের কাছে বলো যে, আমাদেরকে কঠিন কষ্ট দেয়া হয়েছে আমাদের পিতার (প্রতি শত্রুতার) কারণে। আমরা যখন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, আমাদের সঙ্গে সবাই ছিল, কিন্তু এখন আমরা ফিরাই আমাদের পুরুষদের ও পুত্র সন্তানদের ছাড়া, আমরা যখন এখানে থেকে গিয়েছিলাম তখন আমরা সবাই একত্রে ছিলাম, এখন আমরা ফিরছি ক্ষতি নিয়ে ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র লুট হয়ে যাওয়া অবস্থায়। আমরা আল্লাহর নিরাপত্তায় ছিলাম এবং এখন ফিরছি আমাদের স্বজনদের বিচ্ছেদ নিয়ে। আমাদের মাওলা হোসাইন ছিলেন আমাদের নিরাপত্তা দানকারী ও সাহায্যকারী। আমরা ফিরেছি তাকে ধুলো মাখা অবস্থায় আর ফেলে রেখে। আমাদেরকে লুট করা হয়েছে এবং ধ্বংস করা হয়েছে এবং কোনো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানকারী ও সাহায্যকারী ছিল না আমরা আমাদের ভাইয়ের জন্য কাঁদছি, হে নানার শত্রুরা হোসাইনকে হত্যা করেছে এবং তারা আল্লাহর কাছে আমাদেরকে বিবেচনা করেনি।"

হে প্রিয় নানা, আমাদের শত্রুরা তাদের আশাগুলো পূরণ করেছে এবং তারা আমাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করে স্বস্তি পেয়েছে, তারা আহলে বাইতদের হেজাবহীন করেছিল এবং বল প্রয়োগে তাদেরকে গদীবিহীন উটের উপর বসিয়েছিলেন।"

বর্ণনাকারী বলে যে, সাইয়েদা জয়নাব মসজিদে নববীর এক জোড়া দরজা আকড়ে ধরলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "হে নানা, আমি আপনার কাছে আমার ভাই হোসাইনের মৃত্যুর খবর জানাচ্ছি"। এ কথা বলতে বলতে তার অশ্রু অবিরত ঝরতে লাগল এবং তিনি বিলাপ ও কান্না থামাতে পারলেন না।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় জানা প্রয়োজন যে, রাসূল (দ.)-এর ওফাতের পর আহলে বাইতগণ অর্থাৎ হযরত আলী, মা ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন তাদের সকল বিপদাপদ, অসুবিধা ও জুলুম, নির্যাতন ও পারিবারিক ঘটনাবলি রাসূল (দ.)-এর মাজারে এসে অকপটে বলতেন। সাহাবীগণও দুর্ভিক্ষ অথবা অনাবৃষ্টির সময় বা কোনো শাসকের জুলুমের ব্যাপারে রাসূল (দ.) মাজারে ধর্না দিতেন এবং উপযুক্ত ফলও লাভ করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকৃত নায়েবে রাসূল বা রাসূলের সঠিক উত্তরাধিকারীর মাজার শরীফে যাওয়ার রেওয়াজ অদ্যাবধি মুসলিম সমাজে চালু রয়েছে। এর সঙ্গে শিরক বিদআতের বা মাজার পূজার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইয়াজিদের শাসন একটি নিরেপেক্ষ বিশ্লেষণ

অনেক উমাইয়া ঐতিহাসিক ও তাদের অনুচর বা বর্তমানে উমাইয়াদের কিছু অন্ধ ভক্ত অজ্ঞতা অথবা দুর্বলতাজনিত কারণে বলে থাকেন কারবালার ঘটনা বিষয়টি ইয়াজিদের জানা ছিল না। এ কথা যদি সত্যিই হয় এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রীয় নেতার অগোচরে রাজার বড় বড় সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্যরা তার বিনা অনুমতিতে এ ধরনের জঘন্যতম ধর্মহীনতার কাজ করতে পারে সে ব্যক্তি অবশ্যই মুসলমানদের আমীর বা নেতা তথা রাষ্ট্রীয় প্রধান হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। পক্ষান্তরে রাজার অনুমতিক্রমেই যদি এ ধরনের অমানবিক ও ধর্মহীনতার কাজ বা আচরণ করা হয়ে থাকে সেই আমীরের ধর্মীয় জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা সততা বা ন্যায় বিচারের যোগ্যতা বা দয়া যে একেবারেই নেই, তা সহজেই বোঝা যায়। তাই এ ধরনের কোনো ব্যক্তির কোনোক্রমেই মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়ার যোগ্যতা নাই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যায় যে, ইয়াজিদের সৈন্যরা তার বিনা অনুমতিতে বা অগোচরে এ ধরনের জঘন্য আচরণ করেছে, তাহলে ঘটনাটি জানার পর মুসলমানদের নেতা হিসেবে মহান নবী পরিবারের সদস্যদের বিশ্বের জঘন্যতম পদ্ধতিতে হত্যা। তাদের মৃতদেহের সঙ্গে নিষ্ঠুরতম আচরণ, নবী পরিবারের মহা পবিত্র এ মহিলাদের বেপর্দা করে জন সমক্ষে ঘোরানো, ইমাম হোসাইনের মস্তক মোবারক বর্শার আগায় বিদ্ধ করে জনসমক্ষে প্রদর্শন, ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু আহলে বাইত পাক যারা আল্লাহ প্রদত্ত ঈমান ও কুরআনের সাথি হিসেবে সনদপ্রাপ্ত তাদেরকে ইসলামের শত্রু তথা বিদ্রোহী হিসেবে জন সমক্ষে মিথ্যা প্রচার করা প্রভৃতি জঘন্য কর্মকাণ্ডের শরীয়ত সম্মত বিচার করা করে শাস্তি আরোপ করা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, ইয়াজিদ ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ, ওমর বিন সা'দ, সীমার কারো বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বরং তাদেরকে নানাভাবে পুরস্কৃত করেছে। উপরন্তু ইয়াজিদের আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ব্যক্তিকে রাজত্ব দান করেন মর্মে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তার বিভিন্ন জঘন্য কর্মকাণ্ডকে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা সর্বোপরি ইমাম হুসাইনের কর্তিত মস্তকে সামনে নিজ রচিত কবিতার মাধ্যমে বদরের যুদ্ধের

প্রতিশোধ হিসেবে কারবালার অন্যায় হত্যাকাণ্ডকে যুক্তিসংগত প্রমাণ করা এ সবই প্রমাণ করে যে, ইয়াজিদ একজন ধর্মহীন ব্যক্তি ছিল।

তাছাড়া ইয়াজিদ প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং সে যে কোনো ধরনের জঘন্য কাজ করার জন্য আল্লাহ তাকে মনোনীত করেন এবং এর দায়দায়িত্ব আল্লাহর উপরই বর্তায় (নাউযুবিল্লাহ)। এই ব্যাখ্যা যদি সঠিক হতো তাহলে ফেরাউন, সাজ্জাদ, নমরুদ ও অগণিত জুলুমবাজ শাসক চেঙ্গিজ খান, হালাকু খান, সাদ্দাম হোসেন প্রভৃতি ইতিহাসের কুখ্যাত ব্যক্তিদের অবাধ ক্ষমতা ভোগ আল্লাহর পছন্দনীয় বলে মনে করতে হবে যা কোনোক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

ইয়াজিদ যে একজন ধর্মহীন ব্যক্তি ছিল ইতিহাসের আলোকে তা প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করা হচ্ছে।

মসজিদে নববীকে ঘোড়ার আস্তাবল বানানো ও মদিনাবাসীদের উপর নির্যাতন-অত্যাচারঃ

কারবালার হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এবং ইয়াজিদের জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চারদিকে বিদ্রোহের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদেরকে কষ্ট দেবে এবং ভীত সন্ত্রস্ত করবে সে দুনিয়া ও আখেরাতের আযাবে গ্রেফতার হবে। মদিনাবাসীদের সঙ্গে মদিনার নিকটস্থ 'হারবার' নামক স্থানে ইয়াজিদ বাহিনীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইতিহাসে তা হারবার যুদ্ধ নামে কুখ্যাত। এই যুদ্ধের পর বিজয়ী ইয়াজিদ বাহিনীর জঘন্য আচরণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত– "মদিনার উপর এমন এক সময় উপস্থিত হবে যে মদিনার বাসিন্দাদেরকে এখান থেকে বের করে দেয়া হবে।" সাহাবাগণ আরজ করেন, "কে তাদেরকে বের করে দেবে?" রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, "কুরাইশ গোত্রীয় লোকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে।" অপর হাদীসেও হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, "হযরত (দ.)-এরশাদ করেছেন, যে মহান সত্তার কুদরতের হাতে আমার জীবন তারই শপথ করে বলছি, মদিনায় এমন এক যুদ্ধ সংঘটিত হবে যার ফলে দ্বীন এখান থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যে, যেমন মাথা মুন্ডনের ফলে চুল মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সেদিন তোমরা মদিনার বাইরে চলে যেও। এক মনজিলের ব্যবধান হলেও।" হযরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, "তিনি এভাবে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ আমাকে ষাট হিজরীর অঘটন এবং ছেলেদের রাজত্ব থেকে রক্ষা করুন। সে আসার পূর্বেই আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিন।" এতে ইয়াজিদের রাজত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা সে ষাট হিজরীতে সিংহাসনে আরোহন করেছে এবং হারবার ঘটনা তার নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক কুরতবী বলেন, মদিনাবাসীদের মদিনা থেকে বাইরে চলে যাওয়ার কারণ এই হারবারেই মর্মান্তিক ঘটনা দুষ্ট ইয়াজিদ, মুসলিম ইবনে ওকাবার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মদিনায় প্রেরণ করে। সৈন্যবাহিনীর জঘন্য ব্যক্তিবর্গ 'হাররা' নামক স্থানে নিতান্ত নির্মমতা এবং অবমাননার সঙ্গে এই মহাত্মাদেরকে শহীদ করে। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রক্কালে কুচক্রী দল শিশু ও মহিলা ব্যতীত ১২ হাজার ৪ শত ৯৭জন লোককে হত্যা করে। ইয়াজিদ তার সেনাবাহীনির জন্য মদিনার অধিবাসীদের সঙ্গে কোনো ধরনের আচরণ অর্থাৎ হত্যা, যেনা, ব্যভিচার, লুট করার স্বাধীনতা দেয়। এ কারণে মোহাদ্দেসগণ ইয়াজিদকে কাফের হিসেবে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। বর্ণিত এই ঘটনার পর এক হাজার মহিলা অবৈধ সন্তান প্রসব করে। এরা মসজিদে নববীর অমার্জনীয় অবমাননা করে। এই মহা পবিত্র স্থানে তারা ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করে। রাসূল (দ.)-এর রওজা পাক ও মিম্বরে মধ্যবর্তী জায়গাকে বেহেশতের টুকরা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সেই জায়গা এই পাষণ্ডরা সেনাবাহিনীর ঘোড়ার পেশাব পায়খানায় কলুষিত করে। আর লোকদের থেকে তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে ইয়াজিদের পক্ষে এ ভাষায় বায়ত নেয়া হয় যে, ইয়াজিদ যদি ইচ্ছা করে তোমাদেরকে বিক্রয় করতে পারবে অথবা তোমাদেরকে স্বাধীনভাবে রাখতে পারে। সে যদি ইচ্ছা করে আল্লাহর বন্দেগীতে রাখতে পারবে, আর যদি ইচ্ছা করে নাফরমানী করারও নির্দেশ দিতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যমআ নামক এক ব্যক্তি যখন ইয়াজিদের সেনাপতিকে বললেন, "বায়াত তো অন্তত পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর উপর গ্রহণ করা চাই।" তখনই মুসলিম ইবনে ওকবা তাকে শহীদ করে দেয়। ইমাম কুরতবী বলেন, ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন যে, মদিনা শরীক তখনকার দিনে জনপদ শূন্য হয়ে যায়। তখন মরুভূমির পশু-

পাখিরা সেখানকার ফল-মূল উপভোগ করত। মসজিদে নববী কুকুরের আড্ডায় পরিণত হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

স্মরণ রাখতে হবে মদিনা অপবিত্রকারী খোদার দুশমন মুসলিম ইবনে ওকবা উমাইয়াদের অপপ্রচারে হযরত ওসমানের হত্যাকারীদের প্রতিশোধ নেয়া বিশেষ সাওয়াবের কাজ মনে করে মদিনাবাসী ও নবীর শহরকে এভাবে অবমাননা ও অপবিত্র করেছিল। উমাইয়া গোত্রপ্রীতি যে মানুষকে ধর্মহীনতার কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে এই ঘটনাও তার আর একটি প্রমান।

এই দুরাচার মুসলিম বিন ওকবা মদিনায় হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ ও লুটপাট সমাপ্ত করার পর হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য মক্কায় রওয়ানা হয়।

মহানবী (দ.) বলেছেন যে, "মক্কা নগরীকে আল্লাহ পবিত্র নগরী ঘোষণা করেছেন। এটা কোনো মানুষের দ্বারা পবিত্র ঘোষিত হয়নি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে তার জন্য মক্কা নগরীতে রক্তপাত বৈধ হবে না। অথচ মুসলিম বিন ওকবা মৃত্যুর পূর্বে হোসাইন ইবনে নুমাইরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে বলল, ইয়াজিদ আমার পরে তোমাকেই আমীর নিযুক্ত করেছে। তুমি অতি সত্তর মক্কায় পৌঁছে আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের যদি কাবা গৃহেও আশ্রয় গ্রহণ করে তবে এতেও পরোয়া করো না। মিনজানিক (সেই সময়কার কামান) দাগিয়ে দিও।"

হোসাইন ইবনে নুমাইর চব্বিশ দিন মতান্তরে চৌষট্টি দিন মক্কা শরীফকে ঘেরাও করে রাখে ও কামানের গুলি ছুড়ে। এই কারণে কাবাগৃহে ফাটল ধরে যায়। জনৈক সেনা কাবার গিলাফে আগুন ধরিয়ে দেয় ফলে ইবরাহীম (আ.)-এর জবেহকৃত বেহেশতী দুম্বার দুটি শিং পুড়ে যায়। হজরে আসওয়াদ ভেঙ্গে তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়। এই জঘন্যতম ঘটনা ঘটার সময়ে ইয়াজিদ খোদায়ী গজবে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। (৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ)।

ইয়াজিদের রাজত্বকাল সর্বমোট সাড়ে তিন বছর ছিল এই সময়ে তার দ্বারা নবী বংশ নিধন। রাসূল (দ.)-এর রওজা পাক অপবিত্র করণ, পবিত্র মদিনায় নারী নির্যাতন, সাহাবীগণকে হত্যা, মক্কা শরীফে কামান দেগে ফাটল সৃষ্টি, কাবা শরীফের গিলাফে আগুন, বেহেশতী দুম্বার শিং পোড়ানো, হজরে আসওয়াদ ভাঙ্গা, মানুষ হত্যা করে কাবা শরীফে টাঙ্গিয়ে রাখা এসবই ছিল তার কুকর্মের তালিকা।

হযরত ইমাম হোসাইন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে ইয়াজিদের চরিত্রের এই দিক অবগত ছিলেন বলেই তার বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। যদি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী মক্কা, মদিনা, কুফা ও অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা ইয়াজিদের এই নিয়োগ অস্বীকার করে আহলে বাইতের হাতে অর্থাৎ ইমাম হোসাইনকে তাদের পরবর্তী খলীফা হিসেবে গ্রহণ করতেন তাহলে ইসলামের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ.) নির্দেশ মোতাবেক আহলে বাইতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিষ্ঠিত করার প্রকাশ্য নির্দেশ অমান্য করার জন্য বর্তমান মুসলমানদের এই পরিণতি হয়েছে এ কথা যদি কোনো নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দাবি করেন তাহলে তা অস্বীকার করার মতো কোনো যুক্তি আমাদের রয়েছে কি?

ইতিহাসের এই জঘন্যতম ঘটনাসমূহ মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবন-যাত্রায় সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা মুসলিম উম্মাহ আজ পর্যন্ত বহন করে চলেছে।

কারবালা যুদ্ধের ফলাফল :

১. রাসূল (দ.)-এর ওফাতের পর মওলা আলীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নায়েবে রাসূল বা ওসীয়ে রাসূল হিসেবে রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি।

২. দ্বীন ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রাসূল (দ.) কর্তৃক ঘোষিত বৈধ ব্যাখ্যাকারী তথা অভিভাবক এই কনসেপ্টকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে অস্বীকৃতি। অন্য কথায় কুরআন ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নবী পরিবারের বিশিষ্ট সদস্যদের বৈধ কর্তৃত্বের অস্বীকৃতি।

৩. আরবি ভাষা জানা যে কোনো পণ্ডিত বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই পবিত্র ধর্মের সঠিক সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা।

৪. কুরআনের একই বিষয়ে একাধিক ব্যাখ্যার স্বীকৃতির ফলে ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন মযহাব বা ফিরকার সৃষ্টি বা অন্য ভাষায় স্থায়ী মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের স্থায়ী উপস্থিতি।

৫. অনুরূপভাবে হাদীসের ব্যাখ্যাকারক হিসেবে আহলে বাইতদের বিশেষ মর্যাদার অবলুপ্তির মাধ্যমে কোনো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বা রাজার নিয়োগকৃত ধর্মের রক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠা।

৬. রাসূলের পরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ইমামের হাতে বর্তাবে[২৫] তা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে অস্বীকৃতি। পক্ষান্তরে, যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

৭. অন্য কথায় পার্থিব রাজনৈতিক নেতৃত্বে আল্লাহর অধিকার হরণের স্থায়ী ব্যবস্থার নিশ্চিত করন। এরই ধারাবাহিকতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিয়োগ/অনুমোদন, সন্তুষ্টি ইত্যাদি। ধারণা হিসাবেই মুসলিম সমাজ থেকে অপসারণ, তাছাড়া 'ইমাম' শব্দটি এতো হালাকা ও ঠুনকো হিসেবে ব্যবহার যার ফলে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যার দূরতম সম্পর্কও নাই তিনি সমাজের সবচেয়ে অজনপ্রিয় শব্দে যার পরিচয়, তিনি হয়েছেন ইমাম।

৮. রাসূল (দ.) মহান চরিত্রকে কুরআন ও হাদীসের অপব্যখ্যার মাধ্যমে অবমূল্যায়ন ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দর্শন যথা জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, সাম্য, ন্যায়বিচার প্রভৃতি সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে গলাটিপে হত্যা করা হয়।

৯. রাষ্ট্রীয় ফতোয়ার মাধ্যমে রোম ও পারস্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকে ইসলাম ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে চালানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের জন্য রাজপ্রসাদ নির্মাণ, তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী, তাদের হেরেমে শত শত বৈধ-অবৈধ স্ত্রীলোক বায়তুল মালের বদলে খলীফার ব্যক্তিগত খাত এবং এ থেকে যথেচ্ছ খরচকারীকে দয়ালু, দাতা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ক্ষেত্রে কেউই প্রশ্ন করতে চায় না বা পাওে না রাজা বা খলীফা প্রথমে কীভাবে ধনী হয়েছেন।

১০. ইসলামের অর্থনৈতিক বিধিবিধান রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা না করে জাকাত প্রথাকে নামাজ-রোজার ন্যায় ব্যক্তিগত ইবাদতে রূপান্তরিত করন।

১১. রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, ইসলাম ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

---

[২৫] সূরা বাকারা, ১২৪ নং আয়াত অনুসারে।

১২. 'সব মাফ মতবাদ' অর্থাৎ কোনো লোক যত গোনাই করুক না কেন যেহেতু আল্লাহ সব গোনাই মাফ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত আল্লাহর এই ক্ষমতা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বান্দাহর গোনাহ করার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালানো এবং তার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত করানোর প্রচেষ্টা। ফলে গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ ভীতির বিষয়টি সমাজ থেকে দূরীভূত করা।

১৩. অদৃষ্টবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা। অর্থাৎ যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তা অবশ্যই সংঘটিত হওয়া। তাই এ ব্যাপারে ব্যক্তি বিশেষের কোনো গুনাহ বা দোষ নাই এই ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা এই মতবাদের মাধ্যমে কারবালার ঘটনার জন্য কাউকে দায়ী করা উচিত হবে না, কারণ এটা আল্লাহর ইচ্ছা।

১৪. আল্লাহ সমাজ পরিচালনার জন্য নবীর পরে 'উলীল আমর' বা 'নায়েবে নবী' বা 'ওলী' নিয়োগ করে থাকেন এই মতবাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অস্বীকৃতি।

১৫. কুরআনের প্রকাশ্য ও গুপ্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কিত তত্ত্বের রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি।

১৬. শাসনক্ষমতা গ্রহণের উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক জটিলতা সৃষ্টি এবং এ কারণে ভাই ভাইয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের স্থায়ী ব্যবস্থা চালু হওয়া।

ইলমে তাসাউফ বা মারফতী জ্ঞানের রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি

রাষ্ট্র প্রধানের কর্তৃত্বের বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা বা সমালোচনা বা অবৈধ শাসককে উৎখাত করার যে কোনো প্রচেষ্টাকে খোদাদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য করে তাকে হত্যা করা বৈধ বিবেচনা করা।

রাজতন্ত্র (যে কোন পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত) ইসলামের রাখে সংগতিপূর্ণ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি।

উল্লিখিত সকল মতের যথার্থতা ও ধর্মীয় যৌক্তিকতা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিপুল পরিমাণ পুস্তক প্রনয়ন ও প্রচার।

এই বিকৃত ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সঠিক অপরিবর্তিত ও প্রকৃত ইসলাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকার যে ইসলাম প্রচার করে থাকে বা তার প্রসারের জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে এটাই যে ইসলামের সঠিক রূপ তা বল প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কারবালার যুদ্ধের পর

আহলে বাইতদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে যে চিরস্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে তাতে দ্বীন ইসলামের কোনো বিকৃতি বা ক্ষতি হয়নি, অর্থাৎ ইয়াজিদ তথা উমাইয়ারা বা আব্বসীয়গণ রাষ্ট্রীয়ভাবে যে ইসলাম চালু বা প্রবর্তন করেছে তাই প্রকৃত ইসলাম এই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

মুসলমানদের মধ্যে বংশীয়/গোত্রীয় ও জাতীয়তাবাদের ভাবধারা সৃষ্টি

রাজা বা ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোনো যুদ্ধকেই জেহাদের মর্যাদা দান। অর্থাৎ জেহাদ বা পররাজ্য লোভের জন্য যুদ্ধের গুণগত তথা ধর্মীয় পার্থক্যের বিলুপ্তি। এরই ধারাবাহিকতায় উমাইয়া আব্বাসীয়দের যুদ্ধ, মোঘল-পাঠানদের যুদ্ধ এবং ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার সঙ্গে যে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্কই ছিল না তা সর্বজনবিদিত।

হযরত আলীর মর্যাদা (যা মূলত উমাইয়াদের প্রচারের ফসল) প্রথম তিন খলীফাদের চেয়ে কম তা ধর্মীয়ভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা।

কোনো রকম পীর/বুজুর্গ/আধ্যাত্মবাদী মহান ব্যক্তির সাহচর্য ছাড়াই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (দ.)-এর হাদীস পড়েই ইহ ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করা যাবে মর্মে এই ধারণা ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা। অথবা ধর্ম শিক্ষার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন নাই।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের হারাম-হালালের গুরুত্ব অস্বীকার করে বা গুরুত্বহীন বিবেচনা করে শুধুমাত্র মদ, শূকরের মাংস ও রক্তের মধ্যেই সীমিতকরণ।

উমাইয়া রাজত্বের শুরু থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। তাহলো রাজারা আচার অনুষ্ঠানে শরাব পান করবেন ও করাবেন। রাজ প্রাসাদে বসবাস করবেন। মাথায় কোটি কোটি টাকা মূল্যের রাজমুকুট ও বহু মূল্যবান রাজ পোষাক পরিধান করবেন। শত শত দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত থাকবেন সাধারণ মানুষ স্বপ্নেও তাদের সাক্ষাত লাভ করতে পারবে না। রাজা নিজের ধর্মীয় ইমামতের দায়িত্ব অন্য কর্মচারীকে দিয়ে করাবেন। সেই ব্যক্তির চাকুরী হবে অন্য লোকদের নামাজ পড়ানো। শত শত মহিলা তাদের বৈধ ও অবৈধ স্ত্রী হিসেবে থাকবেন। প্রজা পালন তথা নিপীড়নমূলক কাজ করবেন। জনকল্যাণমূলক কাজও মাঝে মাঝে করবেন। ফলে তিনি দয়ালু, প্রজা

হিতৈষী রাজা হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হবেন। এতদসত্ত্বেও তিনি বৈধ ধর্মীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই ধরনের নেতা ইসলাম ধর্মীয় আদর্শে কতখানি যোগ্য বা আদৌ যোগ্য কি না এ প্রশ্ন করা মাত্র তার শিরশ্ছেদ অনিবার্য। কিন্তু বিনা বাক্য ব্যয়ে এই ব্যক্তিকে অনুসরণ করলে দ্বীন ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না কারণ তিনি তো জনগণের নামাজ, রোজা, হজের ব্যাপারে কোনো বাধা দিচ্ছেন না। তাছাড়া ধর্মতো একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজনৈতিক নেতৃত্বে ব্যাপারে সাধারণ মুসলামানদের কিছু করনীয় নাই। তারা ব্যক্তিগত ইবাদত পালনের মাধ্যমে বেহেশতে চলে যাবে।

তাই এই ধরনের নেতৃত্ব মেনে নিলে ইসলাম ধর্মের কোনো ক্ষতি হবে না বা এ ধরনের ব্যক্তিকে অনুসরণ করাও ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করতে হবে মর্মে ঘোষণা করা হয়। তবে মুসলমান উম্মাহর সৌভাগ্য যে, এদের মধ্যে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতা কিছু সংখ্যক রাজা, সুলতানদের অসাধারণ উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মহান আল্লাহর ওলীদের ঐশ্বরিক যোগাযোগ ও কেরামতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় ড়ংকা বেজে চলেছে। আর তা তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পারস্য, রোম ও অন্যান্য দেশ যথা চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্বলতাজনিত কারণে ইসলাম বিশ্বে তার দৃঢ় অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়। তাই ইসলাম নিজস্ব দুর্বলতা ও তাত্ত্বিক মতবিরোধিতা জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ হয় নেই। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রীয় তত্ত্বে রাষ্ট্র হিসেবে যখন সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সাথে রাজতন্ত্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তখন ইউরোপ ও আমেরিকা রাজতন্ত্র, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যত বর্জন বা সীমিত করে এখন তথাকথিত ইসলামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজতন্ত্র ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধসমূহ ইসলাম ধর্মাবলম্বীসহ পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন এবং এগুলোর দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা ছাপিয়ে সঠিক ইসলামের খোঁজে লোক দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের রাজ রাজারা ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যে, বিদ্যমান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় হারাম খেতে লাগল তা বড় বড় ফকীহদের আওতা বহির্ভূত হয়ে গেল এবং ফকীহগণ সাধারণ লোকের বিয়ে, ওজু গোসল, রোজা, নামাজ এই সমস্ত ব্যাপারে সুক্ষ্ম বিশ্লেষনে হারাম-হালাল অনুসন্ধানে ব্যপৃত হয়ে গেলেন। তাই কার্যত রাজনীতি ধর্ম

থেকে পৃথক করা হলো। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মের ভূমিকা শুধু বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, মারহাবা, মাশাআল্লাহ-এর মৌখিক উচ্চারণের মধ্যে সীমিত হলো। রাষ্ট্রীয় আচার অনুষ্ঠানও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধর্মীয় নির্দেশের বাইরে চলে গেল বিধায় ধর্মের প্রকাশ্য আলোচনা শুধু অদৃশ্য বিষযবস্তু বেহেশত, দোযখ ও দৈনন্দিন ইবাদতের মাসালা মাসায়েলের মধ্যে সীমিত রাখা হলো। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে ও রাসূল (দ.)-এর হাদীসে যত আদেশ নির্দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজনীতি, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয় আছে সেসবের ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো।

আহলে বাইতদের দুঃখে পাছে রাসূল (দ.)-এর ওসিয়ত অনুযায়ী কেঁদে বেহেশতে চলে যায় বা নাজাতপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে বিধায় তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে যদি কেহ সামান্য পরিমাণ চোখের পানি ফেলে তাহলে তাকে শাফায়াত করা রাসূল (দ.)-এর জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে মর্মে তিনি পবিত্র জবানে উচ্চারণ করেছেন। অথচ শয়তানের অনুসারীরা রাসূল (দ.) মিথ্যা হাদীসের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করলে আত্মার কষ্ট হয় বা মৃত ব্যক্তি বেহেশতে যেতে পাওে না। অথবা এ ধরনের কান্না জায়েজ নয়। এই মিথ্যা হাদীসের দৌরাত্মে কত সন্তানের মায়ের মৃত্যুর জন্য, স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য স্বামী বা স্বামীর মৃত্যুর জন্য স্ত্রীকে না কাঁদার মতো নিষ্ঠুর আচরণ করতে এই শয়তানের অনুসারীরা এখন পর্যন্ত লোকের কাঁদার উপরেও বিধি নিষেধ আরোপ করে।

হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদতের পর ইয়াজিদ পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতাসীন হয়। তারপর আহলে বাইতগণের শত্রুগণই ইসলামের প্রভূ হয়ে ক্ষমতাসীন হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সে সঠিক ইসলাম প্রচার করেনি তা বলাই বাহুল্য। হযরত ইমাম হোসাইন কি কারণে শাহাদাতবরণ করলেন এবং তাঁর আদেশ কী অথবা প্রকৃত ইসলাম বলতে কি বুঝায় এবং তা কোথায় পাওয়া যাবে এটা অনুসন্ধান করাই কারবালার শিক্ষা। অথচ এক সর্বগ্রাসী মূর্খতা ইসলামি সমাজ জীবনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। যা অদ্যাবধি অব্যহত রয়েছে।

হযরত ইমাম হোসাইনের রওজা জিয়ারতের ফজিলত

হযরত ইমাম হোসাইন হলেন জান্নাতের যুবকদের সর্দার, হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর সন্তান ও উত্তরাধিকারী শহীদদের নেতা। ৬১ হিজরি ১০ই মুহার্‌রাম অনুযায়ী ১০ অক্টোবর ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কারবালার প্রান্তরে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

শাহাদাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা:

> **"যারা আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করে তাদেরকে তোমরা কখনই মৃত মনে করোনা; বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়।"** (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৬৯)

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন মজীদে আরো ইরশাদ করেন–

> **"আমি রাসূলকে এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হইবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তারা আপনার নিকট এলে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে।"** (সূরা নিসা, আয়াত-৬৪)

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, রাসূল (দ.)-এর সুপারিশক্রমেই তওবা কবুল হয়। আর এ সাহায্য পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ ওফাতের পরও রাসূল (দ.)-এর সুপারিশে আমাদেরও তওবা কবুল হবে। অতএব রাসূল (দ.) ওফাতের পর সাহায্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া গেল। এ জন্য এখনও হাজীদেরকে বলা হয় যে, তারা যেন মদিনা মনোয়ারায় রাসূল (দ.)-কে সালাম পেশ করার সময় এই আয়াতটি পাঠ করে। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী রাসূলের উত্তরাধিকারী হিসেবে ইমাম হোসাইন অনুরূপ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী।

হযরত ইমাম হোসাইনের ইমামতঃ

বিশ্ব জাহানের প্রভু, আকাশ ও সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা মালিক ও শাসনকর্তা তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যর পরিচালনা করার জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব জাহানের 'ইলাহা' তথা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে তিনি তাঁর সৃষ্ট মানবকুলের মধ্য থেকে এমন সব লোকদের নির্বাচিত ও নিয়োগ করে থাকেন যাঁরা তাঁর উপর দৃঢ়ভাবে ঈমান আনয়ন করেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরই প্রণয়নকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করে থাকেন। এই সব মহান ব্যক্তিবর্গ হলেন মানব জাতির পথ প্রদর্শক (হাদী/মুর্শিদ) নবী-রাসূল তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা ও আল্লাহর প্রতিনিধি।

সাধারণভাবে এইসব মহান ব্যক্তিবর্গের নবী-রাসূল পদবি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এবং ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্যক না জানার কারণে আমাদের ধারণা অনুযায়ী তাঁদেরকে শুধু ধর্মীয় নেতা বা ধর্ম প্রচারকারী হিসেবে জানি ও মানি। কিন্তু অন্যান্য পার্থিব কর্মকাণ্ডে তাঁদের কোনো ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করি না। অথচ আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তাঁরই নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে এই বিশ্ব পরিচালনা তথা শাসন করে আসছেন। নবী-রাসূল পদবি যেন এই বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো বিভ্রান্তিতে না ফেলে অর্থাৎ মানবীয় বিবেচনায় যেন আমরা এদেরকে শুধু 'ধর্মীয় নেতা' হিসেবে তাঁদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ না করি সে জন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এসব মহান ব্যক্তিদের জন্য আরো কয়েকটি পদবি নির্ধারণ ও ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের একটি পদবি হলো 'ইমাম'। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

> **"স্মরণ করো যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বাক্য (বিষয়) দিয়ে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ বলেন আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম (নেতা, অনুকরণীয়, মান্যবর, বিশ্বনেতা) নিয়োগ/নির্বাচন করলাম। সে বলল, আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও। আল্লাহ বলেন (হ্যাঁ কিন্তু) আমার অঙ্গীকার (তথা এ নিয়োগ) জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।"** (সূরা বাকারা, আয়াত-১২৪)।

এই আয়াত থেকে স্থির নিশ্চিত হওয়া গেল যে, আল্লাহ কর্তৃক এই বিশ্ব পরিচালনা পদ্ধতি আমাদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী শুধু ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমিত নয়; বরং পার্থিব কর্মকাণ্ডও এই সব ইমামদের পরিচালনাধীন। আর এইসব কর্মকাণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া জালিম, ফাসেক, পাপাচারী, দুরাচার ও অসৎ ব্যক্তির ইমামত তথা নেতৃত্ব বাতিল। এ ধরনের কোনো ব্যক্তি যদি স্বঘোষিত পন্থায় এ পদে জেঁকে বসে তবে তার অনুগমন, অনুসরণ, আনুগত্য ও সম্মান করা জনতার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত ইমাম হোসাইন আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ইমাম, যার ঘোষণা হযরত মুহাম্মদ (দ.) স্বয়ং গাদীরে খুমের বক্তৃতায় করেছেন।

হযরত ইমাম হোসাইনের মাজার নির্মাণ ও উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

'বিহারুল আনওয়ার' এ খারায়েজ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ আল বাকির বলেছেন যে, "একদিন ইমাম আলী তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে কারবালা থেকে এক বা দুই মাইল দূরে গেলেন। এরপর তিনি আরও এগিয়ে গেলেন এবং মাকদাফান নামে এক জায়গায় পৌঁছলেন এবং সেখানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এরপর বললেন, "দুশ নবী ও নবীদের সন্তানদের এখানে শহীদ করা হয়েছে এবং এটি থামার জায়গা। বিরাট প্রশান্তি লাভকারী শহীদদের শহীদ হওয়ার জায়গা। যা প্রাচীন লোকেরা অর্জন করতে পারেনি এবং তাদের পরে যারা আসবে তারাও তাতে পৌঁছাতে পারবে না।" বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে যখন ইমাম হোসাইন সে জায়গায় পৌঁছলেন তিনি জায়গাটির নাম জিজ্ঞাসা করলেন। লোকজন উত্তরে বলল তা কারবালা। ইমাম বললেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই কারব (দুঃখ) এবং বালা (মুসিবত) থেকে।" এরপর তিনি বললেন, "এখানে দুঃখ ও মুসিবত বাস করে, তাই এখানে থামো এবং এটি আমাদের থামার জায়গা। এখানে আমাদের রক্ত ঝরানো হবে এবং এখানে আমাদের কবর দেয়া হবে। আমার নানা আল্লাহর রাসূল (দ.) আমাকে এ বিষয়ে আগেই বলেছেন।"

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, কারবালা শব্দগুচ্ছ আরবি কার-বাবেল শব্দ থেকে সৃষ্ট। যা প্রাচীন ব্যাবিলনের কয়েকটি গ্রাম নাইনাওয়া, আল গাদিরিয়া,

কারবেল্লা, আল নাওয়াইস এবং আল হীর। এই আল হীরেই বর্তমানে আল হেয়ার নামে পরিচিত, সেখানে ইমাম হোসাইনের মাজার শরিফ অবস্থিত।

হযরত ইমাম হোসাইনের পরিবারকে বন্দি করে কুফার উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন বনি আসাদ গোত্রের লোকেরা সর্বপ্রথম তাঁর পবিত্র দেহ কবর দেয় এবং এর উপর তাঁবুর আচ্ছাদন প্রদান করে। এই গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই রওজা শরিফে সর্ব প্রথম মোমবাতি জ্বালায় এবং তাঁর মাথার দিকে একটি গাছ রোপন করে। (অক্টোবর ৬৮০ খিস্টাব্দ)।

মুখতার ইবনে আবু উরাই যাদাহ সাকাফী (যিনি কারবালায় ইমাম পাকের হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী) সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং কবরের উপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করে সেখানে একটি সবুজ পতাকা টাঙ্গিয়ে দেন। মসজিদের জন্য দুটি প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া তিনি রওজা পাকের আশে পাশে কিছু জনবসতি স্থাপন করেন। (৬৮৪ খিস্টাব্দ)

আব্বাসীয় খলিফা আল সাফফাহর শাসনকালে রওজা শরিফের উপর আরও একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয় এবং মসজিদের আরও দুটি প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয় (৭৪৯ খিস্টাব্দ) ৭৬৩ খৃষ্টাব্দে আব্বাসীয় শাসক মনসুর কর্তৃক রওজা শরিফের ছাদসহ গম্বুজসমূহ ধ্বংস করা হয়।

খলীফা আল মাহদীর আমলে ধ্বংসকৃত ছাদ পুনঃ নির্মাণ করা হয়। (৭৭৪খ্রিস্টাব্দ) ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে খলীফা হারুন আর রশীদের আমলে মাজার শরিফটি ধ্বংস করা হয় এবং পূর্বোল্লিখিত গাছটি কেটে ফেলা হয় এবং মাজারের সকল নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করা হয়, যাতে জিয়ারতকারীগণকে মাজার জিয়ারতে নিরুৎসাহিত করা যায়।

৮০৮ খ্রিস্টাব্দে আল মামুনের শাসনকালে রওজা শরিফটি পুনর্নির্মাণ করা হয়।

৮৫০ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আল মুতায়াকিফল কর্তৃক মাজার শরিফটি ধ্বংস করা হয় এবং কবরটি লাঙ্গল দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং জিয়ারতকারীদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

৮৬১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল মুনতাসীরের নির্দেশে মাজার শরিফটি পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং মাজারের ছাদে লোহার পিলার দেওয়া হয়।

৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় এটি ধ্বংস করা হয়।

৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে অলীদ পরিষদ কর্তৃক রওজা শরিফটি পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং এর সঙ্গে দুটি মিনার যুক্ত করা হয়। তাছাড়া মাজারে প্রবেশের জন্য দুটি গেইটও নির্মাণ করা হয়।

৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বুয়াইদ আমির আদহুদ আদ দওলার নির্দেশে রওজার অভ্যন্তরে কাঠের তৈরি খিলান নির্মাণ করা হয়। মাজারের চারদিকের পরিবেশ দৃষ্টিনন্দন করা হয়। তাছাড়া তিনি কারবালাকে একটি শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইমরান বিন শাহীন মাজারের পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

১০১৬ খ্রিস্টাব্দে মাজারটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে উজির হাসান ইবনে ফাদী এর কাঠামো পুনর্নির্মাণ করেন।

১২১২ খ্রিস্টাব্দে নাসির লী দীন আল্লাহ মাজারটির অভ্যন্তরভাগ সংস্কার করেন।

১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে মাজারের কাঠামো, গম্বুজ ও দেওয়াল সুলতান ওয়ায়েস ইবনে হাসান জালওয়ারীর নির্দেশে পুনঃনির্মাণ করা হয়।

১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আহমদ ইবনে ওয়ায়েস কর্তৃক মাজারের দুইটি মিনার সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয় এবং তার পরিধি সম্প্রসারিত করা হয়।

১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে ইরানের সাকাভী বংশীয় প্রথম ইসমাইল মূল মাজারের অভ্যন্তরভাগ কাঁচ দিয়ে মুড়ে দেন।

১৬২২ খ্রিস্টাব্দে আব্বাস শাহ সাকাভি পিতল ও ব্রোঞ্জ দিয়ে মাজারের অভ্যন্তরভাগ সংস্কার করেন এবং গম্বুজ, কাশী, টাইলস দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়।

১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ওসমানী শাসক সুলতান মুরাদ মাজারের গম্বুজ চুনকাম করার ব্যবস্থা করেন।

১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে নাছির শাহ আকসার মাজার শরিফকে সুসজ্জিত করেন এবং মাজারের কোষাগারে মূল্যবান রত্ন উপহার দেন।

১৭৯৬ সালে আগা মোহাম্মদ শাহ কমর মাজারের গম্বুজ ও মিনার খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

১৮০১ সালে ওহাবীরা মাজার শরিফ ধ্বংস করে এবং গম্বুজের সোনা লুট করে।

১৮১৭ সালে ওহাবীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মাজারটির অভ্যন্তরভাগ ফাতিহ আলীশাহ কাজর রুপার আস্তর দিয়ে পুনর্নির্মাণ করেন এবং গম্বুজ পুনরায় সোনা দিয়ে মোড়ার ব্যবস্থা করেন।

১৯৩৯ সালে ড. সৈয়দ তাহের সাইফুদ্দিন দাউদী (বুহরা সম্পদায়) মাজারের অভ্যন্তরভাগে রুপার পর্দা যার সঙ্গে সোনা সংযুক্ত ছিল উপহার দেন। এই সোনার সেটে ৫০০টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল যার প্রতিটির ওজন ছিল ১২ গ্রাম।

১৯৪১ সালে তিনি মাজারের সকল মিনার খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

১৯৯১ সালে স্থানীয় বিদ্রোহী দমনের নামে সাদ্দাম হোসেনের সেনাবাহিনী এই মাজারের ব্যপক ক্ষতি করে, পরিপূর্ণ নির্মাণ কাজ ১৯৯৪ সালে শেষ হয়।

২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ২ মার্চ ও ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৬ সালের ৫ জানুয়ারি ২০০৭ সালের ১৪ এপ্রিল, ২০০৮ সালের ১৭ মার্চ, ও ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ও ৫ ফেব্রুয়ারি এই পবিত্র মাজার শরিফে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বোমা বর্ষণ করা হয় এবং প্রতিবারই বেশ কিছু সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করে। এই পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় যে, আহলে বায়তের দুশমনরা এখন তাদের দুশমনিতে সক্রিয় রয়েছে।

হযরত ইমাম হোসাইনের রওজায় বর্তমানে একাধিক প্রবেশ পথ রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত প্রবেশ পথটিকে আল কিবলা অথবা বাব-ই দাহবাব বলা হয়। প্রবেশ পথের ডান পাশে হযরত হাবীব ইবনে মাজাহির আল আসাদের করবটি অবস্থিত। তিনি বাল্যকাল থেকেই ইমাম পাকের সুহৃদ ছিলেন এবং কারবালার ময়দানে শাহাদতের গৌরব অর্জন করেন। মাজার প্রাঙ্গণে ইমাম হোসাইনের পায়ের দিকে ৭২ জন শহীদের কবর রয়েছে। ইমাম পাকের মাজারের পাশে তার দুই শাহজাদা হযরত আলী আকবর ও ৬ মাসের আলী আসগরের মাজার রয়েছে। তাছাড়া সপ্তম ইমাম হযরত ইমাম মুসা আল কাজীমের মহান পুত্র ইবরাহীম, যিনি কারবালার শিক্ষা জনগণের মধ্যে প্রচার করেছেন তার মাজার শরিফ এখানে অবস্থিত মসজিদে মধ্যে রয়েছে।

ইমাম হোসাইনের কবর জিয়ারতের নির্দেশঃ

হযরত ইমাম জাফর সাদিক বর্ণনা করেন, "একদিন ইমাম হোসাইন তাঁর নানা (দ.)-এর কোলে বসে ছিলেন এবং তিনি তাঁকে আদর করছিলেন ও মুচকি হাসছিলেন। তা দেখে হযরত আয়েশা বললেন, "হে রাসূলাল্লাহ (দ.) আপনি এ বাচ্চাকে কতটুকু ভালোবাসেন?" তিনি (দ.) জবাব দিলেন, "আক্ষেপ তোমার জন্য, কেন তাকে আমি ভালোবাসবো না এবং তার উপর সন্তুষ্ট থাকব না? সে আমার হৃদয়ের ফল এবং আমার চোখের নূর। সাবধান, নিশ্চয়ই আমার উম্মত তাঁকে হত্যা করবে, তাই যে তাঁর মৃত্যুর পরে তার কবর জিয়ারতে যাবে, আল্লাহ আমার একটি হজ তার হিসেবে লিখে দেবেন।" হযরত আয়েশা বললেন, "আপনার হজ্ব?" হ্যাঁ বরং আমার দুটো হজ্ব। আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার দুটো হজ্ব?" এবং তিনি বললেন, "হ্যাঁ" এবং হযরত আয়শা যতবার প্রশ্ন কররেণ তিনি হজ্বের সংখ্যা (পুরস্কার) অত বৃদ্ধি করতে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তা নব্বই হজ্জে পৌঁছালো তার ওমরাহসহ।"

জনৈক ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদিককে জিজ্ঞেস করল, "যে ব্যক্তি ইমাম হোসাইনের কবর জিয়ারতে যায় তার হক সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকে এবং সে না দাম্ভিক, না অস্বীকারকারী। সে কি অর্জন করেছে?" ইমাম বললেন, "এক হাজার হজ তার হিসেবে লিখা হবে এবং এক হাজার তাকওয়াপূর্ণ ওমরাহও। আর যদি সে একজন অভিশপ্ত ব্যক্তি হয়, তাকে সাফল্যলাভকারী ব্যক্তি হিসেবে লিখে রাখা হবে এবং আল্লাহর রহমতের ভিতরে চিরকাল ডুবে থাকবে।"

ইমাম মোহাম্মদ আল বাক্বির মুহাম্মদ বিন মুসলিমকে বলেছেন যে, "আমাদেরকে (ঈমানদারদের) হোসাইন বিন আলীর মাজার জিয়ারতে যেতে বলো, কারণ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ঈমানদারদের জন্য তা বাধ্যতামূলক করেছেন, যে ইমাম হোসাইনকে তার ইমাম দাবি করে।"

ইমাম জাফর সাদিক বলেন যে, যখনই তোমাদের মাঝে কেউ হজে যায় এবং এর পরে ইমাম হোসাইনের আমার জিয়ারতে যায় না সে রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর হকগুলোর (অধিকারগুলোর) একটিকে পরিত্যাগ করল। কারণ ইমাম হোসাইন হককে (অধিকার) আল্লাহ প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য ওয়াজিব করেছেন।

ইমাম হোসাইনের মাজার জিয়ারতকারীরা কিয়ামত দিবসে আহলে বাইতদের সঙ্গে থাকবেঃ

ইমাম জাফর সাদিক বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক উচ্চকণ্ঠে বলবে। হোসাইনের জিয়ারতকারীরা কোথায়? একটি বিরাট দল উঠে দাঁড়াবে। তাদের সংখ্যা গননা সম্ভব হবে না একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষে ছাড়া। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা কেন হোসাইনের কবর জিয়ারত করেছ?" তারা উত্তর দেবে, "হে আমাদের রব, আমরা তা করেছি রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর সাথে বন্ধুত্বের (মহব্বতের) কারণে এবং আলী-ফাতিমা এর জন্য এবং যে শোক তাঁদের উপর নেমে এসেছে তার জন্য।" তাদেরকে বলা হবে এখানে মুহাম্মদ, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন আছে। যাও তাদের সঙ্গে মিলিত হও। তোমরা তাদের সাথেই তাদের মর্যাদায় থাকবে। ঐক্যবদ্ধ রাসূলাল্লাহর পতাকার নিচে এবং তার ছায়ার নিচে থাকো, আর তা আছে আলীর হাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর। তখন তারা পতাকার দিকে আসবে পেছন থেকে ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে।

হযরত ইমাম হোসাইনের মাজার জিয়ারত গুনাহ মাফের ওসিলাঃ

ইমাম জাফর সাদিক বলেন, "যে ব্যক্তি ইমাম হোসাইনের কবরের মাথার দিকে আসে তার অধিকার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকে। তবে তার অতীত এবং ভবিষ্যতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি ইমাম হোসাইনের কবর জিয়ারতে যায় এবং তাঁর হক (প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা (তাঁর ইমামত, বেহেশতের সর্দার আহলে বায়েত হিসেবে চির পবিত্র ও কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যাদেরকে ভালোবাসা ঈমানদারদের জন্য ফরজ ইত্যাদি বিশ্বাস) থাকবে আল্লাহ তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সব গুনাহ ক্ষমা করা দেবেন।

ইমাম হোসাইন মাজার জিয়ারতকারীকে গুনাহগারদের সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদানঃ কিয়ামতের দিনে ইমাম হোসাইনের জিয়ারতকারীদের বলা হবে যে, তোমার পছন্দ মতো যে, কোনো ব্যক্তির হাত ধরো এবং তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাও।

সুলাইমান বিন খালিক ইমাম জাফর সাদিককে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "আমি শুনেছি যে আপনি বলেছেন, আল্লাহ পৃথিবীকে দেখেন একলক্ষ বার। এরপর তিনি ক্ষমা করে দেন যাকে তাঁর ইচ্ছা এবং শাস্তি দেন যাকে তাঁর ইচ্ছা এবং ইমাম হোসাইনের কবর জিয়ারতকারীকে এবং তার পরিবারকে এবং যে ব্যক্তিকে তিনি কিয়ামতের দিন সুপারিশ করে ক্ষমা করে দেবেন। সে যেই হোক। তাহলে কি যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের যোগ্য তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে।" ইমাম উত্তর দিলেন, "হ্য, এমনকি সে জাহান্নামের জন্য যোগ্যও হয়। তবে যদি সে আহলে বায়তের দুশমন না হয়।"

ইমাম হোসাইনের মাজার জিয়ারতকারীর দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির সুসংবাদঃ

ইমাম মুহাম্মদ বাকির বলেন যে, কারবালায় ইমাম হোসাইনকে হত্যা করা হয়েছে মজলুম অবস্থায় এবং কঠিন কষ্টের ভিতর। পিপাসার্ত অবস্থায় এবং কোনো সাহায্যকারী বিহীন অবস্থায়। আর আল্লাহ তায়ালা নিজের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, এমন কেউ নেই যে, বিপদগ্রস্ত, দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত, গুনাহগার, দুঃখী, পিপাসার্ত এবং অসুস্থ অবস্থায় তার কবরের কাছে আসবে এবং তার আশা ব্যক্ত করবে। ইমাম হোসাইনের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি, তার আশা পূরণ, তার গুনাহগুলো মাফ, তার হায়াত বৃদ্ধি এবং তার রিজক বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। অতএব শিক্ষা নাও, হে যাদের দৃষ্টি (জ্ঞান) আছে।"

জনৈক ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদিকের কাছে বলল, "আপনাকে এক নজর দেখার আগ্রহ আমাকে বাধ্য করেছে আপনার কাছে আসতে এবং আপনার কাছে বর্ণনা করতে আমি কীসের সম্মুখীন হয়েছি।" ইমাম সাদিক বললেন, "তোমার জন্য সঠিক হতো যদি তুমি তার কাছে যেতে, যিনি তোমার ওপরে আমার চেয়ে বেশি অধিকার রাখেন।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কার অধিকার আমার ওপরে আপনার চেয়ে বেশি?" ইমাম উত্তর দিলেন, "হোসাইন, তোমার জন্য তা আরও ভালো হতো যদি তুমি হোসাইনের কাছে যেতে এবং অনুরোধ করতে এবং তার কাছ থেকে তুমি আল্লাহর কাছে বলতে তুমি কী চাও।"

ফেরেশতাগণ ইমাম হোসাইনের মাজার জিয়ারতকারীঃ

ইসহাক বিন আম্মার বলেন, আমি ইমাম জাফর সাদিককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি আরাফাতের রাতে ইমাম হোসাইন মাজারে ছিলাম এবং তিন হাজার জ্যোতির্ময় চেহারার ব্যক্তিকে দেখলাম, যারা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে এবং সাদা কাপড় পরে ভোর পর্যন্ত নামাজ পড়ছে। আর আমি যতই চেষ্টা করলাম কবরের কাছে যেতে এবং দোয়াগুলো পড়তে আমি পারলাম না মানুষের প্রচণ্ড ভিড়ে। যখন ভোর হলো, আমি সিজদায় পড়লাম এবং যখন আমি মাথা তুললাম তাদের একজনও আর দৃশ্যমান ছিল না।" ইমাম সাদিক বলেন, "তুমি কি জানো তারা কারা ছিল?" আমি 'না' বললাম, ইমাম বললেন, "আমার পিতা বর্ণনা করেছেন আমার কাছে তার পিতা থেকে যে, যখন ইমাম হোসাইনকে হত্যা করা হয়, চার হাজার ফেরেশতা এর পাশ দিয়ে গিয়েছিল এবং আকাশে উড়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে ওহী করলেন, হে ফিরিশতাদের দল তোমরা আমার বন্ধুর সন্তানের পাশ দিয়ে গেছ, যখন তারা তাকে হত্যা করেছে, যখন সে খুব কষ্টে ছিল আর তোমরা তাঁকে সাহায্য করলে না? তাই পৃথিবীতে ফেরত যাও এবং তাঁর কবরের মাথার দিকে অবস্থান করো অগোছালো চুল নিয়ে এবং ধুলোমাখা অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদো। তাই তারা রয়ে গেছে বিশেষ সময় না আসা পর্যন্ত।"

হযরত মুসা (আ.)-এর ইমাম হোসাইনের মাজার জিয়ারতঃ

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন যে, আমি বনি মারওয়ানের খিলাফতের শেষ দিনগুলোতে ইমাম হোসাইনের কবর জিয়ারতের জন্য যাত্রা করলাম সিরীয়দের কাছ থেকে লুকিয়ে (তখন ইমামের মাজার জিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল) আমি কারবালায় পৌঁছলাম এবং মরুভূমির এক কোনায় বিশ্রাম নিলাম। মধ্যরাতে আমি কবরের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং কিছুদূর যাওয়ার পর এক ব্যক্তি এলেন এবং আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে। ফেরত চলে যাও, কারণ তুমি কবরে পৌঁছবে না।" আমি ফেরত চলে গেলাম এবং তখন মাত্র ভোর শুরু হয়েছে। আমি কবরের দিকে গেলাম আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম ঐ ব্যক্তি আবার আমার দিকে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর বান্দাহ তুমি কবরে উপস্থিত হয়ো না।" আমি বললাম, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, কেন আমি সেখানে উপস্থিত হব না। যখন আমি কুফা থেকে এসেছি জিয়ারতের জন্য? আমাকে বাধা

দিবেন না। হয়তো সকাল হয়ে যাবে আর সিরিয়রা আমাকে এখানে পেলে হত্যা করবে।" তিনি বললেন, "এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো। কারণ নবী মুসা বিন ইমরান (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছেন এই কবর জিয়ারত করার জন্য এবং তিনি তা পেয়েছেন এবং তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন সত্তর হাজার ফিরিশতাসহ। তারা তাঁর (ইমামের) কাছে আছেন রাতের শুরু থেকে এবং সকাল হওয়ার অপেক্ষায় আছেন আকাশে ফেরত যাওয়ার জন্য।" আমি তাঁকে বললাম, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি কে?" তিনি বললেন, "আমি ফিরিশতাদের একজন যারা ইমামের কবর পাহারা দেওয়ার জন্য এবং তার জিয়ারতকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছি।" আমি ফেরত এলাম। তাঁর কথা শুনে আমার বুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভোর হওয়ার পর আমি আবার তার কবরের মাথার দিকে গেলাম। এবার আমার বাধা দেয়ার কেউ ছিল না। আবার আমি তাড়াতাড়ি ফজর নামাজ শেষ করে সিরীয়দের ভয়ে তাড়াতাড়ি ফেরতের পথ ধরলাম।

"ইমাম হোসাইনের মাজার জিয়ারত একটি বিদআত" এমন ধারণাকারীর একজনের ঘটনাঃ

'বিহারুল আনওয়ার' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, মু'জামে কবীর গ্রন্থের লেখক থেকে যিনি তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের বর্ণনা করেছেন, সে বলেছে যে, "আমি কুফায় বাসা নিলাম এবং এক প্রতিবেশী ছিল যার সঙ্গে আমি প্রায়ই বসতাম। সেটি ছিল জুমআর দিনের আগের রাত। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইমাম হোসাইনের মাজার জিয়ারত বিষয়ে তুমি কী বলো?" সে বলল, "এটি একটি বিদআত (ধর্মে নতুন আবিষ্কার) এবং প্রত্যেক বিদআত হলো ভুল পথ এবং প্রত্যেক ভুল পথের পরিণতি হলো জাহান্নাম। তা শুনে ক্রোধপূর্ণ হয়ে আমি তার কাছ থেকে উঠে গেলাম এবং নিজকে বললাম যে, সকালে আমি তার কাছে যাব এবং তার কাছে হাদিসগুলো বলবো যেগুলো আমিরুল মুমেনীন হযরত আলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। সম্ভবত তা তার চোখগুলোকে আলোকিত করবে। আমি তার কাছে সকালে গেলাম এবং তার দরজায় টোকা দিলাম। দরজার পিছন থেকে কেউ একজন উত্তর দিল। তিনি রাতের শুরুতেই জিয়ারতে গেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তার পিছু নিলাম যতক্ষণ না ইমাম হোসাইনের মাজারে পৌঁছলাম এবং আমি তাকে দেখলাম সে সিজদায় আছে,

তবে সে অতিরিক্ত রুকু ও সিজদার কারণে ক্লান্ত হচ্ছে না। আমি বললাম, "গতকাল তুমি আমাকে বললে যে, জিয়ারত একটি বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত একটি ভুল পথ এবং প্রত্যেক ভুল পথের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। আর আজ তুমি জিয়ারতে এসেছ?" সে বলল, "হে সুলায়মান, আমাকে তিরস্কার করো না। আমি আহলুল বায়তের ইমামতে বিশ্বাসী ছিলাম না গতরাত পর্যন্ত। যখন আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম যা আমাকে ভীত করেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কী স্বপ্ন দেখেছ?" সে বলল, "আমি স্বপ্নে একজন মানুষকে দেখলাম। সে না ছিল খুব খাটো, না ছিল খুব লম্বা, কিন্তু দেখতে ছিল খুব সুন্দর আর আমি তার বর্ণনা দিতে অক্ষম। তার সঙ্গে কিছু লোক ছিল যারা তাঁকে ঘেরাও করে রেখেছিল এবং তাদের মাঝখানে রেখেছিল। তাঁর দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি মোটা ঝাঁকড়া লেজের এক ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন যার মাথায় ছিল চারটি স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি মুকুট। চারটি স্তম্ভেই মূল্যবান পাথর বসানো ছিল যা তিন দিনের দুরত্বের রাস্তাকে আলোকিত করে রেখেছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, "তিনি কে?" বলা হলো যে, তিনি রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি আলী বিন আবি তালিব। আমি আরো দূরে দৃষ্টি ফেললাম এবং দেখতে পেলাম হাওদাসহ একটি আলোকিত উট, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে উড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ওটা কার বাহন।" বলা হলো যে, তা সাইয়্যেদা খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ এবং সাইয়্যেদা ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (দ.)-এর। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "যুবকটি কে?" বলা হলো যে, তিনি হাসান বিন আলী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তারা কোথায় যাচ্ছেন?" বলা হলো যে, তাদের সবাই মজলুম শহীদ হোসাইন বিন আলীর জিয়ারতে যাচ্ছেন। যিনি কারবালার শহীদ। আমি হাওদার কাছে এগিয়ে গেলাম, সেখানে কিছু লেখা ছিল– "জুমআর রাতে হোসাইনের কবর জিয়ারতকারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা তার স্মরণ উপরে উঠুক।" তখন একজন ঘোষক আমার কাছে ঘোষণা করল, জেনে রাখো, আমরা এবং আমাদের অনুসারীরা বেহেশতের উচ্চ মকামে আছি। আল্লাহর শপথ! হে সুলাইমান (বর্ণনাকারী) আমি এ জায়গা ত্যাগ করব না যতক্ষণ না আমার আত্মা আমার দেহ ত্যাগ করে।

ইমাম হোসাইনের রওজা জিয়ারতকারীদের বিশেষ মর্যাদাঃ

ইমাম জাফর সাদিক বলেন, "আমার প্রপিতামহ হোসাইন যিনি তার নিজ শহর থেকে অনেক দূরে এবং বিদেশের মাটিতে শাহাদাতবরণ করেন। তাই যে তার জিয়ারতে যায় এবং তার জন্য কাঁদে আর সেও যে তাঁর জিয়ারত করেনি, কিন্তু তার হৃদয় তাঁর জন্য শোকার্ত অবস্থায় থাকে এবং যে ব্যক্তি তাঁর জন্য উপস্থিত থাকতে পারেনি কিন্তু তার হৃদয় তাঁর জন্য পোড়ে যে তাঁর উপর সালাম পাঠায়। যে ব্যক্তি তার পায়ের কাছে অনুর্বর ভূমিতে তার সন্তানের কবর দেখে। যেখানে ছিল না তার কোনো আত্মীয় স্বজন এবং পরিবার। তার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং মুরতাদরা (ধর্মদ্রোহীরা) একত্র হয়েছিল এবং তারা তাঁকে হত্যা করেছিল এবং তাঁকে ফেলে গিয়েছিল বন্য পশুদের জন্য আর তারা ফোরাতের পানির দিকে পথ বন্ধ করেছিল। যা কুকুরদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল। তারা রাসূলাল্লাহ (দ.)-এর অধিকারকে অসম্মান করেছে এবং তাঁর নিজের এবং তাঁর সন্তানদের বিষয়ে তাঁর সনদকে তারা বিবেচনায় নেয়নি। এরপর তিনি তাঁর কবরে শুয়েছিলেন নির্যাতিত হয়ে এবং মাটিতে পড়েছিলেন তাঁর পরিবার ও ভক্তদের সঙ্গে এবং তিনি এক অপরিচিত ভূমি এবং ভীতিকর মরুভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন। সে ভূমিতে কেউ যায় না শুধু তারা ছাড়া যাদের হৃদয় আল্লাহ বিশ্বাস (ঈমান) দিয়ে পরীক্ষা করেছেন।" ইমাম বলেন, "তুমি কি জানো এই জিয়ারতকারীদের মর্যাদা কী? যারা তাঁর কবর জিয়ারত করে এবং আমাদের কাছে তাদের জন্য কত বিশাল উপহার আছে?" তাদের মর্যাদা হলো যে, ফিরিশতারা তাদের উচ্চ প্রশংসা করে, আর আমাদের কাছে যে কল্যাণ আছে তা হলো প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় আমরা দোয়া করি যেন তাদের উপর রহমত নাযিল হয়। আর আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যে সময় তিনি (ইমাম হোসাইন) শহীদ হয়েছিলেন তখন থেকে তাঁর কবর কোনোদিন দোয়াকারীদের উপস্থিতি থেকে খালি ছিল না, হোক তা ফিরিশতা, জ্বিনেরা, মানুষ অথবা পশু। এমন কেউ নেই যে, তাঁর জিয়ারতকারীদের ঈর্ষা কওে না এবং স্পর্শ করে না এবং সব জিনিস তার দিকে তাকায় মর্যাদা লাভের আশা নিয়ে। কারণ সে তাঁর কবর দেখেছে।"

আল্লাহ তায়ালা আমাদের হযরত ইমাম হোসাইনের মাজার শরিফ জিয়ারত করার তৌফিক দিন। আমিন।

তথ্যসূত্রঃ

(১) **আহলে বাইতই ঈমানের ভিত্তি**

লেখক : ফারুক চৌধুরী (www. thetrutbd.com)

(২) **ইমাম হাসান ও খেলাফত**, (ইতিহাসের অব্যক্ত অধ্যায়) –লেখক মোস্তফা, প্রকাশনায়: আলে রাসূল পাবলিকেশন্স।

(৩) **রাসূলাল্লাহ (সা.)-এর বিদায় হজের শেষ ভাষণ**,

মূল: আল্লামা আবু মনসুর আহমদ ইবনে আলী আত-তাবারসী (রহ.), ভাষান্তর: ইরশাদ আহমদ, প্রকাশনায়: আলে রাসূল পাবলিকেশন্স।

(৪) **আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ও অন্যান্য কল্পকাহিনী**,

লেখক –আল্লামা সাইয়েদ মুরতাযা আসকারী, অনুবাদ নূর হোসেন মজিদী, প্রকাশনায়: আলে রাসূল পাবলিকেশন্স।

(৫) **শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস (কারবালার মর্মান্তিক ইতিহাস)** লেখক: শাইখ আব্বাস কুম্মি, অনুবাদ: ইরফানুল হক, প্রকাশনায়: ওয়াইজম্যান পাবলিকেশনস।

Notes :

গাদিরে খুম থেকে দামেস্ক

আলে রাসূল পাবলিকেশন্স
Ale Rasul Publications
[[[হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি]]]
৩৯ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
01551 364529, 01973 364529, E-mail: ale.rasul@outlook.com
Find us on facebook ale.rasul@outlook.com
Follow us on twitter ale.rasul@outlook.com

ISBN: 978-984-91642-0-3